182. Ac. 919. 3.

বিক্রমপুরের বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'কেদাররায়', 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', অর্জ্জুন, 'ভীমসেন', 'কল্পকথা', 'রূপকথা' 'মহসীন', 'বিদ্যাসাগর', 'তস্‌বীর ও ছোটগল্প', 'আনারকলি,' 'পল্লীরাণী', 'ভারতের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা 'বিক্রমপুর' সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গলাভাষার পরীক্ষক, ভূতপূর্ব্ব পাবলিসিটি বোর্ডের বক্তা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত ও সম্পাদিত।

IMPERIAL LIBRARY
11 OCT 1919
WRITERS BUILDING

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা,
নবাবপুর এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

মূল্য কাপড়ে বাঁধা
৩৲ তিন টাকা মাত্র।

LIBRARY
25. FEB. 21.

ঢাকা,
নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত ।

৮৯৪৮৬

উৎসর্গ।

মাতৃচরণে

সেবক—যোগেন্

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রকাশিত হইবার পরে আমি বহুবার বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম পর্য্যটন করিয়া, ইহা স্থির করি যে, যদি বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম সমূহের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সুযোগ ঘটে। আমি এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ গ্রাম-গুলির কতক কতক বিবরণ সংগ্রহ করি, তারপর যখন "বিক্রমপুর" পত্রিকা প্রকাশ করি সেই সময়ে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজ নিজ গ্রাম্যবিবরণ সঙ্কলন করিয়া "বিক্রমপুর" পত্রে পাঠাইবার জন্য আহ্বান করি। আমার এইরূপ আহ্বানে অতি অল্প লোকই সাড়া দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের ন্যায় জনবহুল প্রাচীনস্থানের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, কথা-প্রবচন, উপকথা, খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের ও কৃতি ব্যক্তিগণের জীবনী-সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা একার কার্য্য নহে, ইহাতে দশজনের সহযোগীতা প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে এইরূপ সহযোগীতালাভ একরূপ অসম্ভব। "বিক্রমপুর" যে কয় বৎসর জীবিত ছিল, সেই কয়েক বৎসর আমি নানাভাবে নানাজনের নিকট হইতে কয়েকটী গ্রাম্য বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। "বিক্রমপুরের বিবরণ" ১ম খণ্ড, এইরূপ সংগ্রহের ফল। আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় অনেকেই সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমান্ নগেন্দ্রলাল চন্দ, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক, শ্রীযুক্ত সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,সুকবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীমান্ পবিত্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ

দাস, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বসু, রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর বি, এল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমি অনেক স্থলে ইহাদের লিখিত বিবরণী অবিকৃত রাখিয়া প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন এবং সংশোধন করিয়াছি। যাহারা দেশ বা গ্রামের জন্য সামান্যতঃও কোন না কোন কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহাদের সম্বন্ধে একটু বেশীরকম লিখিয়া ফেলিয়াছি। অন্যের নিকট তাহা অতিরিক্ত মনে হইলেও আমি তাহাতে কুণ্ঠিত হই নাই; কারণ পরিত্যক্ত শ্মশানসদৃশ পল্লী-জননীর সেবানিরত থাকিয়া যাহারা সামান্য ভাবেও কল্যাণ করিয়াছেন তাহারা আমাদের গৌরবস্থল।

এই কার্য্যে ব্রতী হইতে আমাকে যাহারা উৎসাহিত করিয়াছেন তন্মধ্যে চিরসুহৃদ ভূতপূর্ব্ব "নবনূর" সম্পাদক "ডালি" প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা সুকবি শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ এমদাদ্ আলি, 'ক্লিওপেট্রা', 'সমাজ-চিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা শিল্প-সঙ্গীত ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ প্রিয়তম ও প্রিয়দর্শন বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক নানাবিদ্যা-বিশারদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন এম্ এ মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয়।

দেশে সমালোচকের অভাব নাই, তবে নিরপেক্ষ সমালোচকের অভাব যে বেশী পরিমাণে আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার এই মাত্র অনুরোধ যিনি এই গ্রন্থখানা পড়িবেন তিনি যেন শুধু বহির ছাপা কাগজ ও বাঁধাইর সমালোচনা না করিয়া বন্ধুভাবে দোষগুণ প্রদর্শন করেন। তাহা হইলে, আমি নিজেও উপকৃত হইব এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে সাধ্যানুযায়ী সেই সকল ত্রুটী সংশোধনে মনোযোগী রহিব। ঐতি-

হাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করা আমি সাধ্যানুযায়ী সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল, নানা কারণে ব্যস্ততাবশতঃ এই সংস্করণে আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না। প্রথম খণ্ডে যে সব গ্রামের বিবরণী প্রকাশ হইল যদি সেই সকল গ্রামনিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ দয়া করিয়া ত্রুটী—বিচ্যুতি ইত্যাদি আমার নিকট সংশোধন করিয়া লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আমি তাহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিব। জোয়ারের জলের মত এ বহিতে বহু স্থানে বহু কথা অনাবশ্যকরূপেও ছাপা হইয়া গিয়াছে, সে সকলই আমার ত্রুটী, কারণ অতিদ্রুত বহি খানা বাহির করিতে হইল। **উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিক্রমপুরের** প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহের বিবরণই ইহার প্রত্যেক খণ্ডে থাকিবে। এখণ্ডেও সাধ্যানুরূপ ভাবে যাহা পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থ শেষে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করা হইল, তাহা হইতেই পাঠকগণ নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ কিরূপভাবে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে তাহার আভাষ পাইবেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ব্লক নির্ম্মাণের অত্যধিক ব্যয় এসকল নানা কারণে গ্রন্থের মুল্য একটু বেশী হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান খণ্ডে মানচিত্র দেওয়া গেল না—দ্বিতীয় খণ্ডে মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। দেশবাসীর সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইলে এইরূপভাবে উভয় বিক্রমপুরের সমুদয় প্রসিদ্ধ গ্রামের বিবরণই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। দ্বিতীয়খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

উপসংহারে আমি আমার চিরঅনুরাগী এবং সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে সাহায্যকারী অকৃত্রিম সুহৃদ এই গ্রন্থের প্রকাশক ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরীর স্বত্বাধি রী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক মহাশয়কে এই গ্রন্থ

প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনও ইহা প্রকাশ সম্ভবপর হইত না। শ্রীভগবান্! তাঁহার মঙ্গল করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

পোঃ মুলচর—মুন্সীবাড়ী,
মহেন্দ্র-কুটীর, ভাঙ্গা।
১লা শ্রাবণ—১৩২৬।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা, বর্ত্তমান বিক্রমপুর, গ্রামের নামোৎপত্তি ও নামরহস্য, নদী, খাল ও পথঘাট, আমদানী ও রপ্তানী, পথ ঘাট ও যাতায়াত, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী, হাট ও বাজারের বিবরণ, জনসংখ্যা ইত্যাদি। ১—২০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নৈরার ঘটক চৌধুরী বংশ ও কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত—বংশ-পরিচয়, তালুকের বিবরণ, পরগণার বিবরণ,—আড়াফুলবাড়িয়া বা শ্রীপুর—শ্রীপুর সাহাবন্দর প্রাচীন নৈরা, সীমাও পরিধি, কেদারবাড়ী পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা বা বৈখোলার খাল, ইন্দ্রনারায়ণ রায় ঘটক, সিদ্ধেশ্বরী-ব্রহ্মাণ্ডগিরি ইত্যাদি। কালীপাড়ার সাধারণ বিবরণ—বংশকথা—বঙ্গচন্দ্র বারৈষ্যাচৌধুরী-কান্তনাথের-পরবর্ত্তীবংশধরগণ-কালীপাড়ারউচ্চইংরেজী বিদ্যালয়-টোল-সংস্কৃতবিদ্যালয়-দাতব্যঔষধালয়-ইত্যাদি কালীপাড়া ধ্বংসের পরবর্ত্তী বিবরণ—চৌধুরিগণের বয়নামার প্রতিলিপি। ২১—৬৪ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাগ্যকুলের কুণ্ডুপরিবার—আদি বিবরণ-রাজা শ্রীনাথ রায়বাহাদুর, রায় জানকীনাথ রায়বাহাদুর-মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়বাহাদুর বি, এল,—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির জীবন-কথা ও কীর্ত্তি-পরিচয়। ৬৫—৯৩ "

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রাম্য বিবরণ—

১। যোলঘর—আদি ইতিহাস, খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পরিচয়, দেবমন্দির, বিগ্রহ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ—রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ইত্যাদি। ৯৪ "

২। বেতকা—সীমা, ইতিহাস, জনবিবরণ, খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয়—গ্রন্থকার ও লেখক, বিখ্যাত স্থান, ইউনিয়ান কমিটি, কীর্ত্তি-মঠ মন্দির-হাট বাজার, মনোমোহিনী উদ্যান-দেবালয়। ১১১ "

৩। কুশারিপাড়া—মাশ্চটকবংশের বিস্তৃত ইতিহাস, কুশারিপাড়া চক্রবর্ত্তী বাড়ী-রাজবাড়ী-কুশারিপাড়ার ভগ্ন মঠ ইত্যাদি। ১২১ "

৪। ফেগুনাসার—রাস্তাঘাট খাল, বনজঙ্গল-ডোবা-পুষ্করিণী হাট-বাজার পাঠাগার বিদ্যালয়, প্রাচীন কীর্ত্তি মঠ। ১২৮ "

৫। বীরতারা—মজুমদারবংশের ইতিহাস-লোকসংখ্যা সাধারণ অবস্থা-বিদ্যাচর্চ্চা-বিবিধ-ডঙ্কুরকালী-পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণ ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার। ১৩১ "

৬। ঘোষের কোলাপাড়া—সাধারণ বিবরণ-প্রাচীন ইতিবৃত্ত, দর্শনীয় দ্রব্যাদি, হাট বাজার, সাহিত্য, দেবায়তন-শ্রীশ্রী৺ কাত্যায়নী দেবী। ১৫০ "

৭। রাড়িখাল—আরিয়লবিল-গ্রাম্যবিবরণ-গ্রাম্যবিদ্যালয়,বিবিধ, প্রাচীনপুঁথি-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ১৫৫ "

৮। পাঐলদিয়া—গ্রাম্যবিবরণ-মেলা-মক্তব-বিদ্যালয়,মঠ মন্দির দেবমূর্ত্তি, সুবচনীতলা, বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয়। ১৬১ "

৯। সিংপাড়া—সাধারণ পরিচয়-নানাকথা ৺কালীমাতার বৃক্ষ ১৬৫ "

১০। কান্দাপাড়া—সীমা-প্রসিদ্ধব্যক্তিগণের পরিচয়-ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, দেবালয়, মেলা। ১৬৯ "

১১। পশ্চিমপাড়া—গ্রামের ইতিহাস, খ্যাতনামা ব্যক্তি সাহিত্যসমিতি, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। ১৭৫ "

১২। পুরাতন মালপদিয়া—অবস্থানানুযায়ী গ্রামের নাম ও বিবরণ-জাতি হিসাবে পাড়ার নাম-ধর্ম্ম সম্পর্কিত নাম ও বিবরণ-করারবাগ-প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় ইত্যাদি। ১৮৪ "

১৩। ইছাপুরা—প্রাচীন বিবরণ-সীমা ইত্যাদি লোকসংখ্যা-সাধারণ অবস্থা-স্বাস্থ্য, বাজার-বিবিধ-চলবল্ খাঁর বেড়-কালীপাড়ার জমিদার শিক্ষিত লোক-ইছাপুরা স্কুলের ইতিহাস-ইছাপুরা-পঞ্চরত্ন মঠ ইত্যাদি। ১৯২

১৪। পানিয়া—চতুঃসীমা-গ্রাম্যবিবরণ-শিল্প-ব্যবসাবাণিজ্য-রাস্তা-ঘাট-শিক্ষা পুস্তকাগার-চিকিৎসা-জলবায়ু স্বাস্থ্য-দীঘি পুষ্করিণী বিখ্যাত নিম্ববৃক্ষ প্রাচীন কীর্ত্তি, মেলা গলইয়া-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ২০৮ "

১৫। গাওদিয়া—অবস্থান-জনবিবরণ-শিল্পশিক্ষা-সাহিত্য-আমোদ প্রমোদ-ইতিহাস ও খ্যাতনামা ব্যক্তি—নানাকথা। ২১৩ "

১৬। মাইজপাড়া—সীমা-রায় বংশের ইতিবৃত্ত-স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়-শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য-শ্রীযুক্ত প্রমদাকিশোর রায় এম, এ, বি. এল,—বিবিধ। ২১৯ "

১৭। রাজানগর-কুঠিবাড়ী—নামেরইতিহাস-গ্রামের বিশেষত্ব-অধিবাসী-চিকিৎসা-স্মৃতিস্তম্ভ-ইউনিয়ন কমিটি। ২২৭ "

১৮। শেখরনগর—গ্রাম্য বিবরণ—পূর্ব্ব ইতিহাস বংশমর্য্যাদা-ভূসম্পত্তি পূর্ব্বকীর্ত্তি-শিক্ষা পূর্ণচন্দ্র রায়-মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বি, এল,-দাতব্যচিকিৎসালয়-৺ললিতমোহন রায়। ২৩২ "

১৯। শ্রীনগর—নামোৎপত্তির ইতিহাস, শ্রীনগরের জমিদার বংশের ইতিহাস। ২৫৬ "

২০। ফুরশাইল—সাধারণ বিবরণ—পণ্ডিত অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন—মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর—অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তি-হাট-বাজার-দীঘি পুষ্করিণী ও স্বাস্থ্য। ২৬২ "

২১। বজ্রযোগিনী—সাধারণ বিবরণ—গ্রামের অবস্থান—জনসংখ্যা—প্রাচীন অধিবাসী-রঘুরামপুরের বিবরণ—স্কুল পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয়-গ্রামের স্বাস্থ্য—কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ—চন্দ্রকান্ত ঘোষ—রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর—জয়চন্দ্র গুহ ও কালীকিশোর গুহ—শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-সাধারণ বিবরণ—দেবমন্দির—রাস্তাঘাট-চিকিৎসা—সাহিত্য ও সাহিত্যসেবী-শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী ঘোষ—শ্রীমূর্ত্তি।

২২। পঞ্চসার—সাধারণ বিবরণ ও কীর্ত্তিকাহিনী—খ্যাতনামা ব্যক্তি ইত্যাদি। ৩১৫ "

২৩। কোঁয়রপুর—গ্রামের অবস্থান—প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন-হিতসাধিনী সভা-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ৩২০ "

২৪। খিলগাঁও—সাধারণ কথা-মিঞাসংশের পরিচয়—মুন্সী নসিরউদ্দীন-বদান্যতা—মুন্সী আফ্‌তাব উদ্দীন। ৩২৪ "

চিত্র-সূচী।

১। বিক্রমপুরের পল্লী-দৃশ্য ... ... ৩২ পৃষ্ঠা।
২। কেদারবাড়ীর বর্ত্তমান দৃশ্য ... ... ৩৭ "
৩। রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ... ... ৮৮ "
৪। রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর ... ... ৯১ "
৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় ... ... ৯২ "
৬। রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এল ১০৭ "
৭। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার ... ... ১৪৪ "
৮। স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় .. ... ২২২ "
৯। মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বি, এল ২২৪ "
১০। স্বর্গীয় ললিতমোহন রায় ... ... ৪৪৮ "
১১। মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর বি, এল ২৬৫ "
১২। রঘুরামপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ২৭৭ "
১৩। ঐ ২নং ২৭৯ "
১৪। স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ ... ... ২৮৪ "
১৫। " চন্দ্রকান্ত ঘোষ ... ... ২৮৯ "
১৬। চন্দ্রকান্ত স্মৃতিফলক—ময়মনসিংহ টাউনহল ... ২৯৯ "
১৭। স্বর্গীয় কালীকিশোর গুহ ... ... ৩০৬ "
১৮। শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৩০৯ "
১৯। শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ ... ... ৩১১ "

182. Ac. 919. 3.

বিক্রমপুরের বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'কেদাররায়', 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ', অর্জ্জুন, 'ভীমসেন', 'কল্পকথা', 'রূপকথা' 'মহসীন', 'বিদ্যাসাগর', 'তস্‌বীর ও ছোটগল্প', 'আনারকলি,' 'পল্লীরাণী', 'ভারতের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থরচয়িতা 'বিক্রমপুর' সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গলাভাষার পরীক্ষক, ভূতপূর্ব্ব পাবলিসিটি বোর্ডের বক্তা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত ও সম্পাদিত।

IMPERIAL LIBRARY
11 OCT 1919
WRITERS BUILDING

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা,
নবাবপুর এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

মূল্য কাপড়ে বাঁধা
৩৲ তিন টাকা মাত্র।

LIBRARY
25. FEB. 21.

ঢাকা,
নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ বসাকদ্বারা মুদ্রিত ।

৮৯৪৮৬

উৎসর্গ।

মাতৃচরণে

সেবক—যোগেন্

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রকাশিত হইবার পরে আমি বহুবার বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম পর্য্যটন করিয়া, ইহা স্থির করি যে, যদি বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম সমূহের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সুযোগ ঘটে। আমি এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ গ্রাম-গুলির কতক কতক বিবরণ সংগ্রহ করি, তারপর যখন "বিক্রমপুর" পত্রিকা প্রকাশ করি সেই সময়ে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজ নিজ গ্রাম্যবিবরণ সঙ্কলন করিয়া "বিক্রমপুর" পত্রে পাঠাইবার জন্য আহ্বান করি। আমার এইরূপ আহ্বানে অতি অল্প লোকই সাড়া দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের ন্যায় জনবহুল প্রাচীনস্থানের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, কথা-প্রবচন, উপকথা, খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের ও কৃতি ব্যক্তিগণের জীবনী-সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা একার কার্য্য নহে, ইহাতে দশজনের সহযোগীতা প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে এইরূপ সহযোগীতালাভ একরূপ অসম্ভব। "বিক্রমপুর" যে কয় বৎসর জীবিত ছিল, সেই কয়েক বৎসর আমি নানাভাবে নানাজনের নিকট হইতে কয়েকটী গ্রাম্য বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। "বিক্রমপুরের বিবরণ" ১ম খণ্ড, এইরূপ সংগ্রহের ফল। আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় অনেকেই সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমান্ নগেন্দ্রলাল চন্দ, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক, শ্রীযুক্ত সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,সুকবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীমান্ পবিত্র-কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ

দাস, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বসু, রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর বি, এল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমি অনেক স্থলে ইহাদের লিখিত বিবরণী অবিকৃত রাখিয়া প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন এবং সংশোধন করিয়াছি। যাহারা দেশ বা গ্রামের জন্য সামান্যতঃও কোন না কোন কার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহাদের সম্বন্ধে একটু বেশীরকম লিখিয়া ফেলিয়াছি। অন্যের নিকট তাহা অতিরিক্ত মনে হইলেও আমি তাহাতে কুণ্ঠিত হই নাই; কারণ পরিত্যক্ত শ্মশানসদৃশ পল্লী-জননীর সেবানিরত থাকিয়া যাহারা সামান্য ভাবেও কল্যাণ করিয়াছেন তাহারা আমাদের গৌরবস্থল।

এই কার্য্যে ব্রতী হইতে আমাকে যাহারা উৎসাহিত করিয়াছেন তন্মধ্যে চিরসুহৃদ ভূতপূর্ব্ব "নবনূর" সম্পাদক "ডালি" প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা সুকবি শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ এমদাদ্ আলি, 'ক্লিওপেট্রা', 'সমাজ-চিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা শিল্প-সঙ্গীত ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ প্রিয়তম ও প্রিয়দর্শন বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক নানাবিদ্যা-বিশারদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন এম্ এ মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয়।

দেশে সমালোচকের অভাব নাই, তবে নিরপেক্ষ সমালোচকের অভাব যে বেশী পরিমাণে আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার এই মাত্র অনুরোধ যিনি এই গ্রন্থখানা পড়িবেন তিনি যেন শুধু বহির ছাপা কাগজ ও বাঁধাইর সমালোচনা না করিয়া বন্ধুভাবে দোষগুণ প্রদর্শন করেন। তাহা হইলে, আমি নিজেও উপকৃত হইব এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে সাধ্যানুযায়ী সেই সকল ত্রুটী সংশোধনে মনোযোগী রহিব। ঐতি-

হাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করা আমি সাধ্যানুযায়ী সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল, নানা কারণে ব্যস্ততাবশতঃ এই সংস্করণে আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না। প্রথম খণ্ডে যে সব গ্রামের বিবরণী প্রকাশ হইল যদি সেই সকল গ্রামনিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ দয়া করিয়া ত্রুটী—বিচ্যুতি ইত্যাদি আমার নিকট সংশোধন করিয়া লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আমি তাহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিব। জোয়ারের জলের মত এ বহিতে বহু স্থানে বহু কথা অনাবশ্যকরূপেও ছাপা হইয়া গিয়াছে, সে সকলই আমার ত্রুটী, কারণ অতিদ্রুত বহি খানা বাহির করিতে হইল। **উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিক্রমপুরের** প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহের বিবরণই ইহার প্রত্যেক খণ্ডে থাকিবে। এখণ্ডেও সাধ্যানুরূপ ভাবে যাহা পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থ শেষে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করা হইল, তাহা হইতেই পাঠকগণ নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ কিরূপভাবে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে তাহার আভাষ পাইবেন। কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ব্লক নির্ম্মাণের অত্যধিক ব্যয় এসকল নানা কারণে গ্রন্থের মুল্য একটু বেশী হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান খণ্ডে মানচিত্র দেওয়া গেল না—দ্বিতীয় খণ্ডে মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। দেশবাসীর সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইলে এইরূপভাবে উভয় বিক্রমপুরের সমুদয় প্রসিদ্ধ গ্রামের বিবরণই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। দ্বিতীয়খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

উপসংহারে আমি আমার চিরঅনুরাগী এবং সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে সাহায্যকারী অকৃত্রিম সুহৃদ এই গ্রন্থের প্রকাশক ঢাকা আলবার্ট লাইব্রেরীর স্বত্বাধি রী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক মহাশয়কে এই গ্রন্থ

প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনও ইহা প্রকাশ সম্ভবপর হইত না। শ্রীভগবান্! তাঁহার মঙ্গল করুন। অলমতি বিস্তরেণ।

পোঃ মুলচর—মুন্সীবাড়ী,
মহেন্দ্র-কুটীর, ভাঙ্গা।
১লা শ্রাবণ—১৩২৬।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা, বর্ত্তমান বিক্রমপুর, গ্রামের নামোৎপত্তি ও নামরহস্য, নদী, খাল ও পথঘাট, আমদানী ও রপ্তানী, পথ ঘাট ও যাতায়াত, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী, হাট ও বাজারের বিবরণ, জনসংখ্যা ইত্যাদি। ১—২০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নৈরার ঘটক চৌধুরী বংশ ও কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত—বংশ-পরিচয়, তালুকের বিবরণ, পরগণার বিবরণ,—আড়াফুলবাড়িয়া বা শ্রীপুর—শ্রীপুর সাহাবন্দর প্রাচীন নৈরা, সীমাও পরিধি, কেদারবাড়ী পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা বা বৈখোলার খাল, ইন্দ্রনারায়ণ রায় ঘটক, সিদ্ধেশ্বরী-ব্রহ্মাণ্ডগিরি ইত্যাদি। কালীপাড়ার সাধারণ বিবরণ—বংশকথা—বঙ্গচন্দ্র বারৈষ্যাচৌধুরী-কান্তনাথের-পরবর্ত্তীবংশধরগণ-কালীপাড়ারউচ্চইংরেজী বিদ্যালয়-টোল-সংস্কৃতবিদ্যালয়-দাতব্যঔষধালয়-ইত্যাদি কালীপাড়া ধ্বংসের পরবর্ত্তী বিবরণ—চৌধুরিগণের বয়নামার প্রতিলিপি। ২১—৬৪ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাগ্যকুলের কুণ্ডুপরিবার—আদি বিবরণ-রাজা শ্রীনাথ রায়বাহাদুর, রায় জানকীনাথ রায়বাহাদুর-মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়বাহাদুর বি, এল,—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির জীবন-কথা ও কীর্ত্তি-পরিচয়। ৬৫—৯৩ "

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রাম্য বিবরণ—

১। যোলঘর—আদি ইতিহাস, খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পরিচয়, দেবমন্দির, বিগ্রহ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ—রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ইত্যাদি। ৯৪ "

২। বেতকা—সীমা, ইতিহাস, জনবিবরণ, খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয়—গ্রন্থকার ও লেখক, বিখ্যাত স্থান, ইউনিয়ান কমিটি, কীর্ত্তি-মঠ মন্দির-হাট বাজার, মনোমোহিনী উদ্যান-দেবালয়। ১১১ "

৩। কুশারিপাড়া—মাশ্চটকবংশের বিস্তৃত ইতিহাস, কুশারিপাড়া চক্রবর্ত্তী বাড়ী-রাজবাড়ী-কুশারিপাড়ার ভগ্ন মঠ ইত্যাদি। ১২১ "

৪। ফেগুনাসার—রাস্তাঘাট খাল, বনজঙ্গল-ডোবা-পুষ্করিণী হাট-বাজার পাঠাগার বিদ্যালয়, প্রাচীন কীর্ত্তি মঠ। ১২৮ "

৫। বীরতারা—মজুমদারবংশের ইতিহাস-লোকসংখ্যা সাধারণ অবস্থা-বিদ্যাচর্চ্চা-বিবিধ-ডঙ্কুরকালী-পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণ ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার। ১৩১ "

৬। ঘোষের কোলাপাড়া—সাধারণ বিবরণ-প্রাচীন ইতিবৃত্ত, দর্শনীয় দ্রব্যাদি, হাট বাজার, সাহিত্য, দেবায়তন-শ্রীশ্রী৺ কাত্যায়নী দেবী। ১৫০ "

৭। রাড়িখাল—আরিয়লবিল-গ্রাম্যবিবরণ-গ্রাম্যবিদ্যালয়,বিবিধ, প্রাচীনপুঁথি-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ১৫৫ "

৮। পাঐলদিয়া—গ্রাম্যবিবরণ-মেলা-মক্তব-বিদ্যালয়,মঠ মন্দির দেবমূর্ত্তি, সুবচনীতলা, বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয়। ১৬১ "

৯। সিংপাড়া—সাধারণ পরিচয়-নানাকথা ৺কালীমাতার বৃক্ষ ১৬৫ "

১০। কান্দাপাড়া—সীমা-প্রসিদ্ধব্যক্তিগণের পরিচয়-ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, দেবালয়, মেলা। ১৬৯ "

১১। পশ্চিমপাড়া—গ্রামের ইতিহাস, খ্যাতনামা ব্যক্তি সাহিত্যসমিতি, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। ১৭৫ "

১২। পুরাতন মালপদিয়া—অবস্থানানুযায়ী গ্রামের নাম ও বিবরণ-জাতি হিসাবে পাড়ার নাম-ধর্ম্ম সম্পর্কিত নাম ও বিবরণ-করারবাগ-প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় ইত্যাদি। ১৮৪ "

১৩। ইছাপুরা—প্রাচীন বিবরণ-সীমা ইত্যাদি লোকসংখ্যা-সাধারণ অবস্থা-স্বাস্থ্য, বাজার-বিবিধ-চলবল্ খাঁর বেড়-কালীপাড়ার জমিদার শিক্ষিত লোক-ইছাপুরা স্কুলের ইতিহাস-ইছাপুরা-পঞ্চরত্ন মঠ ইত্যাদি। ১৯২

১৪। পানিয়া—চতুঃসীমা-গ্রাম্যবিবরণ-শিল্প-ব্যবসাবাণিজ্য-রাস্তা-ঘাট-শিক্ষা পুস্তকাগার-চিকিৎসা-জলবায়ু স্বাস্থ্য-দীঘি পুষ্করিণী বিখ্যাত নিম্ববৃক্ষ প্রাচীন কীর্ত্তি, মেলা গলইয়া-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ২০৮ "

১৫। গাওদিয়া—অবস্থান-জনবিবরণ-শিল্পশিক্ষা-সাহিত্য-আমোদ প্রমোদ-ইতিহাস ও খ্যাতনামা ব্যক্তি—নানাকথা। ২১৩ "

১৬। মাইজপাড়া—সীমা-রায় বংশের ইতিবৃত্ত-স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়-শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য-শ্রীযুক্ত প্রমদাকিশোর রায় এম, এ, বি. এল,—বিবিধ। ২১৯ "

১৭। রাজানগর-কুঠিবাড়ী—নামেরইতিহাস-গ্রামের বিশেষত্ব-অধিবাসী-চিকিৎসা-স্মৃতিস্তম্ভ-ইউনিয়ন কমিটি। ২২৭ "

১৮। শেখরনগর—গ্রাম্য বিবরণ—পূর্ব্ব ইতিহাস বংশমর্য্যাদা-ভূসম্পত্তি পূর্ব্বকীর্ত্তি-শিক্ষা পূর্ণচন্দ্র রায়-মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বি, এল,-দাতব্যচিকিৎসালয়-৺ললিতমোহন রায়। ২৩২ "

১৯। শ্রীনগর—নামোৎপত্তির ইতিহাস, শ্রীনগরের জমিদার বংশের ইতিহাস। ২৫৬ "

২০। ফুরশাইল—সাধারণ বিবরণ—পণ্ডিত অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন—মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর—অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তি-হাট-বাজার-দীঘি পুষ্করিণী ও স্বাস্থ্য। ২৬২ "

২১। বজ্রযোগিনী—সাধারণ বিবরণ—গ্রামের অবস্থান—জনসংখ্যা—প্রাচীন অধিবাসী-রঘুরামপুরের বিবরণ—স্কুল পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয়-গ্রামের স্বাস্থ্য—কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ—চন্দ্রকান্ত ঘোষ—রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর—জয়চন্দ্র গুহ ও কালীকিশোর গুহ—শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-সাধারণ বিবরণ—দেবমন্দির—রাস্তাঘাট-চিকিৎসা—সাহিত্য ও সাহিত্যসেবী-শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী ঘোষ—শ্রীমূর্ত্তি।

২২। পঞ্চসার—সাধারণ বিবরণ ও কীর্ত্তিকাহিনী—খ্যাতনামা ব্যক্তি ইত্যাদি। ৩১৫ "

২৩। কোঁয়রপুর—গ্রামের অবস্থান—প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন-হিতসাধিনী সভা-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ৩২০ "

২৪। খিলগাঁও—সাধারণ কথা-মিঞাসংশের পরিচয়—মুন্সী নসিরউদ্দীন-বদান্যতা—মুন্সী আফ্‌তাব উদ্দীন। ৩২৪ "

চিত্র-সূচী।

১। বিক্রমপুরের পল্লী-দৃশ্য ... ... ৩২ পৃষ্ঠা।
২। কেদারবাড়ীর বর্ত্তমান দৃশ্য ... ... ৩৭ "
৩। রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ... ... ৮৮ "
৪। রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর ... ... ৯১ "
৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় ... ... ৯২ "
৬। রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এল ১০৭ "
৭। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার ... ... ১৪৪ "
৮। স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় .. ... ২২২ "
৯। মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বি, এল ২২৪ "
১০। স্বর্গীয় ললিতমোহন রায় ... ... ৪৪৮ "
১১। মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বাহাদুর বি, এল ২৬৫ "
১২। রঘুরামপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ২৭৭ "
১৩। ঐ ২নং ২৭৯ "
১৪। স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ ... ... ২৮৪ "
১৫। " চন্দ্রকান্ত ঘোষ ... ... ২৮৯ "
১৬। চন্দ্রকান্ত স্মৃতিফলক—ময়মনসিংহ টাউনহল ... ২৯৯ "
১৭। স্বর্গীয় কালীকিশোর গুহ ... ... ৩০৬ "
১৮। শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ... ... ৩০৯ "
১৯। শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ ... ... ৩১১ "

LIBRA
11 OCT 1915
WRITERS' BUILDING

বিক্রমপুরের বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা, বর্ত্তমান বিক্রমপুর, গ্রামের নামোৎপত্তি ও নামরহস্য নদী, খাল ও পথ ঘাট, আমদানী ও রপ্তানী, পথ-ঘাট ও যাতায়াত, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী-হাট ও বাজারের বিবরণ।

বিক্রমপুর বঙ্গদেশের একটী প্রাচীনতম স্থান। বিক্রমপুর নাম কতদিনের প্রাচীন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 'রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম হইতে অথবা বিক্রমশালী সেনরাজগণ হইতে বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও অনিশ্চিত। তবে সমতট বঙ্গ বলিয়া একটী স্থানের পরিচয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহার ব্যাপকতা কতদূর ছিল অধুনা তাহা নিরুপণ করা সুকঠিন। ফার্গুসন সমতট বলিতে ঢাকা জেলা, ইৎচিঙের মতে ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত কোনস্থান এবং ওয়াটার্সের লেখায় ফরিদপুরের পূর্ব্ব এবং ঢাকার উত্তরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফার্গুসনের কথায় বিক্রমপুর সমতটের মধ্যেই পড়িয়া যায়। ইৎচিঙের বিভাগানুসারে পূর্ব্ব ভারতের অন্তর্গত বলিয়াও বিক্রমপুরকে সমতটের অন্তর্গত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ওয়াটার্স যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা।

তাহাতে একমাত্র বিক্রমপুরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। * বহু প্রাচীন তাম্রশাসনেও বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত আছে।

(১) সেনরাজগণের তাম্রশাসনে; (২) শ্রীচন্দ্রদেবের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও বিক্রমপুরের নামোল্লেখ আছে। যে ভাবেই হউকনা কেন—'বিক্রমপুর' নামটি প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন।

বর্ত্তমান বিক্রমপুর।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ পারের যে ভূভাগকে বিক্রমপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি পূর্ব্বে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার নানা স্থান নানা বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কার্ত্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার, ঢাকার উত্তরাংশ ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন "চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরগণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেনরাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিক জার্নেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত * লতা * ষোড়াঘটক পূর্ব্বে * স * একা * ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শঙ্কর বসাগোবিন্দ বলাল ভূসীমা পশ্চিমে * ইত্যাদি এই তাম্রশাসনে 'লতা' ও 'ধীগ্রাম' বলিয়া যে দুটি স্থানের পরিচয় আছে উহা যে বর্ত্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার, লঙ্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রের

* ইতিহাস-সম্পর্কিত বিষয়ে পাঠকগণকে, বিক্রমপুরের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কোথাও ইদিলপুর বা কার্ত্তিকপুরের নামোল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট নয়শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যদিও কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে শ্যামলবর্ম্মার শাসনপত্র কৃত্রিম বলিয়া শুনা যায়, তথাপি ঐ কৃত্রিম দলিল ও যে বহুশত বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কার্ত্তিকপুর এই দুইটি নাম পরগণা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌সাহ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময় সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্ত্তিকপুর, সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক্ পরগণা নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দুরাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

রাজ পরিবর্ত্তনের সহিত দেশের বিভাগ ও পরিবর্ত্তিত হয়। সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার

যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপর নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যেই আবার **আরঙ্গবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর** প্রভৃতি তিনচারিটি পরগণার সন্নিবেশ হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলীকর্ত্তৃক যে সার্ব্বে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুরপরগণাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ৮।৯নং মকিমাবাদ। ১০নং বিক্রমপুর। ১৩।১৪নং রাজনগর-ও বৈকুণ্ঠপুর। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক গরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮।৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরে দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরানীমণ্ডল, কয়কীর্ত্তন, নাগরভাগ, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল, হলুদিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালী-পাড়া, কোঁয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় ১৩।১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ৮।৯।১০ নং উহা বর্ত্তমান সময়ে ও ঢাকার অন্তর্গত থাকায় সর্ব্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা '**দক্ষিণ**' বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া **দক্ষিণ বিক্রমপুর** নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদান কালে মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ী রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজ পত্রেই নিবদ্ধ আছে।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্ব্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন। তাঁহারাও সগর্ব্বে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদর স্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সনকট কেহ কেহ সকাট বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণের বৈশম্যবশতঃ বিক্রমপুরবাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন। (১) সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন একটি খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড স্থানের ও ঐরূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদর স্থান ছিল। রামপালের পূর্ব্বে সমকটের অভ্যুদয় হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিম্নদিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ মেজর জেমস্‌রেণেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ব্বে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণ বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটী ও তন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দ মঙ্গল, খাগটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদী প্রবাহে ভগ্ন হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপসা, তারপাশা, রুপটা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানারগাঁ, আকসাইল, সোনারদেউল, গঁজনাইপুর, পোড়াগাছা, মূলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খিলগাঁ, খারচাকা,

বক্সীবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পাঁশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলিয়া, পারগাঁ, গাগৈরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতারভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, বাসগাঁ, মাইজপাড়া, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরী, আকিয়াধল, কাউলিপাড়া, বহর, কোমরপুর, প্রভৃতি বহু গ্রাম পদ্মার বা কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে ও হইতেছে।

বিক্রমপুরের গ্রামের নাম রহস্য ও নাম পরিবর্ত্তন—আমাদের দেশের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস অনেক স্থলেই অজ্ঞাত; এবিষয়ে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন কোন স্থলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। 'একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়, নাম একটা সংকেত মাত্র হয়। এমন গ্রাম ও আছে, যাহার জন্ম অবজ্ঞায়, নামও ঘৃণায় বিকৃত, কিন্তু পরে শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়াছে। (২) অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়বাহাদুর এম, এ, গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহারি প্রদর্শিত পন্থানুসারে বিক্রমপুরের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলাম। (৩) বিক্রমপুরের গ্রামের নাম এই ভাবে নির্দ্দেশ করায় অনেকেরই গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিবে। সেই ভাবেই কতগুলি গ্রামের নাম লিখিলাম। যথা:—

গ্রাম হইতে গাঁ বা গাঁও—বালিগাঁ, মাইজগাঁও, শাসনগাঁও, দত্তগাঁও, কুড়িগাঁও, পয়সাগাঁও, বেজগাঁও, পানগাঁও, কামারগাঁও,

ব্রাহ্মণগাঁও, খিলগাঁও, গারুড়গাঁও, বিদগাঁও, পালগাঁও, বান্দেগাঁও, বড়সাতগাঁও, থৈরগাঁও, চাঁদগাঁও, দিয়াগাঁও, ছয়গাঁও, আটিগাঁও, পাঁচগাঁও, তিন গাঁও, হাজিগাঁও, ক্ষয়গাঁও ও পাড়াগাঁও।

নগর—রাজনগর, রাজানগর, নগর, শ্রীনগর, সেকেরনগর, বা (শেখরনগর) মালখাঁনগর, গিরিনগর, বলাইনগর, কানাইনগর, নয়ানগর।

সং দ্বীপ—মূল অর্থ দুইদিকে জল-বেষ্টিত ভূমি। চারিদিকে জল-বেষ্টিত হইলেও দ্বীপ, পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ, এইপ্রকার দ্বীপকে হিন্দীতে টিবা, বাটিলা বলে। বিক্রমপুরের 'দী' ও দীয়া শব্দান্তক গ্রাম সমূহ ঐ সকল দ্বীপের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছে। যথা :—

হল্‌দিয়া, রাজদীয়া, গড়িদীয়া, কাঠাদিয়া, মালপদীয়া, কাঁচাদিয়া, পাউলদিয়া, রাণাদিয়া, ভোগদীয়া, বাইদিয়া, গোবরদী, শিয়ালদী, চামারদি, বিবনদি, আলদি, বয়রাগাদী, চিকনদী, কাকদী, অজদী, পরাশরদি, মরিচাদি, রাউদিয়া, তিলরদি, তুশলদিয়া, শ্যামসিদ্‌দি, ভোজদিয়া সিন্দুরদি, পাচলদিয়া, রামকৃষ্ণদি, লতপ্‌দী, রাজাদিয়া, কাকালদিয়া, থরিয়া, ভোগদিয়া ইত্যাদি।

পুর (সং) যথা—ভবানীপুর, শ্রীপুর, ধীতপুর, কাদিরপুর, সমসপুর, চৈতপুর, ইছাপুর, বাপুর, কুসুমপুর, কমলাপুর, মামুদপুর, মজিদপুর, সিলিমপুর, ষোলপুর, তন্তিপুর, গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, খিজিরপুর, ধীপুর, সৈদপুর, কুমুদপুর, মধুপুর, সুয়াসপুর, গোবিন্দপুর, শিবরামপুর, তাজপুর, শিকারপুর, সোন্দলপুর, গোপালপুর, মোহনপুর, ঘনশ্যামপুর, আলমপুর, শ্রীধরপুর, লস্করপুর মামুদপুর, বিনোদপুর, উত্তররায়পুর, দক্ষিণ

---

(১) বিক্রমপুর ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (২) 'প্রবাসী' ১৩১১, আশ্বিন। ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (৩) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ও 'বিক্রমপুর' পত্রের ৪র্থ বর্ষের ১২শ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

রায়পুর, দেবীপুর, রাজপুর, কামারপুর, কাজলপুর, মসিমপুর, মহিষপুর, ক্ষুদিদাদপুর।

সাগর—সাগর, সায়র, বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামেই দীঘির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহার কারণ বিক্রমপুরের ন্যায় নিম্নস্থানে লোকালয় গঠনোপযোগী উচ্চভূমির অভাবমোচনার্থ এককালে বহু সংখ্যক জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয় গুলি এতদঞ্চলে 'সার' নামে খ্যাত। সার নামে বিক্রমপুরে বহু গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে। যথা—কনকসার, মহীসার (মাঐসার) জৈনসার, দেওসার, পঞ্চসার, নন্দনসার, সামন্তসার, বেজনীসার, কাকইসার, কান্দনীসার, গণাইসার, ঘড়িসার, পণ্ডিতসার, অনন্তসার, মিঠুসার, ফেগুণাসার, পৌসার, কৈবর্ত্তসার, মামাসার * ইত্যাদি।

পাড়া (সং পাটক) গ্রামের অর্দ্ধভাগের নাম পাটক (হেমচন্দ্র) পাট হইতে ওড়িয়া মরাঠি দ্রাবিড়ি পেট-প্রায়ই বাণিজ্যস্থান। পল্লী হইতে পাড়া নহে। পাড়াগাঁ পাটক ও গ্রাম। পল্লী-ক্ষুদ্রগ্রাম-(মেদিনী) পল্লী-গ্রাম-পল্লী ও গ্রাম)।

পাইকপাড়া, পুরাপাড়া, কাজিপাড়া, সাপাড়া, তেলিপাড়া, মধ্যপাড়া, নাহাপাড়া, সুরপাড়া, বড়ওপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দ্বীপাড়া, কর্কটপাড়া, কুশারিপাড়া, বেহেরপাড়া, আটপাড়া, আরধিপাড়া, গাউপাড়া, হাটের পাড়া, চারিপাড়া, দামপাড়া, ভাটপাড়া, করপাড়া, নপাড়া, পুরাপাড়া, চৈতপাড়া, হরপাড়া, রসিতপাড়া, পোটাপাড়া, সুয়াপাড়া মাইজপাড়া,

---

* কতকগুলি সার বা জলাশয় অদ্যাপি নিজ নামে পরিচিত রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের নামের পশ্চাতে একটী দীঘি শব্দ যুক্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন দশলঙ্গের নাদিমসার দীঘি, শিমুলিয়ার নন্দাইসার দীঘি, বিয়নীয়ার চান্দাসার দীঘি, রাণিহাটির কণাসার দীঘি, সোণারঙ্গের জয়ব্রহ্মসার দীঘি, মাঐসারের মহীসারদীঘি ইত্যাদি। (শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত বিক্রমপুর, ৪র্থ বর্ষ ১২শ সংখ্যা।)

রাড়িপাড়া, কান্দাপাড়া, খালপাড়া, কালিঞ্জিপাড়া, গণকপাড়া, কোলাপাড়া, খিদিরপাড়া, আবিরপাড়া।

তলা—(সংতল অধোভাগ-তলি) তালতলা, চাচইরতলা, বেলতলি, কাঁঠালতলি, ঘোলতলি, চাপাতলি, বৌলতলি, ছাইতানতলি, নিমতলি, আমতলি ইত্যাদি।

চর—(চড়াভূমি-নদীর মধ্যে কিংবা পরে উত্থিত ভূমি) মূল-চর, চরডুমরখোলা, তিপিরচর, ইমামচর, চরবিশ্বনাথ, সাতুরচর, চন্দেরচর, চরমর্দ্দন ইত্যাদি।

খাল—(সং খল্ল-গর্ত্ত, কিংবা সংখাত-খাই খাল ও খালা ব্যুৎপত্তিতে এক। খাল-বিশিষ্টস্থান-খালি)—কেউটখালি, গোয়ালখালি, বাইরেখালি, রাড়িখাল, খালপাড়, তুলসিখালি, কুমারখালি, মহেশখালি ইত্যাদি।

গঞ্জ—(সংগঞ্জ আকর, মদিরাগৃহ-হেমচন্দ্র) ক্ষাসীগঞ্জ অর্থে বাণিজ্য স্থান) মুন্সীগঞ্জ, ধর্ম্মগঞ্জ।

কান্দ কান্দি– (স্কন্ধ শাখা হইতে) ভূমি খণ্ডের শাখা কান্দি।—বিক্রমপুরের কতকগ্রামের নাম কান্দা বা কান্দি নাম সংযুক্ত উহার অপর অর্থ নদীতীরস্থ উচ্চভূমিকে ও বুঝায়। যথা—বারকান্দি, বেহারকান্দি, গোরকান্দা, ঘোলকান্দা ইত্যাদি।

হাট বা হাটি (সং-হট্ট) যথা—নাগেরহাট, গদীহাট, মুন্সীরহাট, বাকুহাটি, সেনহাটি, সিংহেরহাটি, রাণীহাটি, বেজেরহাটি, জগন্নাথহাটি, কোরহাটি ইত্যাদি।

বাটী-বাড়ী—(সং আবৃতস্থান, ঘের যায়গা বাট-প্রাচীর। প্রাচীর বেষ্টিত স্থান ওবাট ও বাটি।) বাটী হইতে বাড়ী যথা :—রাজাবাড়ী, বল্লালবাড়ী, কেদারবাড়ী, দেউলবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী, এতদ্ব্যতীত গড়, চক, বেড়, ঘর, বাজার, খাড়া, কূল, বতী, ঘাট, বন্দ, ভোগ, আ, ইয়া, উয়া, মণ্ডল

বিল, দহ অল্ আলি ইত্যাদি শব্দ নামের শেষে যুক্ত হইয়া গ্রামের নাম হইয়াছে।

আবার বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম হইতে উহার মুসলমান প্রাধান্য বুঝাযায়। তাহারও কয়েকটির নামোল্লেখ করিলাম। যথা :—সেরাজাবাদ সেরাজদিখাঁ, নবীর পুকুর পাড় (নৈরপুকুর পাড়) ইসাপুর, ইছাপুর, কাজিরপাগলা, কাজিরকস্‌বা, কাজীবাড়ী। বান্দেগাঁও, মালথানগর রাড়িখাল, আলমপুর, তাজপুর,রসুনিয়া, ইদ্রাকপুর (মুন্সীগঞ্জ) মোল্লাবাড়ী, নুরপুর, কাজিকস্‌বা, মিরকাদিম, নগরকস্‌বা আবদুল্লাপুর, মামুদপুর, ইত্যাদি। আবার কয়েকটী গ্রামের নামের মধ্যে বিশেষত্বও দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন, কলিকাল, পয়সা, কলিকাতা ইত্যাদি।

বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রামের পুরাতন নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরর উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফল! ফলে প্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া ঐসকল গ্রাম নূতন নাম ধারণ করিয়া একরূপ অপরিচিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করিলাম যথা—কামারখাড়া—স্বর্ণগ্রাম, ফুরসাইল—ফুল্লশালী, চামারদী—চম্পকদী, সোণারটং—সোণারঙ্গ, মাঐসার—মহীসার, সেকেরনগর—শেখরনগর।

নদী, খাল ও পথ ঘাট।—বিক্রমপুর নদী বহুল দেশ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-প্রণালীতে সমস্ত বিক্রমপুর পরিবেষ্টিত। এজন্য ইহা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বস্তুতঃ এই সমস্ত নদী ও খালগুলি দ্বারাই বিক্রমপুরের আভ্যন্তরিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে।

উত্তর বিক্রমপুরের জলপ্রাণালীগুলির মধ্যে সেরেজদিঘার নীচে লুপ্তা-

---

* ভূতপূর্ব্ব 'নবনূর' সম্পাদক মৌলভি সৈয়দএমদাদ আলি মহোদয় বিক্রমপুরের গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে 'বিক্রমপুর' পত্রে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন।

বশিষ্ট ইচ্ছামতী নদী, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদ, পদ্মা, মেঘনাদ; ধলেশ্বরী, বহরের খাল, হল্‌দিয়ার খাল, মিরকাদিমের খাল, তালতলার খাল, মাকুয়াটির খাল, রাজাবাড়ীর খাল, হাঁসাইলের খাল ও ধানকুনিয়ার খাল, এই কয়টী সর্ব্বপ্রধান। এই সকল কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর খাল ইত্যাদি বাহির হইয়া বিক্রমপুর ছাইয়া ফেলিয়াছে। তালতলার খালটী পদ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে; এইশাখা খালটী উত্তর বিক্রমপুরকে প্রধানতঃ পূর্ব্ববিক্রমপুর ও পশ্চিম-বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। লৌহজঙ্গ বন্দরের পূর্ব্বাংশ বিধৌত করিয়া পদ্মার অপর যে শাখা উত্তর বাহিনী হইয়া ধানকুনিয়া, কনকসার, কোরহাটী, হল্‌দিয়া, শ্রীনগর, ষোলঘর ও হাসারা প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা আবার পশ্চিম বিক্রমপুরকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এইটী হল্‌দিয়ার খাল বলিয়া সুপরিচিত।

বিক্রমপুর নদ-নদী-সঙ্কুল দেশ হইলেও এখন ইহার প্রধান প্রধান নদী ও খাল গুলির সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ খালগুলিতেই জল থাকে না; তবে এই সমুদয় খালের মধ্যে হল্‌দিয়ার খাল, তালতলার খাল, মিরকাদিমের খাল এবং বহরের খাল বিখ্যাত হল্‌দিয়া এবং তালতলার পয়ঃপ্রণালীদ্বয় বিক্রমপুরের মধ্যদিয়া পদ্মা নদীর সহিত 'ধলেশ্বরী'কে সংযুক্ত করিয়াছে এবং মিরকাদিমের বিখ্যাত খালটী 'ধলেশ্বরী' হইতে বাহির হইয়া মাকুহাটী গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে। এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালীগুলি দ্বারা 'পদ্মা' হইতে 'ধলেশ্বরী' এবং 'ব্রহ্মপুত্রে' যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে; পদ্মা মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা

এই রাস্তা প্রায় ২৫।৩০ মাইল সোজা, কাজেই কলিকাতা, যশোহর ফরিদপুর, বরিশাল' শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ঢাকার মহাজন-গণের নৌকা-পথে মাল আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

আমদানী ও রপ্তানি—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, কলিকাতা, আসাম, পাবনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, ডিব্রুগর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্ব্বদা বিস্তর পণ্যবাহী বাণিজ্য তরণী সমূহ বিবিধ নদ, নদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা, মেঘনাদ, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী প্রভৃতি নদ, নদীতে পতিত হইয়া তথা হইতে বহরের খাল, ধানকুনিয়ার খাল, হল্‌দিয়ার খাল এবং মিরকাদিম প্রভৃতি বহু খাল অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

আমদানী:—কলিকাতা হইতে সোনা, রূপা, লোহা, কাপড়, ছাতা, জামা জুতা ও মনোহারী দ্রব্য; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে ডাইল, গুড় ও ভূষিমাল; গয়া হইতে গুড়; রেঙ্গুন ও চাটগাঁও হইতে ফারাই কাষ্ঠ ও আতপ তণ্ডুল; আসাম, আলিপুরদুয়ার, ভাতখাওয়া-গৌরীপুর, বিলাসীপাড়া, জুগীখোপা, বগ্‌রীবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শালকাষ্ঠ ও এণ্ডি, তসর, মুগা প্রভৃতি; বরিশাল ও বাখরগঞ্জ হইতে চাউল, ডাইল, নারিকেল, গুড়, শ্রীহট্ট হইতে মুলিবাস, কমলা, খলপা; ত্রিপুরা হইতে মূলি ও কাঠ; রংপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক; নোয়াখালী হইতে নারিকেল, সুপারী, চিকনাই; যশোহর তারপুর, গাজিপুর ও কেশবপুর হইতে চিনি, গুড়; গোয়ালন্দ ও রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা; ডিব্রুগড়, শিবসাগর হইতে বেত প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর গুলিতে আমদানী হইয়া থাকে।

রপ্তানি—বিক্রমপুর হইতে পিত্তলের বাসন, জোলার কাপড়, ছিট ও লুঙ্গী, পাট, চামড়া, ঘৃত, মৎস্য ও মৃণ্ময় বাসন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে

প্রভৃতি গ্রামে পিত্তলের উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়, প্রতিদিন লৌহজঙ্গ ষ্টেশন হইতে এই সমস্ত বাসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। নাগেরহাট ও শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারগণের প্রস্তুত পুতুল জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। থাকে এতদ্ব্যতীত মুন্সীগঞ্জের (রামপালের) কলা ও মূলা ; সেরেজ-দিঘার পাতক্ষির ও ঘৃত প্রভৃতি মিরকাদিম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের পান, ষোলঘর, হাসাড়া, শ্রীনগরের ডেঙ্গার কই মৎস্য পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে রপ্তানি হয়। পূর্ব্বে রামপালের পাতিল গুড় নানা স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি হইত ; কিন্তু ইক্ষুর চাষ হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন উক্ত গুড় দ্বারা স্থানীয় অভাব ও পূরণ হইতেছে না। দেশীয় কুলুর ঘানিতে অল্পাধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশান্তর হইতে গমনাগমন। বিক্রমপুরে বিদেশাগত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয় ; ইহারা বিক্রমপুরের বাণিজ্য প্রধান স্থানে স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে দোকান করিয়া ব্যবসার কার্য্য করিয়া থাকে।

ফরিদপুর জেলার সাহাগণ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্দর সমূহে স্থায়ী দোকান করিয়া বাতাসা ও কদমা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

'বাইদা' নামক একশ্রেণীর পার্ব্বত্য, অসভ্য জাতীয় লোক বিক্রমপুরের বাণিজ্যবন্দর সমূহের নিকট নৌকাযোগে বসবাস করিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষ ; ইহারা হাটে বাজারে দোকান পাতিয়া এবং 'গাওয়ালে' (১) বহির্গত হইয়া, মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহারা নদী, খাল বিল হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঝিণুক

(১) গাওয়াল—গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বিক্রয় করাকে "গাওয়াল"

সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে, ধোপাগণ এই ঝিণুক দ্বারা চূন প্রস্তুত করে এবং শিল্পিগণ ইহা দ্বারা বোতাম, চেইন ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

প্রতি বৎসর শীতের প্রাক্কালে বিক্রমপুরের বন্দর সমূহে পশ্চিম দেশীয় ধুনকর, চামার, ক্ষৌরকার, মাটিয়াল ও বেহারা আসিয়া থাকে; ইহারা শীতের কয়েক মাস নিজনিজ ব্যবসার কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মুন্সীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দরে বার মাসই চামার থাকে; প্রসিদ্ধ বন্দরগুলিতে পশ্চিমা ক্ষৌরকারগণও সর্ব্বদাই থাকে; পশ্চিম দেশীয় কুলিগণও সর্ব্বদা বাণিজ্য প্রধান স্থানে থাকিয়া ব্যবসা চালায়। বেহারাগণ বর্ষার সময় দেশে চলিয়া যায়। শ্রীহট্ট জেলার নমঃশূদ্রগণও এখানে বেহারার কার্য্য করিতে আসিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কুমিল্লা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বহু সংখ্যক ধীবর শিং মৎস্য ধরিবার জন্য বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে আসিয়া থাকে; ইহাদের শিং মৎস্য ধরিবার প্রণালী এক অভিনব প্রকারের। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চাই' পাতিয়া যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মৎস্য ধরে সেরূপ কৌশল বিক্রমপুরের ধীবরগণ পরিজ্ঞাত নহে। ইহারা ৩।৪ মাস এই ব্যবসায় করিয়া আশ্বিন মাসে দেশে ফিরিয়া যায়। বিক্রমপুরে ইহারা **'ভাইয়া'** বলিয়া পরিচিত।

পারজোয়ার অঞ্চলের নমঃশূদ্রগণ বিক্রমপুরের বন্দর সমূহ হইতে ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জে গহেনার নৌকা পরিচালন করিয়া থাকে। কুলিরা সাধারণতঃ সমস্তই পশ্চিম দেশীয়।

ফসল কাটার সময় বহু সংখ্যক মুসলমান মজুর এই স্থান হইতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে ধান কাটিতে যায়।

বিক্রমপুরের কুম্ভকারগণ মৃণ্ময় তৈজস পত্রাদি বোঝাই করিয়া

পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে "গাওয়ালে" বহির্গত হয়; ইহারা হাঁড়ি পাতিলের বিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিয়া থাকে; এখন অন্য জাতীয় লোকেও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।

পথ ঘাট ও যাতায়াত। বাণিজ্য প্রধান স্থান হইতে ঢাকা মুন্সীগঞ্জে যাতায়াতের গহেনার নৌকা আছে; প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই সর্ব্বদার জন্য 'কেরাইয়া' বা 'ভারাটিয়া' নৌকা থাকে। নদী তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ষ্টীমার ষ্টেসন বা জাহাজ ঘাটা আছে; কলিকাতা অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ মহাজনগণের মাল পত্র জাহাজ ও নৌকা যোগেই আইসে। সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই ডাকঘর আছে; তার ঘরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। মোট বহিবার জন্য পশ্চিমা কুলি পাওয়া যায়। মহাজনগণের মাল সরবরাহের জন্য "খরার" দিনে ঘোড়া পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী—বণিক, তিলি, কুণ্ডু ও সাহাগণই বিক্রমপুরের প্রধান ব্যবসায়ী। ভাগ্যকুলের কুণ্ডু পরিবার ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া ক্রোড়পতি হইয়াছেন, ইঁহাদের স্বকীয় কয়েকখানা জাহাজ কলিকাতা হইতে মাল বোঝাই করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য প্রধান স্থানে যাতায়াত করে।

বিক্রমপুরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে, কোনও হাটে বাজারে বা বাণিজ্য বন্দরে তাহাদের স্থায়ী দোকান নাই। ইহারা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাউল, ডাইল, মরিচ, হলুদ, গুড় ও তরি-তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া কোনও মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহাকে 'ভাসানি' কাজ বলে। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী পরিদৃষ্ট হয়, ইহারা গাওয়ালে বহির্গত হইয়া লবণের বিনিময়ে মৌচাক

সংগ্রহ করে; পানিয়া, তস্তর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরের ধীবরগণের মৎস্যের ব্যবসায় বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহারা পদ্মানদীতে, ধলেশ্বরী ও মেঘনাতে বিবিধ প্রকারের জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ইহারা পদ্মার নানাস্থানে 'জগৎবেড়' জাল ফেলিয়া যেরূপভাবে মৎস্য ধরে তাহা দর্শনযোগ্য; এই জাল ৩।৪ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ফেলা হয় এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া উহার মৎস্য ধরা চলিতে থাকে; সময় সময় প্রতি বেড়ে ৩।৪ হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের মৎস্যও ধরা পড়ে। এই সমস্ত মৎস্য সাধারণতঃ কলিকাতাতেই অধিক পরিমাণে প্রেরিত হয়। বর্ষার সময়ে ধীবরগণ ভীষণতরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও যেরূপ সুকৌশলে ও অবলীলাক্রমে নৌকা পরিচালনা করিয়া ইলিস মৎস্য ধরে, তাহা বাস্তবিকই দর্শনযোগ্য। পদ্মার ইলিস মৎস্য খুব সুস্বাদু।

হাট ও বাজারের বিবরণ—বিক্রমপুরের হাট বাজার-গুলির একটী বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিশেষ বিশেষ জিনিষ ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ হাট, বাজার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ধানুকুনিয়ার হাট, ভাওয়ারের হাট, শ্রীনগরের হাট, সেরেজদিঘার হাট, হাসারার বাজার কচ্ছপ (বা কাউঠা) ও ছাগ বিক্রয়ের জন্য; মুন্সীগঞ্জ, ভীলাকান্ডি, করিমগঞ্জ, ভিরুজখাঁ, দেউলভোগ, ইমামগঞ্জ, কেদারপুর প্রভৃতি হাট গরুবিক্রয়ের জন্য; ভরাটেকর, কলমা ও আরিয়েলের হাট নৌকা বিক্রয়ের জন্য; ধানকুনিয়া, ভাওয়ার ও শ্রীনগরের হাট, ঘাস ও বাঁশ বিক্রয়ের জন্য; খরিদ ও শিমুলিয়ার হাট কারিকরের কাপড় বিক্রয়ের জন্য; হলদিয়া, কনকসার, দিঘীরপার ও তালতলা প্রভৃতি বন্দরগুলি কাঠ বিক্রয়ের জন্য, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, শেখেরনগর, দেউলভোগ, ভাওয়ার

প্রভৃতি বন্দর, আবগারী জিনিষ বিক্রয়ের জন্য এবং হলদিয়ার বন্দর লৌহ-ব্যবসায়ের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, শ্রীনগর, রাজানগর, সেরেজদিখাঁ প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পাট, পাথুরিয়া কয়লা, লবণ ও কেরোসিন তেলের বিস্তৃত কারবার আছে; আবদুল্লাপুর ও মিরকাদিম বন্দরে আরতদারী ক্রয় বিক্রয়ের বিস্তৃত দোকান আছে। পূর্ব্বে রাজানগর, সেরেজাবাদ, ইছাপুরা ও হাসাইল প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল কিন্তু এখন সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, বহর, হলদিয়া, আবদুল্লাপুর, ফিরিঙ্গী-বাজার, রিকিবিবাজার, মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ, দিঘীরপাড়, তালতলা ও সেরাজদিখাঁ প্রভৃতি বন্দরগুলি বিক্রমপুরের মধ্যে প্রধান আমদানী ও রপ্তানির স্থান।

লৌহজঙ্গের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান স্থান, নারায়ণগঞ্জের পর পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই; কিন্তু এই প্রাচীন বন্দরটী বিগত ১৩২২ সনের বর্ষার জলপ্লাবনে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মানদীর কুক্ষিগত হওয়াতে সম্প্রতি স্থানান্তরে নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোমরপুর কাঠের কারবারের একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, এই বন্দরটীও পদ্মারগর্ভে বিলীন হইয়াছে; এখন কোমরপুর গ্রামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই; কোমরপুরের সন্নিকটবর্ত্তী উয়ারী গ্রামে অল্পদিন যাবৎ একটী বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বহর একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, এস্থানের চৌধুরীদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিল এবং বহর একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানটী ১০।১২ বৎসর হয় রাক্ষসী 'কীর্ত্তি-নাশা' নিজ কুক্ষিগত করিয়াছে। তালতলার বন্দরটী ধলেশ্বরী তীরে অবস্থিত, কতিপয় বৎসর যাবৎ ধলেশ্বরীও পদ্মার ন্যায় ভাঙ্গিয়া ইহার আয়তন অনেক খর্ব্ব করিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ বন্দরগুলিই নদী অথবা খালের তীরে অবস্থিত।

পদ্মাতীরে—ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ বা তারপাশা, রাজাবাড়ী ও বহর।

ধলেশ্বরী তীরে—তালতলা, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর ও মুন্সীগঞ্জ।

ইচ্ছামতী তীরে—সেরেজদিখাঁ, বাহিরঘাটা ও বাউৈথালি প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খালগুলির তীরে ও বহু বন্দর অবস্থিত।

রামপাল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহার সমৃদ্ধির সময় এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, অদ্যাপি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদ কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরী ষোড়শ শতাব্দীতে একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর ছিল; বিদেশী পর্য্যটকগণও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; শ্রীপুর নৌ-শিল্পের কেন্দ্রস্থান ছিল, এস্থানে একটী পোতাশ্রয় ছিল; শ্রীপুরে আগ্নেয়াস্ত্র পর্য্যন্তও নির্ম্মিত হইত। তৎকালে এস্থানে গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের আফিস বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ রাজবল্লভের রাজনগরে 'রাজসাগর' নামক একটা হ্রদের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট' নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর ছিল। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল; সে কালের সভ্যতা এবং রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদায় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। এই বন্দরটী সর্ব্বদাই জনকোলাহল মুখরিত থাকিত।

কালীপাড়া (বা কাওলীপাড়া), নপাড়া প্রভৃতি স্থান এক সময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিল; উহা এখন পদ্মাগর্ভে নিহিত হইয়াছে, উক্ত উভয় স্থানই তৎকালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল।

ওজন—বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র জিনিষের ওজন প্রায় সমান; স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্যও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ৮০ তোলার ন্যূন কোথাও সের ধরা যায় না, তবে পাইকারী ও খুচরা ভেদে ওজন সাধারণতঃ ৮০, ৯২ এই দ্বিবিধ প্রকারের; কিন্তু তাহাও সর্ব্বত্র সমান নহে, স্থানে স্থানে ৮২৷৷৵০ আনা, ৮৪৷৷৵০ আনা এবং ৯০ তোলায়ও সের ধরা হয়, সেরেজদিখাঁ ও মিরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয় কালীন ৯০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। পাইকারী ক্রয় বিক্রয় কালিনও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত জিনিষের ওজন সর্ব্বত্র ৮২ তোলায়, কিন্তু কলিকাতা হইতে আমদানী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পাইকারী ক্রয় বিক্রয় কালীন কোন কোন জিনিষের মণ প্রতি ৵১০ পোয়া হইতে ৵৷৷০ সের পর্য্যন্ত বেশী দেওয়া হয়; ইহাকে 'চলক' বা 'লাভান' বলে; এবং প্রতি ৫৲ মণ জিনিষের উপর ৵১০ বেশী দেওয়া হয়, ইহাকে 'চাইলা' বলে। 'সোরা' মাছ বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই ওজন দরে বিক্রীত হয়।

1824c 013

বিক্রমপুর পরগণার জন সংখ্যা।

উত্তর বিক্রমপুর

	গ্রামের বর্গমাইল্ সংখ্যা	জনসংখ্যা ১৯১১	জনসংখ্যা ১৯০১	তারতম্য ১৯১১—১৯০১	তারতম্য জনসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলের
মহকুমা মুন্সীগঞ্জ	৩৮৬	১,০১২	৬৯২,৪০৭	৬৩৩,২৬৪	+৯,৩৪ ১,৭৯৪
মুন্সীগঞ্জ থানা	১৯৭	৫৩৫	৩১৫,২২১	২৯৫,৫০৫	+৬,৬৭ ১,৬০০
শ্রীনগর থানা	১৮৯	৪৭৭	৩৭৭,১৮৬	৩৩৭,৭৫৯	+১১,৬৭ ১,৯৯৬

মুন্সীগঞ্জ মহকুমা

	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু পুরুষ	হিন্দু স্ত্রী	মুসলমান পুরুষ	মুসলমান স্ত্রী
মুন্সীগঞ্জ থানা	২৪৯,৯২৪	৪৭,১৯৮	৫২,০৬০	৭৫,০৩০	৭৫,৬১২
রাজাবাড়ী থানা	৬৫,২৯৭	১১,৩৩৬	১১,৯৪৫	২১,৩২৭	২০,৬৮৯
শ্রীনগর থানা	২৩৪,৬২৮	৫৫,৪৫৯	৬৮,১২৫	৫২,১১১	৫৮,১৮১
লৌহজঙ্গ থানা	১৪২,৫৫৮	২৮,৬৬০	৩৩,৮৪৮	৩৭,৭১৯	৪২,৩২৮
	১৪২,৬৫৩	১৬৫,৯৭৮	১৮৬,১৮৭	১৯৬,৮১০	

বিক্রমপুরের লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা।

	মোট লেখা পড়া জানার সংখ্যা পুরুষ	মোট লেখা পড়া জানার সংখ্যা স্ত্রী	মোট ইংরেজী লেখা পড়া জানার সংখ্যা পুরুষ	মোট ইংরেজী লেখা পড়া জানার সংখ্যা স্ত্রী
মুন্সীগঞ্জ মহকুমা	৫৮,৪০৪	৯,৫৯০	১০,৩১৪	১৮১
মুন্সীগঞ্জ থানা	২৮,৩৪৬	৪,৩২০	৪,৯৩৩	৮৪
শ্রীনগর থানা	২০,০৫৮	৫,২৭০	৫,৩৮১	৭৮

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নৈরার ঘটকচৌধুরী বংশ ও কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত।

আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও বঙ্গের প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগণের বংশ বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের একটী প্রধান অংশ গঠিত হইয়াছে। আদিশূরের পরবর্ত্তী কালে বল্লালসেন কৃত কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপনের ফলে কুলীন শ্রোত্রিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়গণের বংশ-পত্রিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা, দেশ প্রচলিত পুরাতন আখ্যায়িকা, বংশপরম্পরাগত কুল-কাহিনীর সাহায্যে অনেক পুরাবৃত্তের উদ্ধার সাধিত হইতে পারে। প্রাচীন কুলগ্রন্থ, কাহিনী ও অখ্যায়িকার সাহায্যে এই বংশের যত দূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থলে বিবৃত করিলাম; বৈষয়িক ও পারিবারিক সম্বন্ধে সম্পর্কান্বিত কোনও বংশের ইতিহাসে বা পৌরাণিক কাহিনীতে ইহাদের পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহা অতিশয় আদরের হইবে। যেই সকল বংশের সহিত ইহাদের কিছু না কিছু সম্বন্ধের উল্লেখ দেখা যায় তাহার কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করিলাম।

১। চাঁদসীর কুশারী শ্রোত্রিয় নীলকণ্ঠ মজুমদার, ইনি মুরশিদাবাদের নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন।

২। রামভদ্রপুরের গোঁসাই ভট্টাচার্য্য-চাঁদরায় ও কেদাররায়ের গুরু বংশ। অসম্বন্ধ আখ্যায়িকার সহিত ইঁহাদের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক সম্বন্ধ দেখিতে না পাওয়াতে ইহাদিগের নাম সন্নিবেশিত হইল।

৩। মূলপারার সরদার বংশের উল্লেখ শুনা যায় কিন্তু ঐতিহাসিক সম্বন্ধের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

৪। জপসার লালা বংশের সহিত এই বংশের অমরনারায়ণ রায় হইতে গুরুভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ। বিষয় ব্যাপারে ইহারা পরস্পরের সাহায্যকারী ছিলেন।

৫। কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত নুরনগর পরগণার অধীনে গাজী বংশের অনেক দলিল প্রাচীন কাগজের সহিত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার কোনও সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।

মুসলমানাধিকৃত বঙ্গের ইতিহাসের সহিত এই বংশের কিছু সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বঙ্গের সম্পূর্ণ বা প্রাদেশিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত তাঁহাদিগের কোনও কার্য্যে আসিতে পারে বলিয়া এবং কৌলীন্যের মেল বন্ধন সময়ের পূর্ব্ব হইতেই এই বংশ এই নরিয়া গ্রামে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়াও ঐতিহাসিকের নিকট ইহার বিশেষ মূল্য আছে বিবেচনায় এই বংশ-কাহিনী প্রকাশ করিলাম।

মিশ্রগ্রন্থে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন সময়াবধি যে ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব গাঙ্গুলী (গ্রাম নিবাসী বা) গাই সাবর্ণ গোত্রিয় শিশুরাম কুলপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বেদগর্ভের পুত্র বীরব্রত, তৎপুত্র সোডন, তৎপুত্র সৌরী তৎপুত্র পীতাম্বর তৎপুত্র দামোদর তৎপুত্র কুলপতি তৎপুত্র শিশু, শম্ভু, হাস্য ও প্রভাকর। রাঢ়ীশ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রিয় ব্রাহ্মণ সকলেই এই বেদগর্ভের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। শিশুর পুত্র গদাধর, তাহার পুত্র হলায়ুধ * হলায়ুধের পুত্র আয়ু ও তাহার পুত্র বিণায়ক। বিণায়কের তিন পুত্র শিব, শূলপানী ও মাধব। মাধবের সাত পুত্র দামোদর, কামদেব, গোপাল, নারায়ণ, লোহাই, হরিরাম ও

* কিংবদন্তী হইতে জানা যায় হলায়ুধ সেন-নৃপতি লক্ষ্মণসেনের সভাপতি ছিলেন।

শ্রীরঙ্গ। গোপাল গাঙ্গুলীর সময় হইতেই তাহার বংশধরগণ নৈরাগ্রামে অবস্থিতি করেন। গোপাল গাঙ্গুলীও গৌড়িনগর হইতে এই দেশে আগমন করেন ও তাহার পূর্ব্ব পুরুষের গোপাল বিগ্রহ লইয়া আসেন। তখন লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরের রাজা, সেই বিগ্রহের সেবার জন্য রাজার নিকট হইতে কিছু দেবত্র ভূমি লাভ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। গোপাল গাঙ্গুলীর স্থাপিত বলিয়া অদ্যাপিও নৈরার গৃহে দেবতা শ্রীগোপাল বিগ্রহ "গোপাল গাঙ্গুলীর গোপাল" বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। গোপাল গাঙ্গুলীর পুত্র চণ্ডিরায় তাহার পুত্র শুভঙ্কর। বহু বয়স পর্য্যন্ত কোনও সন্তানাদি না হওয়াতে সংসারে বৈরাগ্য নিবন্ধন শুভঙ্কর পৈত্রিক গোপাল বিগ্রহ লইয়া সস্ত্রীক ভাগীরথী কূলে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর স্বপ্নে গোপাল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করেন। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে গঙ্গাধর, গঙ্গাবর, গঙ্গাগতি, গঙ্গারাম, গঙ্গাদাস, গঙ্গাহরি ও গঙ্গানারায়ণ। এই সময় হইতেই কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের মেল বন্ধন প্রথা প্রচলিত হয়। গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর নিজ গ্রামের নামে নৈরা বা নরিয়া নামে মেল বদ্ধ হইল।

গাঙ্গে গঙ্গাধরে মেল নরিয়া নাম বিশ্রুত (কারিকা)

গোপাল গাঙ্গুলীর বংশ ও তাঁহার দেবত্র সম্পত্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা আলোচনা করা গেল। গোপালের দেবত্র সম্পত্তির আয়তন কত বড় ছিল তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা কঠিন কারণ (১) তৎকাল প্রচলিত তাম্র শাসনাদি যাহা ছিল বলিয়া শোনা যায় আধুনিক গৃহ-বিবাদে সে সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরে ঐ সকল তাম্রশাসনের ধাতুর মূল্যের অতিরিক্ত অপর মূল্য নাই বিবেচনায় কেবল ধাতু মূল্যেই দ্রব্যাদির সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অভাব সময়ে এই পরিবারের লোকেরা ৪।৫ খানা তাম্র ফলকের

বিনিময়ে তেল লবণাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। তবে বর্ত্তমান তালুক ও হাওলাদির সংজ্ঞার সহিত এই বংশের পূর্ব্বতন পুরুষদিগের ও তাঁহাদিগের কুটুম্বগণের নামের উল্লেখ দৃষ্টে বুঝা যায় যে পোড়াগাছা, শিলঙ্গড় (সেলিম গড়) বকৃসিবাজার, কাণরগাঁও, মূলগাঁও, মুলপাড়া, লোনসিংহ, যোগপাট্টা (যোগীপট্ট) চাকদহ, কুলকাটী ইত্যাদি গ্রামে ইঁহাদের দেবত্র বিস্তারিত ছিল। বর্ত্তমান নরিয়া বা নৈরা নাম ও এই গ্রামের পারিপার্শ্বিক গ্রাম সমূহের অন্যূন ৫০ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে দুই তিন শত বৎর পূর্ব্বে এই সকল নৈরা বা জলাভূমি ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। তদৃষ্টে দেখা যাইবে যে নৈরার দক্ষিণ দিকে ও পশ্চিম দিকে সংলগ্ন যে সকল গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদয়ই জলাভূমিতে স্থাপিত গ্রাম ও তাহাদের নামও সেই সকল জলাকীর্ণতা বাচক।

যথা—মূলপাড়া = বর্ত্তমান সময়ে চড়াভূমিতে যেমন নূতন বসতি পাড়া বা কান্দি ইত্যাদি নাম পাওয়া যায় সেই প্রকার।

মুলনা ও = নাও অর্থাৎ নৌকা বা জলাভূমি সংক্রান্ত নাম।

নোয়াঙ্গা = নোয়াদহ বা নূতন ডোবা স্থান।

নরিয়ার দক্ষিণাংশ বরুণপাড়া, লোনসিংহের কিয়দংশ, নাদিমসার লস্করবাড়ী ভাজনপাড়া প্রভৃতি স্থান যে ষৈয়ার বিলের অন্তর্গত ছিল তাহা প্রায় ৮০ বৎসরের উপরের কথা। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ষৈয়ার বিলের স্থানে স্থানে পৌষ মাস পর্য্যন্ত জল থাকিত। নবীপুর মূলফতগঞ্জ ও কেদারপুর অপেক্ষাকৃত প্রাচীন স্থান বলিয়া কথিত হয়। লোনসিংহের প্রাচীন নাম লোঙ্গাসি লোঙ্গা = কর্দ্দম, কিন্তু এক্ষণে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কয়েকদিন পূর্ব্বের লুরনসিং ও ইদানিং ইংরাজিতে লোনসিং ও বাঙ্গালাঅক্ষরে লোনসিং হইয়াছে। ফলতঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত রাজবল্লভের রাজনগরের প্রাচীন নাম বিলদাউনীয়া ও শ্রীপুর

(কেদাররায়ের রাজধানী) বিল বলিয়া কথিত হইত। অপিচ মুসলমান ভুঁইয়াদের দলিল ইত্যাদিতে ও এই সকল অঞ্চলে অনেক নাওয়া মহালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে এসকল অঞ্চলে প্রকাণ্ড বিল বা জলাভূমি ছিল তাহার আর একটী কারণ এই দেখা যায় যে বর্ত্তমান দক্ষিণ পারে বিক্রমপুরের যে অংশ পতিত হইয়াছে তাহার ইদিলপুর ও কার্ত্তিকপুর পরগণা সম্বলিত কুড়ি কি ত্রিশ মাইল আন্দাজ ভূমিভাগ উত্তরে ও পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনা এবং দক্ষিণে আইরলখাঁ নামক পদ্মার শাখা দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া যে একটী দ্বীপের সৃজন করিয়াছে এই স্থানটুকু এই প্রবাহিনী ত্রয়ের স্রোতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া বিক্রমপুরের উত্তরাঙ্গ ও ত্রিপুরাজিলার অন্তর্গত চাঁদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় অনেক তারতম্য লাভ করিয়াছে। এখানে পূর্ব্বপার বা চাঁদপুরের ন্যায় খেজুর গাছ উৎপন্ন বর্দ্ধিত ও সুফলদায়ক হয়। কিন্তু উত্তর পারে ঈদৃশ নারিকেল খেজুর ও সুপারী গাছ জন্মে না। চাঁদপুরেও নারিকেল ও খেজুর গাছ এরূপ হয় না। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার কৃষিজাত শস্যের এবং আরণ্যপ্রাণীরও বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখনকার কিছু দেখিয়া অন্যূন ৩।৪ শত বৎসরের পূর্ব্বের কোনও বিষয়েরই কিছু স্থির ধারণা করা যাইতে পারে না, যাহা হয় তাহা অনুমান মাত্র।

আর একটী কথা এই যে গোপাল গাঙ্গুলীর ভ্রাতা বা অন্যান্য সন্তানগণের এখানকার পূর্ব্বাবাসের কোনও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর ন্যায় তাহার অপর ভ্রাতাগণও অবশ্য কোনও না কোনও মেলে স্থান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন এই গ্রামে বা কোনও নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখা যায় না। লোনসিংহের গাঙ্গুলী বংশীয়েরা অনেকেই খড়দহ মেলের পরবর্ত্তীকালে এখানে আনীত হইয়াছেন। ইহা হইতে গোপাল গাঙ্গুলী এবং তাহার সন্ততিগণের

বহুপত্নিত্বের একটী আভাস পাওয়া যায় ও ইহা অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত সন্ততিগণ তাহাদের মাতুল-ভবনে প্রতিপালিত হইতেন ও যাহারা পিতৃভবনে বাস করিতেন তাহারাও বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ তাহাদিগের শ্বশুরাশ্রয়ে স্বীয় বংশ বর্দ্ধনের জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। এই বিষয়ে কারিকা ইত্যাদি মিশ্রশাস্ত্রে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে কিছু সুফল পাইবার আশা করা যাইতে পারে।

কারিকাতে উল্লিখিত আছে "গঙ্গাধর গাঙ্গুলী নরিয়া গ্রামে বাস করিতেন। তাহার প্রপিতামহ গোপাল সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কুলে রণ্ডদোষ প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাধরের পিতা শুভঙ্কর কুলকরায় বলাৎকার দোষ প্রাপ্ত হয়। বাবলার জ্ঞানবন্দ্যো রণ্ড দোষ প্রাপ্ত ছিলেন সেইজন্য গঙ্গাধর জ্ঞানবন্দ্যোর সহিত কুল করিয়া ঐ রণ্ড দোষ প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল কারণে গঙ্গাধরের গ্রামের নামে নরিয়া মেল হইল।" মিশ্রশাস্ত্রান্তর্গত কুলরমা গ্রন্থ (রঘুনাথ বাচস্পতি কৃত) হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল।

গঙ্গাধরের পুত্র রঘুনাথ বাচস্পতি, যদুনাথ পণ্ডিত ও বাণীনাথ। নরিয়া মেলের নরিয়ার সাবর্ণ ঘটকগণ রঘুনাথ বাচস্পতি মিশ্রের সন্তান। রঘুনাথ বাচস্পতির পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ঘটকতা ব্যবসায় করেন নাই। তিনিই প্রথম কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং কুলশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার প্রণীত কুলগ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ কুলরমা বা কুলরাম। রঘুনাথ বাচস্পতি ও ধ্রুবানন্দ মিশ্র সমসাময়িক লোক হইলেও ধ্রুবানন্দ মিশ্র যখন বৃদ্ধ, রঘুনাথ তখন যুবা। কথিত আছে ধ্রুবানন্দের নিকট রঘুনাথ কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনাথও দেবীবর সমসাময়িক লোক।

রঘুনাথ বাচস্পতির সন্তানগণ অনেকেই ঘটক উপাধি দ্বারা পরিচিত সুতরাং তাহাদের নাম পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা শ্রীরাম

ঘটক সার্ব্বভৌম, ঘটকশিরোমণি, ঘটকচক্রবর্ত্তী। রঘুনাথ বাচস্পতির কন্যা রাঢ়দেশ হইতে মাধ্যইমেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায় পর্য্যায় হয়েন।" তাহার সন্তানগণ নৈরালমেল প্রাপ্ত হইলে কিন্তু এদিকে নৈরালমেল পালটী হীন প্রকৃতিই রহিয়া গেল। সুতরাং তদবধি নরিয়ার গাঙ্গুলীগণ অপর সকল মেলে কন্যাদান ও নিজেরা শ্রোত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ দ্বারা স্বীয় কৌলিন্য রক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন। লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ কালে ঘটক ভট্টাচার্য্য উপাধিভূষিত ভরদ্বাজ ঘটক বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। ঘটক ভট্টাচার্য্যের সন্ততিগণ অনেকেই দীর্ঘকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। অধুনা কীর্ত্তিনাশার গ্রাসে পতিত হইয়া নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

রঘুনাথ বাচস্পতির দ্বিতীয় ভ্রাতা যদুনাথ পণ্ডিত যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। অদ্যাপি সেখানে তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

শ্রীরাম ঘটক সার্ব্বভৌমের পুত্র গোবিন্দ ঘটক রায় তাহার পুত্র কৃষ্ণজীবন ঘটক বিশারদ। গোবিন্দ ঘটক রায় ও কৃষ্ণজীবন বিশারদের সময়ে গোপালের দেবত্র সম্পত্তির বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সময়ে মোগল বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ, কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে এই অঞ্চলে আগমন করেন। কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুর বা আড়াফুলবাড়িয়া নরিয়ার উত্তরের গ্রাম। মানসিংহের সৈন্যগণ নরিয়ার দক্ষিণ দিকে যে স্থানে ছাউনি স্থাপন করে তাহার নাম তাঁহারাই "সেলিম গড়" রাখেন। বর্ত্তমানে উচ্চারণ বিকৃতি প্রভাবে উহাকে সিলঙ্গড় কেহ কেহ বা বর্ণ বিপর্য্যয় করিয়া শিড়লগ কহিতেও ত্রুটি করে না। সেলিমগড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রাম ক্ষত্তেজঙ্গ-পুরও মানসিংহের জয়ের ধ্বজা নিজ নামের সহিত জড়াইয়া অদ্যাপি

বহন করিয়া আসিতেছে। সেলিমগড় কি ফতেজঙ্গপুর হইতে উত্তরাভিমুখে অভিযান করিতে হইলে নরিয়া পথের মুখেই পতিত হয়; কাজেই নরিয়ার ঘটক ব্রাহ্মণগণ তখন পৈত্রিক বিগ্রহ ও প্রাণ লইয়া হয়ত কোনও স্থানে পালাইয়া জীবন রক্ষা করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। তখন আর বিত্ত সম্পত্তি কে দেখে? তখনকার বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুই জানা যায় নাই। তবে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের ইতিহাসের সঙ্গে অমিতবলশালী ও ভোজনপটু এক গৌরী ঘটকের নাম শুনা যায়। সেই গৌরী ঘটক কৃষ্ণজীবন বিশারদের কনিষ্ঠ গৌরী কিনা বলা যায় না। গৌরীঘটকের বলশালীত্বের ইতিহাসে শুনা যায় তিনি নাকি কোথাও যাইবার সময় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইলে একখানা ভাসমান ডিঙ্গি নৌকা (৯ হাত দীর্ঘ) টোকার মত মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন। ইদিলপুরের কায়স্থ জমিদার বাড়ীতে অতিথি হইয়া তাঁহাকে আহার্য্য পাকের জন্য যে সের দেড়েক চাউল দেওয়া হইয়াছিল তাহা দ্বারা তিনি জলযোগ করিয়াছিলেন। এই প্রকার আরো অনেক ঘটনা গৌরী নামে জড়িত আছে।

চাঁদ রায় ও কেদাররায়ের প্রচলিত কাহিনীতে গৌরী ঘটকের নামের উল্লেখ দেখা যায়। বাচনিক শ্রুত একটী বহুকালের প্রচলিত পুরাতন গ্রাম্য কবিতার গুটী দুই চরণে এক গৌরিকিশোর বা গৌরকিশোর রায়ের নামের উল্লেখ দেখা যায় তাহা এই :—

*　　*　　*　　*

রাজা (গৌরকিশোর) গৌরিকিশোর রায়।
তুমি রৈলে মাটীর তলে কি হবে উপায়। ধ্রু

*　　*　　*　　*

রাজা মানের লস্করে নেয় হাতে দিয়া বেড়ী।
লক্ষীকান্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ী বাড়ী॥

মূলকথা কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের রাজ্যের সহিত ইঁহাদের কোনও সংস্রব থাকুক বা না থাকুক মানসিংহের সৈন্যাদির পরিচালনে ইঁহারা যে অতিশয় হীনাবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণজীবন বিশারদের চারি পুত্র রাঘবেন্দ্র, যাদবেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও ইন্দ্র-নারায়ণ। রাঘবেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র নিঃসন্তান। রাজেন্দ্রের সন্তানগণ লোনসিংহ, পুরাপাড়া, সেলিমগড় প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

ইন্দ্রনারায়ণের সময় হইতেই নরিয়ার ঘটকগণ রায় চৌধুরী উপাধি ও গুণানন্দি পরগণায় জমিদারী লাভ করেন। কথিত আছে ইন্দ্রনারায়ণ বাল্যকালে অতিশয় রূপবান ও ক্রীড়াপরায়ন ছিলেন। গ্রামের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে দোস্ত * ফিরিঙ্গি নামে একজন পর্ত্তুগীজ বণিক জনৈকা নীচকুলোদ্ভবা সুন্দরীর প্রেমে জড়িত হইয়া বাস করিতেন। তাঁহার প্রভূত ধন-সম্পত্তি ছিল কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। ইন্দ্রনারায়ণ ক্রীড়া ব্যাপদেশে প্রায়ই মাসে মাসে যাইয়া দোস্ত সাহেবের সহিত দেখা করিত। দোস্ত সাহেবও নাকি ইন্দ্রনারায়ণকে তাহার উদ্যান-প্রসূত নানাবিধ সাময়িক ফল মূলাদি দ্বারা তুষ্ট করিতেন। ফলে সেই বৃদ্ধ ও কিশোরের মধ্যে একটী মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। দোস্ত ফিরিঙ্গি ও তাহার রমণী পরিশেষে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার ইন্দ্রনারায়ণকে (তাহাদের আদরের নাম ইন্দু'রয়াকে) না দেখিতে পাইলে বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া তালাস করিয়া যাইত। ক্রমে দোস্ত সাহেবের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। রোগশয্যায় পতিত হইয়া দোস্ত সাহেব ইন্দ্রনারায়ণকে ৭ মটকি রৌপ্যমুদ্রা (গোটি টাকা) দান করিলেন ও যাবৎকাল তাহার প্রণয়িনীর তত্ত্বাবধান করিতে কহিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ তাহার বাক্য যথা শক্তি পালন করিয়াছিল।

* ভূতপূর্ব্ব Assistant Settlement officer Mr Ascoley ইহাকে De'coster নাম দিয়াছেন।

দোস্ত সাহেবের মৃত্যুর পর প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া ইন্দ্রনারায়ণের অবস্থা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল। সাহেবের মৃত্যুর ছয়মাস অতীত না হইতে হইতেই তাহার প্রণয়িনী পরপারের পথে তাঁহার অনুসরণ করিলেন সুতরাং তাহার অংশের অপর ৫ মটকি ধনও ইন্দ্রনারায়ণের হস্তগত হইল। বহুতর ধনের অধীশ্বর হইয়া ইন্দ্রনারায়ণ ধন দ্বারা নবাবকে তুষ্ট করিয়া রায় চৌধুরী উপাধির সহিত গুণানন্দী পরগণার জমিদারী লাভ করেন ও পরগণা গ্রাবন্দর ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামিলাত তালুক সমূহের পুনরুদ্ধার করেন। নিজ জমিদারী গুণানন্দী পরগণার অন্তর্গত নিজ গ্রামের কিয়দংশ ভূমিও বিক্রমপুর পরগণার অধীন কিয়দংশ ভূমি তালুক ঘটক ভট্টাচার্য্য নামে আখ্যাত।

রঘুনাথ বাচস্পতি তদীয় দৌহিত্র রামচরণ ঘটকরত্ন ঘটক ভট্টাচার্য্যকে যে ভূমিদান করেন পরবর্ত্তীকালে তাহাই **তালুক ঘটক ভট্টাচার্য্য** নামে অভিহিত হয়। ইন্দ্রনারায়ণ রায় ঘটক চৌধুরী গুণানন্দীর জমিদারী লাভ করিয়া যে **গড়** বেষ্টিত বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন সেই গড়ের মধ্যে ঘটক ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ও বাজার সন্নিবেষ্টিত ছিল, তাহাতে ইহাই অনুমান হয় যে বহুকাল পর্য্যন্ত ঘটক ভট্টাচার্য্য ও ঘটক চৌধুরীগণ এক পরিবারের ন্যায় এক বাড়ীতেই বাস করিতেন।

এই গড় পরিখার অভ্যন্তরে ইন্দ্রনারায়ণের নিজ বসত বাটী, ঘটক ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, বাজার, পুরোহিত, শিকদার, ধোপা, নাপিত, ভূইমালী প্রভৃতি ও অপরাপর কর্ম্মচারীগণের বাসস্থান ছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও দুইটী বাহির গড়ের কথা শুনা যায় কিন্তু উহার স্থান নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ পদ্মার ভাঙ্গনে উহার উত্তর ও পশ্চিমদিকের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকের অংশ হয়ত সরমাটিতে ভরিয়া যাইয়া তদুপরি লোকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। গত ১৫০ একশত

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নরিয়া দুইবার নদী কবলিত হইয়া আয়তনে বহুক্ষীণ ও পুরাতন চিহ্ন-বিহীন হইয়াছে। এই প্রথম গড়, পরিখার অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ অনুমান চারি পাঁচ দ্রোণ * ছিল।

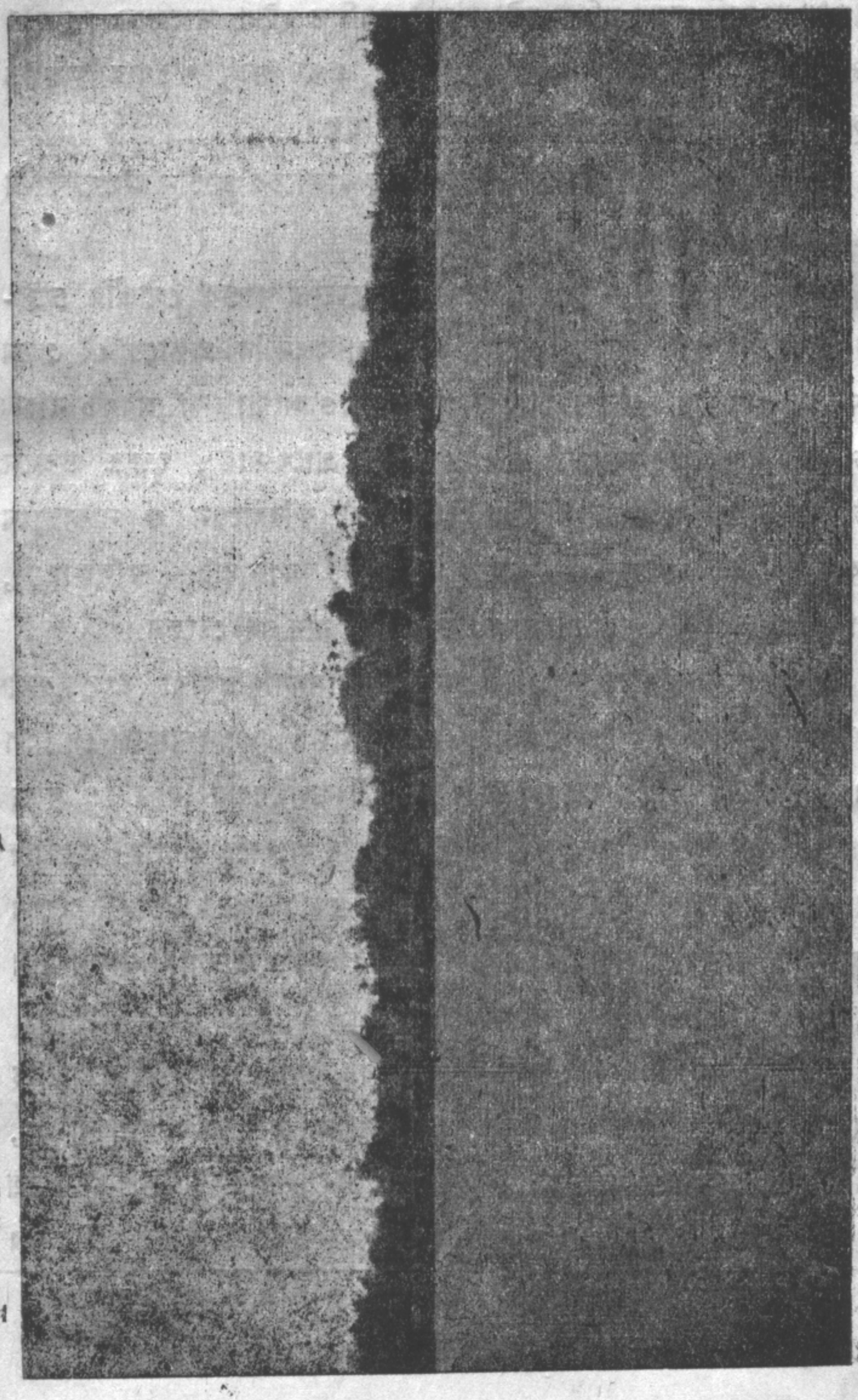
প্রাচীন অশ্বত্থ—গড়াভ্যন্তরস্থ বাজারের প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষটী এখনও বর্ত্তমান আছে।

পুরোহিত—পুরোহিতগণ দেহাটীমেলের কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন সন্তান। তাঁহারা কখন কি প্রকারে এই গ্রামে আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন তাহার কোনও আখ্যায়িকা অবগত নহি। তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে কেহই এই গ্রামে নাই; পদ্মার জীবনে তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ বিষয় স্থলে বাড়ী করিয়াছেন ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন। বিঝারি, চাঁদপুর, কালিঘাট (কলিকাতা), মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের কেহ কেহ বাস করিতেছেন।

গোপাল পূজক—ইন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ৺গোপাল পূজকের বংশের কোনও নিদর্শন নাই। এখন যাঁহারা গোপাল বিগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন তাঁহারাই শ্রীবিগ্রহ সেবায় নির্দ্ধারিত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের বৃত্তি যথা, বিবাহাদি ব্যাপারে প্রণামি, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বর ভাগ, দানে শয্যা, বরণে স্বস্তিক। ঘটক চৌধুরী বংশের হস্ত হইতে নরিয়ার জমিদারী চলিয়া যাওয়ার পরেও গ্রামবাসী জনসাধারণ ৺গোপাল বৃত্তির অপলোপ করেন নাই।

শিকদার বংশ—শিকদারগণ সাধারণতঃ গড়াভ্যন্তরস্থ যাবতীয় ব্যাপারের সর্ব্বেসর্ব্বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সামাজিক, পারিবারিক, এমনকি ব্যক্তিগত চালচলনাদি সর্ব্ব বিষয়েই ইহাদিগের উপদেশ সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইত। পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ, আবশ্যকমত বহিঃশত্রু হইতে পুরীরক্ষার

* ৭॥ হাত নলের ২৪ নল দীর্ঘ ও ২০ নল প্রস্থে ১ কাণি ও ১৬ কাণিতে ১ দ্রোণ।



বিক্রমপুরের পল্লী দৃশ্য।

নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ, প্রভু ও প্রভু-পরিবারবর্গের দেহরক্ষক স্বরূপে তাঁহাদের অনুগমন, ভোজন সময়ে আহার্য্য বস্তুর পরীক্ষা, প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন কক্ষ নির্ব্বাচন, প্রভৃতি কার্য্যভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। শিকদারগণের পরিবারপালন ও সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার সরকারী কোষ হইতে বহন করা হইত এবং ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিও নির্দ্ধারিত ছিল। ফলতঃ শিকদারগণ সর্ব্বতোভাবে পরিবারের অঙ্গীভূত ছিল। কালক্রমে শিকদারগণের কুটুম্বগণও অনেকে শিকদার পদবীভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ তৎকালে এই শিকদার পদবী বিশেষ সম্মানার্হ উচ্চ পদবী বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধুনা এই শিকদারদিগের বংশধরগণ শিকদার শব্দের দাসার্থ ব্যবহার দৃষ্টে এই পদবী বর্জ্জনের নিমিত্ত চেষ্টিত আছেন। ইহাদের অধিকাংশই, দে, দাস, দত্ত, চন্দ প্রভৃতি নানা উপাধি ও নানা গোত্রে বিভক্ত মৌলিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে ও গ্রামান্তরে গমনকালে প্রাচীন প্রথানুসারে শিকদারদিগের দাসদিগকে তাহাদের সহিত ঘটক চৌধুরী বংশধরগণের অনুগমন করিতে দেখা যায়। অধুনা শিকদারদিগের বংশ ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, অনেকে শিকদার পরিচয়-পরাঙ্মুখতা নিবন্ধন গ্রামান্তরে গমন করিয়া হীনতর দাস পরিচয়ের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। **নৈকাল্ল শিকদার** কোনও বংশ বিশেষের যে শিকদার নহে ইহাই তাহাদের সামান্ত দাসত্বের প্রতিকূলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলতঃ উহারা গড়াভ্যন্তরের সকলেরই শিকদার ছিল।

পাইক ও সর্দ্দার—সাধারণতঃ মুসলমান জাতিয়েরা বরকন্দাজ বা পাইক ছিল, নমঃশূদ্র জাতির মধ্যেও এই শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। নৌবিভাগ বোধ হয় ঝালো (জেলে) দিগের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে, মাল্লা, সর্দ্দার, ফৌজদার, ঢালী, হালদার, মাঝি প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা প্রাচীন তথ্যের কোনও ইতিহাস

অনুসন্ধানের উপায় দেখা যায় না ; কারণ কেহই তিন চারি পুরুষের উপরে বংশ পরিচয় দিতে পারে না। তবে কাহারও কাহারও পুরুষপরম্পরাগত স্ব স্ব সামাজিক মর্য্যাদা, বৃত্তি ও উপাধি দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের বিশিষ্টতার একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

গোলাধ্যক্ষ—ইন্দ্রনারায়ণের সময় গোলাধ্যক্ষ কে ছিল তাহার নাম পাওয়া যায় না। নরিয়া তালুকদার উপাধিধারী সাহা বংশের তালুকাদির পরিচয়ে তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পঞ্চম পুরুষের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই তালুকদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ গোলাধ্যক্ষ ছিলেন।

দেওয়ান বাড়ী—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম নরিয়া পদ্মার কুক্ষিগত হইবার পূর্ব্বে আমরা দেওয়ান বাড়ী নামে একটী বাটীর পরিচয় মাত্র পাইয়াছি, এই বাড়ীতে কবে কে কাহার দেওয়ান ছিল তাহার কোনও সংবাদই অবগত নহি।

নৈরার দিঘী—নৈরার দিঘী এখন আর দিঘী নাই। দিঘীর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি ম্যালেরিয়া-প্রসূত ডোবা, স্থানে স্থানে রোপিত ও পতিত বীজোৎপন্ন ঘন পল্লব মান্দারকাননের আবরণান্তরালে সুপারি-বৃক্ষ-পোষিণী বাগান-সীমান্তবর্ত্তিনী গড় সমূহ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু পর্য্যটকের নিকট দিঘীর স্মৃতিমাত্র জাগরিত করিয়া দেয়। এখন এই দিঘীর মধ্যে, তালুকদার ও পোদ্দার মহাশয়েরা দুইটী বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে কদলী ও সুপারী বাগান করিয়াছেন, আরও দুই একটী দিঘী খনিত ও বাগিচা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে। দেশের জমীদার, কি দেশবাসী বহুকাল যাবৎ কাহারও এই প্রাচীন চিহ্ন রক্ষা করিবার মতি হয় নাই। ঘটক চৌধুরী বংশধরগণ ত অক্ষমই ক্ষমবান থাকিতে ও বোধ হয় তাঁহাদের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয় নাই।

পরগণার সামান্য বিবরণ—মেঘনা নদের পশ্চিম

পারে, বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জিলার অন্তর্গত যে সকল স্থানে গুণানন্দ পরগণার নাম পাওয়া যায় পূর্ব্বে অর্থাৎ মেঘনা বা পদ্মার শাখা প্রশাখাদিদ্বারা ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে—এ সকল একই চাকলার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ডিহী স্বরূপ থাকিলেও এক্ষণে এই সমুদয়কে পরগণার ছিট বলিয়াই মনে হয়। এই পরগণার প্রধান চাকলা ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেঘনা নদের পূর্ব্ব কূলে অবস্থিত। মেঘনা নদের পশ্চিম কূলে যে অংশ পতিত হইয়াছিল মোটামুটি ভাবে উহার দক্ষিণ সীমানা ফতেজঙ্গপুর, পশ্চিম সীমানা শ্রীপুর সাহাবন্দর বা নরিকুল, উত্তর সীমা আরাফুলবাড়ীয়া বা শ্রীপুর (কেদাররায়ের বাসস্থান) ও নবীপুরের পূর্ব্বোত্তরে একটী শাখা বাহির হইয়া উত্তরে ঢাকা জিলার অন্তর্গত চাঠাতিপাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাও অনুমান মাত্র। পক্ষান্তরে মূল পরগণা মেঘনা নদের পূর্ব্বপারে অবস্থিত থাকি লেও ঘটক চৌধুরীদিগের অধিকৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূমিভাগকেও এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত করা হইয়া থাকিবে। মেঘনা নদের পূর্ব্বপারে বর্ত্তমান চাঁদপুর ও নরসিংপুর প্রভৃতি স্থানের দক্ষিণস্থ চড়ভৈরবীর উত্তর ও সিংহেরগাও পরগণার পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরে ময়নামতি পর্য্যন্ত এই পরগণা নানা ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। মূল কথা ইহার নির্দ্দিষ্ট সীমানা আমি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই। আশা করি সেটেলমেণ্টের জরিপ কার্য্য শেষ হইলে ইহার কোন ও কিনারা পাওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই সীমানার মধ্যে অনেক অন্যান্য পরগণা ও তালুকের নামোল্লেখ দেখা যায় সুতরাং ইহাদ্বারা এই পরগণার তদানীন্তন আয়তনের আভাস মাত্র দেওয়া হইল। ভৌগোলিক হিসাবে উহার যথার্থ সীমা নির্ণয় হইল না। এস্থানে এই পরগণার সীমান্তবর্ত্তী স্থান সমূহের

আরাফুলবাড়ীয়া বা শ্রীপুর—ইতিহাসপ্রথা ভূইঁয়া (ভূম্যধিকারী) চাঁদ রায় ও কেদার রায় নিজ-বাসগ্রাম আরাফুলবাড়ীয়াকে শ্রীপুর নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমান বসাকের চড়ের পূর্ব্ব ভাগে এক খণ্ড ভূমি "শ্রীপুরের ট্যাক্" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীপুর সাহাবন্দর—ইহার প্রচলিত নাম নড়িকুল, নদীকুল, পরিকুল, কি লড়িকুল তাহা ঠিক জানা যায় না। এই স্থান এক্ষণে পদ্মার কুক্ষিগত হইয়া নূতন পয়স্থি হইয়াছে। পোড়াগাছার দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই স্থান অবস্থিত ছিল। এস্থানে সাহা জাতির ধনাঢ্য বণিকগণের বাসস্থান ছিল, তজ্জন্যই বোধ হয় তদানীন্তন সাহাগণ ইহাকে "শ্রীপুর সাহা বন্দর" নামে অভিহিত করেন। সাহাবন্দর নাম হইতে ইহার প্রাচীন নাম নদীকুল হইতে লড়িকূল নাম অপভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার তাৎকালীক তৌজিভুক্ত পুরানাম **"সরকার সোণার-গাঁও, তাঁবে কোরাঙ্গহাট শ্রীপুর সাহা বন্দর।"** এই প্রাচীন সাহাবংশের অনেকেই এক্ষণে পালঙ্গের নিকটবর্ত্তী লক্ষ্মীগঞ্জ, ধানুকা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্যারীমোহন সাহার পুত্র মোহিনীমোহন ও ক্ষেত্রমোহন সাহা এবং কিশোরী মোহন সাহার পুত্রগণ সমৃদ্ধি ও লেখাপড়ায় বিশেষ পরিচিত। ইহাদের পালঙ্গের বাড়ীও সম্প্রতি পদ্মার কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে।

প্রাচীন নরিয়ার সীমা ও পরিধি—প্রাচীন নরিয়ার সীমা, দৈর্ঘ্যে উত্তরে আরাফুলবাড়ীয়া হইতে দক্ষিণে খৈয়ারবিল পর্য্যন্ত অনুমান ৫।৬ মাইল ও পশ্চিমে মূলপাড়া হইতে পূর্ব্বে কেদারপুর ও চণ্ডাপুরের পশ্চিম অর্থাৎ বর্ত্তমান মুলফতগঞ্জের খালের পশ্চিম পার পর্য্যন্ত অনুমান ৩।৩½ মাইল। রেনেল সাহেবের ম্যাপের সহিত তুলনা করিয়া এসিষ্ট্যান্ট্ সেটলমেণ্ট্ অফিসার শ্রীযুক্ত চিন্তাচরণ দাস গুপ্ত মহাশয়



কেদারবাড়ীর বর্ত্তমান দৃশ্য।

বলিয়াছিলেন যে "এক্ষণে প্রাচীন নরিয়ার আটভাগের একভাগ মাত্র ভূমি আসলিতে অবশিষ্ট আছে, বাকী সকলই পদ্মার চড়ের সামিল

কেদার বাড়ী—প্রসিদ্ধ (ভূম্যধিকারী) কেদাররায় এই গ্রামের বসত বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত গড় খনন করাইয়া ইহাকে কেদারপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাই এই গ্রামের নাম কেদারপুর ও গড়াভ্যন্তরস্থ স্থান কেদারবাড়ী নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা একটী বিশেষ দর্শনীয় স্থান। উত্তর বিক্রমপুরের রাজাবাড়ীর মঠের ন্যায় দক্ষিণ বিক্রমপুরের কেদারবাড়ীর গড় ও বিক্রমপুরের গৌরবময়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের একটী প্রধান অঙ্গ। যে পদ্মা কীর্ত্তিনাশা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বিক্রমপুরের বহু কীর্ত্তি কলাপের বিলোপ সাধন করিয়াছে সেই পদ্মার ভাঙ্গন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত প্রাক্কালেই কেদার রায় এই বাড়ী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় উহা সুসম্পন্ন হইতে পারেন নাই।

পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা বা রথখোলার খাল—শুনা যায় কীর্ত্তিনাশা পূর্ব্বে একটী স্বল্পপরিসর ও গভীরতা বিশিষ্ট খালের মত হালট ছিল। অর্থাৎ বর্ষার জলপ্লাবনে খালের আকার ধারণ করিত অন্যথা শুক্‌নার সময় হালটরূপে ব্যবহৃত হইত। এই হালটে চাঁদরায়ের বাড়ীর নারায়ণ বিগ্রহের রথ আকর্ষিত হইত। সেই প্রকাণ্ড রথ-চক্রঘর্ষণে ভূমিতে যে চিহ্নাঙ্কিত হইয়াছিল বৃষ্টির জল পড়িয়া প্রথমে উহাতে একটু একটু জল দাঁড়াইতে থাকে; পরে অল্প জলের কালে লোকে ঐ স্থান দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে উহা একটী সামান্য পরিসর খালের আকার ধারণ করে ও একটু গভীর হয়। তখনও ইহার একপাশে সরিয়া রথের টান হইত। এই খালটী বর্ষার সময়ে মাত্র খাল স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কালে ইহাদ্বারা পদ্মার স্রোত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে

এবং ইহা দুই কূল ভা'ঙ্গিয়া বড় হয় ও "রথখোলার গাঙ্গ" নামে অভিহিত হয়। সেই রথখোলার গাঙ্গই ভবিষ্যতে চাঁদকেদার রায়ের কীর্ত্তিরাশি নাশ করিয়া কীর্ত্তিনাশা নামে অভিহিত হয়।

ইন্দ্রনারায়ণ রায়, ঘটক, চৌধুরী—জমীদারী গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ নিজের ঘটকতা ব্যবসায়ের অর্দ্ধাংশ ঘটক ভট্টাচার্য্যের সন্তানদিগকে ও অপর অর্দ্ধাংশ কোলা ও কাঁচাদিয়া নিবাসী স্বীয় আত্মীয়দিগকে ঘটক পদবী সহ তুল্যাংশে দান করিলেন। তাঁহারাও নরিয়া সমাজের কুলীন কি শ্রোত্রিয় নির্ব্বিশেষে বিবাহসভায় চন্দন প্রাপ্তিতে ঘটক চৌধুরীগণের একাধিকার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রনারায়ণের চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম রমানাথ, দ্বিতীয় সুধারাম, তৃতীয় অনিরুদ্ধ ও চতুর্থ পরশুরাম। ইহাদিগের মধ্যে পরশুরাম কনিষ্ঠ হইলেও সবিশেষ বল বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন এবং কাজ কর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, অপিচ কনিষ্ঠ পুত্র নিবন্ধন পিতার অতিশয় আদরের পাত্র ছিলেন। ইঁহারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক সেই সময়ে বঙ্গের নবাবগণ কিছু হীনবল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র নায়ককে হীনবল এবং দেশে অরাজকতার লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন ও রাজকীয় প্রাপ্য করদান বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রথমতঃ বর্ত্তমান কুমিল্লা জিলার অন্তঃপাতি দাযুদনগরের ফৌজদার সসৈন্যে নরিয়া আক্রমণ করেন ও সহজেই পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ঢাকার সুবাদার এই ব্যাপারে কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া একেবারে মুরশিদাবাদে সংবাদ প্রেরণ করেন। সেস্থান হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে একজন সেনাধ্যক্ষ আগমন করেন। তখন ৺শারদীয় দুর্গোৎসব সবে মাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে; দেশ সম্পূর্ণরূপে জল প্লাবিত না হইলেও অনেক স্থানই জলাকীর্ণ সুতরাং ভোজপুরী পশ্চিমা

সৈন্যগণ এই জলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া নৌযুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। দুই এক দিন মাত্র যুদ্ধের পর নরিয়া গড় অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল।

গড়ের খাত খুব গভীর ও উহার পারে মাদার গাছের বেড়া, তাহাতে কণ্টকাকীর্ণ ঘনবিন্যস্ত কেতকীর সহিত বেত্রলতা জড়িত থাকিয়া যে পম্বাদির অভেদ্য ও তাৎকালিক কামানের গোলার অচ্ছেদ্য প্রাচীর গঠন করিয়া রাখিয়াছে তাহা ভেদ করিয়া কাহারও প্রবেশ করা একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার। তাহাতে আবার উভয় পক্ষ হইতেই—"তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পরে রৈয়া" এদিকে——"নৈরার ঘটক যুদ্ধকরে কচুবনে (গাছের আড়ে) বৈয়া।" কাজেই ঈদৃশ আক্রমণে গড় নিবাসিগণের কিছুতেই বহিশত্রুর নিকট পরাজিত হইবার কথা নহে। সেই সময়ে বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু উহার এত উন্নতি ও প্রসার হয় নাই। এদিকে ঘটক চৌধুরীদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদিও নবাব পক্ষীয়গণের অস্ত্র শস্ত্রাপেক্ষা কোনও অংশেই হীন ছিল না। বিশেষতঃ তীর সন্ধানে রমানাথের সিদ্ধ হস্ত, অনিরুদ্ধের অসি ও বল্লম এবং পরশুরামের কামান ও বন্দুকের সন্ধান অমোঘ ছিল। উভয় পক্ষেই যুদ্ধটী বেশ জাঁকাইয়া উঠিল। বিশেষতঃ ঘটক চৌধুরীগণ আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর, তাহাতে তাহাদের সমর নৈপুণ্য প্রদর্শনের এই প্রকার সুযোগ পাইয়া পরম উৎসাহে যুদ্ধ করিতেছিল। জমীদার পক্ষ নিজেদের সুরক্ষিত স্থানে থাকিয়া অরক্ষিত নবাব সৈন্যের বহু ক্ষতি করিলেও গড়ের বাহিরে আসিয়া বহু সংখ্যক নবাব সৈন্যের সম্মুখীন হইবার সাহস করিতে পারে নাই; এই প্রকারে সমান ভাবে ঊনবিংশ দিবস পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এদিকে নবাব-বাহিনী যেমন যুদ্ধে তেমনই জ্বর ও আমাশয় রোগে অনেকে পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল।

উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কোনও গৃহভেদীর নিকট ঘটক চৌধুরী গণের গোলাগুলির অভাব সংবাদ শ্রবণ করিয়া আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিবার মনস্থ করিলেন। তখন অনন্যোপায় জমীদারগণ শিক্কাটাকা দমকায় (এক প্রকার হালকা কামান) পুরিয়া চালাইতে লাগিলেন। বিপক্ষগণও সাধারণ গোলার স্থলে রৌপ্যমুদ্রা দর্শন করিয়া অধিকতর উৎসাহিত চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে আরও দুইদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুই দিন পরে বারুদও ফুরাইয়া গেল; কিন্তু বারুদ প্রস্তুতের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত না থাকা প্রযুক্ত উপায়ান্তর বিহীন হইয়া পলায়নই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন ও অবশেষে একবিংশতি দিবসের রাত্রিযোগে শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ ও স্বজন পরিবারগণ সহ চাঁদসী গ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ মজুমদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নবাব সৈন্য গড় মধ্যে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্য মন্দিরাদি ভূমিসাৎ ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। এই যুদ্ধের সাক্ষী স্বরূপ একটী প্রাচীন পলাশ বৃক্ষ স্বীয় শৈবালকলঙ্কিত কঠিন-ত্বক ও কাষ্ঠ তনুর অন্তরালে কতিপয় গোলাগুলি ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। বিগত ১৩০৩ সালের প্রবল ঝড়বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাচীন ইতিবৃত্তের সাক্ষী বনস্পতি ধরাশয়ন করিয়াছেন। সেই পলাশ নাই, গ্রাম্য কবির গীতিকাও লুপ্ত হইয়াছে। তাহার দুই এক চরণ যাহা প্রাচীনগণের নিকট নানারূপে শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই—

ও ঘটক পালাইলারে—
নৈরার সোণার পুরি কারে দিলারে? ধ্রু॥
* * * * * *
তীর পরে ঝাকে ঝাকে, গুলি পরে রৈয়া।

নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচুবনে বৈরা (১) ॥
ও ঘটক ইত্যাদি। ধ্রু ॥

* * * * * *

পূবের ঘাটে রমানাথ তেতৈল (২) পাতার আড়ে ॥
ডান হাতে বাও হাতে তীর ঝাকে ঝাকে ছাড়ে ॥
* * * * * * ॥ ধ্রু ॥
চাঁইর'দিগে লস্করেতে লাগল হাহাকার।
রঘুঘটক ডাইক্যা কয় গুলি নাইরে আর ॥
— — — — । ধ্রু ॥
গোট টাকারে গুলি করনা ওরে গুণমণি।
পরশুরামের দমকা ফুটে বাজের গর্জ্জনি ॥
— — — — ॥ ধ্রু ॥
দিন নাই ক্ষেণ নাই রাত্রি অন্ধকার ॥
একইশ দিনে সোণার নৈরা হইল ছারখার ॥*
— — — — ॥ ধ্রু ॥
দুর্গা পূজার ঘট কেনরে ভাসল দিঘীর জলে ॥
— — — —
গলাগলি ধৈরা তারা কান্দে চাই'র ভাই।
সিংহাসনের উপুর কেনরে লক্ষ্মী ঠাইরেণ নাই ॥
বাপে বলে ওরে পুত্র ক'লি (৪) কিরে কথা।
জানিলাম আমারে নিশ্চয় নিদয় হইলেন মাতা ॥ (৫)
* * * ঘর দুয়ার।
গোপালের বালাখানা কর্‌ল চুরমার ॥
* * * * ॥ ধ্রু ॥

ইত্যাদি—

বাস্তবিকই সোণার নৈরা ছারখার হইল। নবাব সৈন্যের অত্যাচার-শঙ্কায় গ্রামের ইতর ভদ্র অধিবাসিগণ নিজ নিজ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া

---

(১) বসিয়া। (২) তেতুল। (৩) বোধ হয় তখন রমানাথের পুত্র রঘুনন্দন কিশোরবয়স্ক ছিলেন (৪) কলি=কহিলি। (৫) আমারে কৈরাছে কোপ ঠাইরেণ লক্ষ্মী মাতা। পাঠান্তর।

* একৈশ দিনে সোণার লঙ্কা হৈল ছারখার।

যেখানে সুবিধা পূর্ব্বেই পালায়ন করিয়াছে। গ্রাম্য বাজারের দোকান পাট বন্ধ করিয়া দোকানদার পালাইয়া গিয়াছে, কৃষকগণ পাকাধানের মমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছেলে, জেলে, মুটে, মজুর, ধনী, দরিদ্র সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আততায়ী নবাব সৈন্যগণ গ্রাম্যলোকের বাসস্থান সকল অধিকার করিয়া লইয়াছে। নরিয়াকে বিধ্বস্ত করিয়া যখন বিজয়ী নবাব সৈন্য চলিয়া গেল, তখন গ্রাম একেবারে জনমানব-হীন ভীষণ নীরবতা ধারণ করিল।

গোপাল গাঙ্গুলীর বংশধরগণের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাদিগের কুলাধিপতি ৺গোপাল বিগ্রহও গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে কিন্তু একজন এই দুরবস্থার সময়েও এই গ্রামকে ত্যাগ করেন নাই। ঐ দেখ গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে বনস্পতিগণপরিবৃত দ্রুমলতাশোভিত বাপীতটে অশ্বত্থরূপিনী শিবদারা **সিদ্ধেশ্বরী** বিরাজ করিতেছেন। আর তাহার পদমূলে বিভূতিভূষিতকলেবর, প্রবালানুবিদ্ধ রুদ্রাক্ষমাল্য ও বলয়বিভূষিতাঙ্গ, সিন্দূর--কুঙ্কুম-তিলকাঙ্কিত--ললাটে ধ্যানমগ্ন সাধক **ব্রহ্মাণ্ডগিরি** (১) অবিচল চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরির এদেশে আগমনের ও সমাধিগ্রহণের সময় অজ্ঞাত। নরিয়া সিদ্ধেশ্বরীতলায় পুকুরের পশ্চিম উত্তর কোণে অল্পোচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বট অশ্বত্থ যুগল ব্রহ্মাণ্ডের সাধন পীঠ ও পশ্চিম পারে অশ্বত্থ তাহার সমাধিস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। পুকুরের উত্তর পারে সিদ্ধেশ্বরীর বৃক্ষের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩০।৪০ হাত দূরে একটী মঠের মধ্যে প্রস্তরময় শিববিগ্রহ ছিল প্রবাদ যে তাঁহার বন্ধুর পাষাণবপু পাতাল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট ছিল। উহা কোনও

(১) ইনি প্রথিতনামা ব্রহ্মানন্দগিরি কিনা তাহা বিচার্য্য। অথবা ব্রহ্মাণ্ডগিরি নামক অপর কোনও সাধক। মূলকথা নরিয়ার সিদ্ধেশ্বরী একটী সাধনসিদ্ধ পীঠস্থান ও উহা ব্রহ্মাণ্ডগিরির সাধন পাঠ বলিয়া কীর্ত্তিত।

খোদিত লিঙ্গমূর্ত্তি নহে মৃত্তিকার উপরে উহার যতটুকু জাগিয়াছিল তদ্দৃষ্টে উহা একখানি সাধারণ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ড বলিয়াই বোধ হইত।

প্রায় ৯০ কি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে রথখোলার খাল দিয়া যখন কেদার রায়ের গুরুদেব প্রথিতনামা সিদ্ধসাধক গোঁসাই ভট্টাচার্য্যের মন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত "ডলন" যন্ত্র-বিগ্রহ "ঢোলসমুদ্রের" (২) কূল ভাঙ্গিয়া পদ্মা বা গঙ্গার জলে অবগাহন করিতে যাত্রা করেন যখন সেই ডলন বিগ্রহকে কোলে পাইয়া রথখোলার খাল নদী পদবী লাভ করতঃ পদগৌরব মত্ততায় কাঁপিয়া উঠিয়া প্রবল বেগে দু'ই পার ভাঙ্গিয়া চলিতে লাগিল, তখন সেই পূর্ব্ববাহিনী স্রোতস্বিনী উত্তর পারে "চাচইরতলার দিগম্বরী দেবীর" এবং দক্ষিণ পারে "নরিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর" ও নবীপুরের "ত্রিনাথের" পাদমূল পর্য্যন্ত স্বয়ং দ্রবময়ী কলেবর বিন্যস্ত করতঃ এইত্রিপুটী আসনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করিলেন। কথিত আছে যতক্ষণ পদ্মা বা তথা কথিত রথ-খোলার গাঙ্গ সিদ্ধেশ্বরীর পাদমূলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ ও ভূমিকম্প উৎপাদন পূর্ব্বক বহু জনকোলাহলের মধ্যে সকলের দৃষ্টি সমক্ষে সাতটী মাইট আরও কত কি সিদ্ধেশ্বরীর পুকুর হইতে নদীর জলে প্রবেশ করিল। অন্যূন বিংশ বৎসর পূর্ব্বেও তাৎকালীক প্রাচীন ও প্রৌঢ়গণের চক্ষুর উপর এই ঘটনাটি দেদীপ্যমান ছিল। তাৎকালীক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাথমিক অভ্যুদয়ে অনুপ্রাণিত স্বর্গগত ৺ হরিপ্রসাদ রায় ঘটক চৌধুরী মহাশয় এই ঘটনাটী

(২) কেদারায়ের মাতা এই প্রকাণ্ড দিঘীকা প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ে উহা বাইচা নামক জলজ শৈবালদাম বিশেষে একেবারে আবৃত্ত হইয়া যায় ও উহা পরিষ্কার করান অসম্ভব হইয়া উঠে। সেইজন্য মহাত্মা গোসাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যদিগের আগ্রহাতিশয্যে অনুরুদ্ধ হইয়া একটী ডলন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ দিঘীর জলে নিক্ষিপ্ত করেন। এই অভিচার ক্রিয়া সাধন সময়ে গুরুমহাশয় নাকি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন এক সময়ে এই ডলনই তোমাদের সমগ্রপল্লী চিহ্নহীন করিবে।

প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার দিনলিপিতে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল, এই ঘটনাটী ইংরাজিতে লিপিবদ্ধ আছে। "এই ঘটনাটী অন্য কাহারও মুখে শুনিলে হয়ত আমি ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম ও আমাদিগের হিন্দুসমাজের প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের একটী গল্প বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তাহা অবিশ্বাস করি কি প্রকারে? ইহা কেবল আমি নহি গ্রামের আরও মান্যগণ্য বহুলোকেই দেখিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে আমার কোনও প্রকার চক্ষের ধান্দা নয় তাহাও নিশ্চয়।" এই ঘটনার সময় বঙ্গাব্দ ১২৫১.৫২ সাল। সেইকালে তাহার বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর ছিল। তখন তিনি জুনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।

নয়শ্রীর সেই সিদ্ধেশ্বরীর পীঠ এখন পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত। প্রথম বারে রথখোলার গাঙ্গ কেবল সিদ্ধেশ্বরীর ধন গ্রহণ করিয়াই ফিরিয়া যায়। তার পরে মহারাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ ধ্বংস করত যখন পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ করে তখন সিদ্ধেশ্বরী স্বয়ংই কীর্ত্তিনাশা উপাধিভূষিতা পদ্মা সলিলে অবগাহিত হইলেন। যে স্থানে সিদ্ধেশ্বরী পীঠ স্থাপিত ছিল এখন তাহার চারিদিকে চড় পরিয়াছে ও দেবীর পীঠস্থানে একটী অতলস্পর্শ কুম (কূপ) হইয়াছে বলিয়া দেশস্থ সকলের নিকট শুনিতে পাই। ফলতঃ বর্ত্তমান নয়শ্রীর পশ্চিমস্থ মহিষখোলা চড়ের পূর্ব্বদিকে একটী স্থানে যে নালার জল খুব গভীর তাহা অনেকেই মাপিয়া দেখিয়াছে। প্রায় শতহস্ত পরিমিত দড়িতেও তাহার তল স্পর্শ করিতে পারে নাই। অনেক নৌকা সেই কূপে পড়িয়া, হারাইয়া গিয়াছে বলিয়াও শুনিতে পাই। এই কূপটী যে আছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। তবে ঐ কূপটী ঠিক সিদ্ধেশ্বরীর পীঠস্থানে কিনা তাহা থাকের কূপার সহিত মিলাইয়া দেখা হয় নাই। প্রত্যক্ষদর্শীদিগের অনুমান ঐ স্থানেই ৺ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পীঠস্থান ছিল।

কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত !

সুবিখ্যাত কালীপাড়ার পুণ্য-স্মৃতির সহিত বিক্রমপুরের ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তার, সস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কার প্রভৃতি বহুবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠান সমূহ এরূপ ভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, যখনই আমরা বিক্রমপুরের বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই তখনই আমাদের বিক্রমপুরের একমাত্র প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ জমিদার অধ্যুষিত কালীপাড়ার প্রতি দৃষ্টি ধাবিত হয়।

বাঙ্গলা ১২৮৫ সনের শ্রাবণ মাসে কালীপাড়া কীর্ত্তিনাশিনী পদ্মার অনন্ত গর্ভে চির নিমজ্জিত হইল।

বিক্রমপুরের দক্ষিণ পশ্চিম-প্রান্তে পদ্মানদীর তীরে পূর্ব্বকালে চাচুরপাশা বাঁধিয়া প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত ছিল। বাং ১২০০ সনে উক্ত গ্রাম সমূহ পদ্মানদির কুক্ষিগত হইলে চাচুরপাশার রামনারায়ন বারৈষ্যা তৎসংস্থাপিত দৌহিত্র সন্তান ও আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য ভদ্রবৃন্দসহ কালীপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। চাচুরপাশার বারৈষ্যা জমিদারগণ এই সময় কালীপাড়ার জমিদার নামে অভিহিত হইলেন সুতরাং কালীপাড়ার জমিদার পরিবারের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে চাচুর পাশার বারৈষ্যা জমিদারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করা প্রয়োজন।

চাচুরপাশা গ্রামে বন্দ্যঘটীয় আচার্য্য শেখরি মেলের কুলীন শ্রেষ্ঠ রত্নগর্ভ বারৈষ্যা ও তদীয় সন্তান সন্ততিগণ বসতি করিতেন। রত্নগর্ভের পুত্র বল্লভ, পৌত্র বাণীনাথ, প্রপৌত্র মথুরেশ বা মথুরানাথ প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য ও মহাপুরুষ ছিলেন। মথুরেশ বংশজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম

---

* এই বিবরণটী নৈরার ঘটকচৌধুরী বংশীয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘটক মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

এই বংশে ভঙ্গ হন। তৎসম্বন্ধে সুন্দর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই বংশের আচার, নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, অশেষ সম্পদ ও প্রতাপ অবলোকন করিয়া মথুরানাথকে উক্ত গ্রামবাসী জনৈক ঘোষাল, তদীয় রূপলাবণ্যবতী একমাত্র কন্যার জামাতৃরূপে বরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তদীয় পিতা বাণীনাথকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত করাইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাণীনাথ পুত্রকে কিছুতেই বংশজ কন্যা বিবাহ করাইয়া ভঙ্গ হইতে দিবেন না এরূপ মত প্রকাশ করায় ঘোষাল মহাশয় অবশেষে এক কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। একদা তিনি যথা বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া কন্যাকে মাল্য হস্তে এক বৃক্ষের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা রাখিলেন। যেইমাত্র মথুরেশ ঐ পথ দিয়া বাটীর দিকে গমন করিতেছিলেন অমনি কন্যা তাহার গলে মাল্য নিক্ষেপ করিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই বাড়ী হইতে উলুধ্বনি উত্থিত হইল, মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। মথুরেশ অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইয়া পিতৃসকাশে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলে, ধর্ম্মভীরু বাণীনাথবরমাল্যদাতৃকন্যাকে পরিত্যাগ করা মহাপাপ মনে করিয়া পুত্রকে ঐ কন্যার পানিগ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। মথুরানাথ ঐ কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হইলেন।

মথুরানাথের পুত্র বলরাম, পৌত্র রঘুদেব। রঘুদেবের সময়ের কতিপয় দলিল দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে তিনি এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ থলিপাশা, চাচুরপাশা, বাঘিয়া প্রভৃতি বহু গ্রামের মালিক ছিলেন।

রঘুদেবের দুই পুত্র, প্রথম চন্দ্রশেখর দ্বিতীয় কালীকাপ্রসাদ। চন্দ্রশেখরের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি রূপবান, জ্ঞানবান, ধর্ম্মপরায়ন এবং পরম নিষ্ঠাবান মহাপুরুষ বলিয়া সুপরিচিত। তিনি কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন, আধ্যাত্মিক জগতে তিনি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে

শাক্ত্যাভিষেক পূর্ণাভিষেকাদি ক্রিয়া সমপনান্তে "আনন্দনাথ গীর" এই উপাধিতে ভুষিত হইয়াছিলেন।

রামনারায়ণের সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। উভয়েই বিলক্ষণ রূপবান ও অতি অল্প বয়সেই পারসী ও সংস্কৃতভাষায় বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ সূর্য্যনারায়ণের তেজোময় শৌর্য্যবীর্য্যশালী নয়নমুগ্ধকর মূর্ত্তি যে দেখিতে সেই স্তম্ভিত হইত। তদীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হইয়া চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ভূকৈলাসনিবাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান স্বর্গীয় রাজা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর তদীয় রাজা সূর্য্যনারায়ণকে আহ্বান করিয়া খুলনা জিলার অন্তর্গত চিকুলিয়া মধুরদি নামক পরগণার বিদ্রোহ দমন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। স্বীয় অলৌকিক সাহস এবং স্বাভাবিক প্রতিভা প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া সূর্য্যনারায়ণ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি বহু লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া বলে এবং কৌশলে পরগণার প্রজাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। ইহাতে তদীয় যশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পরিশেষে তিনি এজন্য ভূকৈলাস রাজষ্টেট হইতে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এ সময় তিনি তথাকার চন্দ্রাবতী মেলের মালাধর মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নিকে বিবাহ করেন। কুলিনের কন্যা গত কুল সুতরাং বংশজে ভগ্নি বিবাহ দেওয়ায় উক্ত মুখোপাধ্যায় আপন সমাজে হীন হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যনারায়ণ শ্যালক সহ সস্ত্রীক বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্যালককে কালীপাড়া গ্রামে পৃথক বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ভরণ-পোষণের উপযোগী বৃত্তি বার্ষিক নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ চন্দ্রনারায়ণ ও জ্যেষ্ঠের ন্যায় কৃতি ও বীরপুরুষ ছিলেন।

তিনি ঢাকায় মোক্তারি করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করতঃ পরোপকার ব্রতই জীবনের শেষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পিতা বর্ত্তমানেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং চন্দ্রনারায়ণের অর্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারি সূর্য্যনারায়ণ হইলেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা দিবস চন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায়, তদবধি এই পরিবারে ঝুলনোৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে এই পরিবার শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী, শ্যামাপূজা, কার্ত্তিক সরস্বতী চড়কপূজা রথযাত্রা, জন্মাষ্টমি রাস-লীলা, দোলযাত্রা, প্রাত্যহিক শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ শিবপূজা এবং স্থাপিত লক্ষ্মীগোবিন্দগোপাল শালগ্রাম পূজা ইত্যাদি হিন্দুর অনুষ্ঠিত সর্ব্ববিধ পূজা ব্রত নিয়মাদি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ করিতেন, আনন্দের বিষয় এখনও ঐ নিয়মের ব্যাতিক্রম হয় নাই।

তদনন্তর সূর্য্যনারায়ণ ক্রমে বহু সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথম তিনি বাং ১১৮৭ সনে বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাদিরাবাদ তপা চন্দ্রনারায়ণ বারৈয়্যার নামে খরিদ করেন। মুরশিদাবাদের এই মর্ম্মে এক সনন্দ ছিল যে ব্যক্তি কাদিরাবাদ তপার মালিক হইবেন তিনিই "চৌধুরি" এই সম্মানিত আখ্যায় অভিহিত হইবেন। তদনুসারে চন্দ্র নারায়ণ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে যে চৌধুরি উপাধির বয়নামা প্রাপ্ত হন তাহার প্রতিলিপি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই সময় হইতে সূর্য্যনারায়ণ "বারৈয়্যা চৌধুরি" এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ক্রমশঃ তিনি (১) চাকলে রায়পুর (২) চাকলে নুরপুর (জিঃ ঢাকা) (৩) চাকলে আমিরাবাদ (ফরিদপুর) (৪) পরগণে রায় নন্দলালপুর (ফরিদপুর) (৫) পরগণে বোজের ও উমেদপুর (৬) আয়লা ফুলঝুড়ি

(৭) নাগদি শ্রীরামপুর (৮) বুড়া মজুমদার প্রভৃতি আরও অনেক জমিদারী ও তালুকদারী খরিদ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত সম্পত্তি তিনটি অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে আয়লা ফুলঝুড়িতে তিনি যখন সর্ব্বপ্রথম গমন করেন তখন তথায় ২।৪ ঘর ব্যতীত অন্য কোন লোকের বসতি ছিলনা। স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জলে কুম্ভীর ডেঙ্গায় ব্যাঘ্র ভল্লুকের উপদ্রবে তথায় কেহ বাস করিতে পারিতনা, এরূপ অবস্থায় তিনি তথায় উপস্থিত হইলে মগ প্রজাগণ তাঁহাকে মাংস খাওয়ার জন্য কয়েকটী জলৌকা (বড়জোঁক) উপঢৌকন প্রদান করে। ইহাতে তিনি নিতান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলেন।

সূর্য্যনারায়ণের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে সর্ব্ব প্রথম লর্ড ক্লাইভ তৎপর ওয়ারেণ হেষ্টিংশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনও ইংরেজ রাজত্ব সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় নাই। দেশের শাসন ও বিচারকার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে দেশীয় রাজন্য ও জমিদারদিগের উপরই ন্যাস্ত ছিল। প্রত্যেক জমিদারী কাছারিতে বর্ত্তমান সময়ের কোর্টের ন্যায় বিচারাদি কার্য্য হইত—এক কথায় প্রজাদিগের ধনমান প্রাণ জমিদারদিগের ন্যায়পরায়ণতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। প্রতি বৎসর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক জমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত এবং অনেকস্থলেই পরিবর্দ্ধিত হইত। জমিদারগণ সেই উচ্চ রাজস্ব আদায় করিবার জন্য প্রজাগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। নরহত্যা, রমণী-হরণ প্রভৃতি দৈনিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে বাং ১১৭৬ সনে ঐ সকল নারকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রলয়ের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। ভীষণ এক মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ সমগ্র বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া দিল। প্রায়

এক তৃতীয়াংশ লোক পলকে কোথায় যেন উঠিয়া গেল। দেশের এই দুঃসময় ও উৎপীড়নের দিনে এতদঞ্চলে যদি কেহ কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদের পাত্র থাকেন তবে সেই বিক্রমপুরের গৌরব—ক্ষণজন্মা সূর্য্যনারায়ণ। তিনি অজস্র অর্থব্যয় বহু সিপাহী নিযুক্ত করিয়া আশ্রিতের এবং প্রজাগণের ধন মান জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তদীয় সদর ও মফস্বল প্রত্যেক কাছারিতে প্রজাগণ যাহাতে সুবিচার প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য তিনি স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বয়ং সমস্ত পরিদর্শন করিতেন। তিনি দানশীল এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কাদিরাবাদ তপার থানা বাড়ী মৌজায় জোয়ার কলাঘর ও কাঠালিয়া মৌজায় ইষ্টক-নির্ম্মিত দেবমন্দির ও বসত দালান প্রস্তুত করতঃ কোথাও শিবলিঙ্গ কোথাও কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা দৈনিক অর্চ্চনার বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আজিও সেই মন্দিরাদি বর্ত্তমান থাকিয়া তদীয় ধর্ম্মপরায়ণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গালা ১২০০ সনে চাচুরপাশা বাঘিয়া প্রভৃতি গ্রাম পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইল। তখন বৃদ্ধ রামনারায়ণ বারৈয়্যা তৎসংস্থাপিত দৌহিত্র সন্তান আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য ভদ্রবৃন্দ সহ কালীপাড়া গ্রামে, বাঘিয়ার বটব্যালগণ তাহাদের দৌহিত্র সন্তান গঙ্গোপাধ্যায়গণ ও অন্যান্য ভদ্রবৃন্দ সহ সাহাবাজনগর গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহারা, বটেশ্বরের ডিংসাই, কাচাদিয়ার বটব্যাল, ঘটক, সরকার, চাঠাতি ও ভাসুলদির মজুমদারগণকে লইয়া এক বিরাট সমাজ গঠন করিলেন। এই সমাজই পূর্ব্বনামানুসারে "বাঘিয়া চাচুরপাশা" সমাজ নামে খ্যাত। কালক্রমে এই সমাজ লোকসংখ্যায়, পণ্ডিতাধিক্য এবং কৌলিন্য-গৌরবে বিক্রমপুর কেন পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমজে পরিণত হইল এবং নেতৃত্বের ভারও চাচুরপাশার বারৈয্যা জমিদার পরিবারের প্রতি ন্যস্ত

হইল। চাচুরপাশার বারৈষ্যা জমিদারগণ এই সময় কালীপাড়ার জমিদার অথবা বাবু নামে অভিহিত হইলেন।

বিক্রমপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে কালীপাড়া অবস্থিত ছিল। ইহার পশ্চিমাংশ বিধৌত করিয়া খরস্রোতা পদ্মা নদী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিল। দক্ষিণে মাগুরখণ্ড ও সাভাবাজনগর পূর্ব্বে বটেশ্বর উত্তরে রোসরা প্রভৃতি গ্রামসমূহ অপর তিনদিক বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান মাওয়া ষ্টিমার ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নদীর অপর পারে যে বালুকাময় চরাভূমি দৃষ্ট হয় উহাই কালীপাড়ার চর এবং পূর্ব্বে এইস্থানেই কালীপাড়া গ্রামখানি অবস্থিত ছিল।

পদ্মাতট হইতে একটি নাতিদীর্ঘ সুপ্রশস্ত পথ, পূর্ব্বদিকে সরলভাবে বাবুদের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বস্থিত ঘনসন্নিবিষ্ট তালবৃক্ষরাজি পথশ্রান্ত পথিকগণকে সুশীতল ছায়াপ্রদান করিত। পথের পার্শ্ব দিয়াই সুগভীর খাল পদ্মার সহিত মিলিত ছিল। রাস্তার পূর্ব্বপ্রান্তে বিস্তৃত ময়দান—ময়দানের উত্তরে শ্রেণীবদ্ধ জোরপুকুর সমূহ। অতঃপরই বাবুগণের ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহরাজি বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্যনারায়ণ বাং ১২০১ সনে কালীপাড়ার সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বাটীতে যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন উহা বৌলবাড়ীর দীঘি নামে প্রসিদ্ধ এবং উক্ত বাটির নামও বৌলবাড়ী ছিল। তদ্ভিন্ন ছোটকপাট, বড় কপাট প্রভৃতি নামধেয় বহু জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। রামনারায়ণ বৌলবাড়ীর দীঘির পারে একটি সুবৃহৎ বিল্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া জপতপাদি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিতেন।

রামনারায়ণ বার্দ্ধক্যে পুত্রসকাশে কলিকাতা গঙ্গাতীরে বাসের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সূর্য্যনারায়ণ পিতৃ আজ্ঞা পালন করিলেন। পুণ্যাত্মা রামনারায়ণের পাঞ্চভৌতিক দেহ যথাসময়ে গঙ্গাতীরে বিলীন

হইল। কথিত আছে যে, সাধক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দগীর, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, রামনারায়ণ ইহারা সমসাময়িক লোক; পূর্ব্বজন্মে একত্রে একই স্থানে তপশ্চর্য্যা করিবার পর রাজা রামকৃষ্ণ ও রামনারায়ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন কিন্তু ব্রহ্মানন্দগীর ভগবতীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভে মুক্তিলাভ করেন। বিক্রমপুরে মনাইফকির নামে অপর একজন বাক্‌সিদ্ধা ফকির ছিলেন। রামনারায়ণের সঙ্গে তাহার অনেক সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে নিগূঢ় আলোচনা হইত। সূর্য্যনারায়ণ বাটীতে আসিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। তদুপলক্ষে বঙ্গদেশের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া যথোপযুক্ত বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সূর্য্যনারায়ণের দুই পরিণয়। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বঙ্গচন্দ্রনামে পুত্রও পার্ব্বতি নাম্নী কন্যা ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে অন্নপূর্ণা ও জগদম্বা নাম্নী দুই কন্যা ব্যতীত কোন পুত্র সন্তান না জন্মায় দ্বিতীয়া পত্নীকে ১২০১ সনে কান্তনাথ নামক এক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেন। যাহাতে ভবিষ্যতে ভ্রাতৃ-বিরোধ না জন্মে তজ্জন্য তিনি ঔরষজাত বঙ্গচন্দ্রকে সম্পত্তির বার আনি ও দত্তক কান্তনাথকে চারি আনি এবং গৃদখানা বাড়ী ও দেশের সম্পত্তি সহ তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া বাটোয়ারা পত্র লিখিয়া দেন। উক্ত বাটোয়ারা পত্র ১২০৮ ও ১২১২ সনে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বার্দ্ধক্যে সূর্য্যনারায়ণ তীর্থে গমন করিয়া অত্যল্পকাল পরেই তথায় মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তদীয় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও কালীপাড়ার বাটীতে সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল।

বঙ্গচন্দ্র বারৈয়্যা চৌধুরী।

বাঙ্গালা ১১৮৫ সনে চাচুরপাশা গ্রামে বঙ্গচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথ সাবালকত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত

তাহার অভিভাবক বা উছি নিযুক্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত ষোলআনা জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কান্তনাথ সাবালক হইলে তাহার সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গচন্দ্র জমিদারী কার্য্যে এরূপ নিবিষ্ট ছিলেন যে প্রায় প্রত্যেক জমির চতুঃসীমা কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। মিতব্যয়িতা ও স্বাভাবিক নিপুণতাগুণে বহুল পরিমাণে জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তৎকৃত জমিদারী এবং তালুকদারী মধ্যে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত রামনগর পরগণাই উল্লেখযোগ্য। তিনি দানশীলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু ব্যয় সাধ্য "হিরণাগর্ভ" নামক এক সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সুবর্ণ দ্বারা একটী গাভী নির্ম্মাণ করতঃ উহা হইতে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়। এতদুপলক্ষে তিনি নানা স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া উচ্চহারে বিদায় প্রদান ও অগণিত দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গচন্দ্র শিবভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর কয়েক মাস পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কাদিরাবাদে থাকিয়া শিবার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি উমাকান্ত, কাশীকান্ত, কালীকান্ত নামক তিন পুত্র ও দুর্গা, কমলা ও ভব-সুন্দরী নাম্নী তিন কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া বার্দ্ধক্যে কাশীধামের পুণ্য-তীর্থে পরলোকগমন করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কালীপাড়া বাটীতে মহা সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

কান্তনাথ বারৈঘ্যা চৌধুরী।

বাঙ্গলা ১২০০ সনে কান্তনাথ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত আমগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করত ১২০১ সনে দত্তক গৃহীত হন। তিনি ও তদীয় অগ্রজ বঙ্গচন্দ্রের ন্যায়ই বুদ্ধিমান ও জমিদারী কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন।

তিনি অগ্রজের অনুসরণ করিয়া বাকরগঞ্জ জিলাস্থিত তেরখানা গ্রামসম্বলিত জোয়ার তেরচর খরিদ করেন এবং মূলাদির প্রসিদ্ধ বন্দর স্থাপন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক জমিদারী তালুকদারী খরিদ করিয়াছিলেন। কান্তনাথ অগ্রজ বঙ্গচন্দ্রকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গচন্দ্রও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কান্তনাথ প্রায়ই পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যা পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। কান্তনাথ তাহার মাতৃদ্বয় দ্বারা ধর্ম্মঘট ও সর্ব্বজয়া ব্রত প্রতিষ্ঠা করাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় ইত্যাদিতে প্রায় বিংশ সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ১২৪৪ সনের ফাল্গুন মাসে ৪৪ বৎসর মাত্র বয়সে অকালে, শ্যামাকান্ত, অম্বিকাকান্ত নামক দুই পুত্র ও সদানন্দময়ী, ভবানন্দময়ী দেবী নাম্নী দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া যথারীতি নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

বঙ্গচন্দ্র ও কান্তনাথের পরবর্ত্তী বংশধরগণ।

বঙ্গচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র উমাকান্ত বাবুর :—ব্রজচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, নামক মধ্যম পুত্র কাশীকান্ত বাবুর :—নীলকান্ত, কুমুদিনীকান্ত, নিশিকান্ত নামক কনিষ্ঠ পুত্র কালীকান্ত বাবুর :—ব্রজকান্ত, বরদাকান্ত, রজনীকান্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গচন্দ্রের বর্ত্তমানে তদীয় স্ত্রীর শ্রাদ্ধে তাহার পুত্রগণ যেরূপ মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ঐরূপ তখনকার দিনে কেন আজ কালও বড় শ্রুত হওয়া যায় না। সমগ্র বঙ্গের কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করতঃ পাথেয় ব্যতীত প্রত্যেককে নগদ ৫০৲ টাকা সহচার বিদায় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐরূপ উচ্চহারে বিদায় এতদ্দেশে এই প্রথম।

কান্তনাথের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্যামাকান্ত, কনিষ্ঠ অম্বিকাকান্ত।

শ্যামাকান্তবাবু, যামিনীকান্ত, সুরেশকান্ত, দেবেন্দ্রকান্ত নামক তিন পুত্র মধ্যে মধ্যম পুত্র সুরেশকান্তকে কনিষ্ঠ অম্বিকাকান্ত বাবুকে দত্তক দেন। শ্যামাকান্ত কর্ম্মঠ, সুবুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মিতব্যয়ি, স্বদেশানুরাগী বিশেষতঃ জমিদারী কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন। আপন কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৩২১ সনের পৌষ মাসে ৮৭ বৎসর বয়সে চন্দনধুল (চলনদূর) বাটীতে শ্যামাকান্ত এবং ১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে অম্বিকাকান্ত অকালে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে কালীপাড়া বাটীতে পরলোকগমন করেন।

ক্রমশঃ পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাবুগণের সময়ে কালীপাড়া বাটী চারি হিস্যায় বিভক্ত হইল। বঙ্গচন্দ্রের পুত্রত্রয়ের বড় মধ্যম পূর্ব্ব হিস্যা, কান্তনাথের পুত্রদ্বয়ের পশ্চিমের হিস্যা প্রত্যেক হিস্যার সম্মুখেই জোর পুকুর, জোর পুকুরের উত্তরেই প্রত্যেক হিস্যার দ্বিতল ত্রিতল ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ সকল, এরূপ সমসূত্রে ও সুশৃঙ্খলভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে বাটীর সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল। প্রত্যেক হিস্যার প্রথমতঃ বাহির খণ্ডের দেউরিতে লাঠিয়ালগণের তৎপশ্চাতে আমলাগণের আবাস গৃহ তৎপর বরকন্দাজ সিপাহিগণের আড্ডা অতঃপরই বৈঠকখানা দালান। তাহার পর ক্রমে পূজার খণ্ড, অন্দর খণ্ড, পাকের খণ্ড অবস্থিত ছিল। উত্তরে সুবিস্তৃত ফলের বাগান। বাগানের পরেই দৌহিত্র সন্তানগণের পৃথক পৃথক বাড়ী এবং অতঃপর সিকদার পাড়া। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই সম্পতিসম্পন্ন বলিয়া অনেক বাড়ীতেই দ্বিতল ত্রিতল ইষ্টকালয় ছিল সুতরাং উহা আগন্তুকের পক্ষে একটী সমৃদ্ধিশালিনী ক্ষুদ্র নগরী বলিয়া প্রতীয়মান হইত। চারি হিস্যার সিপাহি বরকন্দাজ লাঠিয়ালগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সম্মুখস্থ ময়দানে কুচ কাওয়াজ করিত এবং লাঠি ভাজাইত তখন সাধারণের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইত। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সম্পত্তি

লোক শিক্ষার বিবিধ নূতন পন্থা ও অনুষ্ঠান দ্বারা কালীপাড়ার গৌরব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) কালীপাড়া উচ্চইংরেজি বিদ্যালয়।

ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ও ব্যয়ে ১৮৫৫ খৃঃ কালীপাড়া গ্রামে একটী উচ্চইং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎকালে ঢাকা পোগোজস্কুল ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোথাও উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় ছিল কিনা সন্দেহ। তখনকার হিন্দু সমাজ ইংরেজি-শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন না। যখন নূতন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন এ দেশের স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ, পাশ্চাত্যভাষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। "ইংরেজি ম্লেচ্ছের ভাষা" ইংরেজি পড়িলে জাতি যাইবে" পণ্ডিতগণ সাধারণকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন। জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অন্যান্য প্রদেশে এই প্রচ্ছন্ন বহ্নিই ধূমায়িত হইতে হইতে কালক্রমে সমগ্র ভারতব্যাপী সিপাহি-বিদ্রোহের ভীষণ দাবানলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল কিন্তু উদারপন্থি রদর্শী কালীপাড়ার জমিদারগণ কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে থাকিতে চাহিলেন না। তাঁহারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতৃরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানাস্থানে তাহাদের আদর্শ অবলম্বিত হইতে লাগিল এবং সামাজিক জীবনে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর উদ্ভ্রসাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন এবং স্কুল পরিচালনা বিষয়ে সম্যক উপদেশ প্রদান করিয়া ইউনিভারসিটির নিয়মানুযায়ী স্কুলটী স্থাপন করিয়া গেলেন।

বিদ্যারত্ন প্রমুখ শিক্ষকগণের কৃতিত্ব ও শিক্ষানৈপুণ্যের বিষয় অদ্যাপি বৃদ্ধগণের নিকট শ্রুত হওয়া যায়। ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্রজকান্ত বাবু স্কুলের কার্য্য অতিশয় দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত উক্তকার্য্য পরিচলনা করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরদাকান্ত বাবু জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিপুণতার সহিত স্কুলের কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইংরেজী ১৮৭৮ খৃঃ দ্বাবিংশতি বৎসর অবস্থিতির পর কালীপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলটী পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইল। ইহার পরও পুনরায় স্কুলটী স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে চন্দনধুল নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত বাবু এবং চম্পকদি চামারদি নিবাসী বরদাকান্ত বাবু ১৮৮৮খ্রীঃ কালীপাড়া হাইস্কুল নামে একটী স্কুল চম্পকদি গ্রামে স্থাপন করেন। ঐ বৎসরই উক্ত স্কুল হইতে বরদাকান্ত দে নামক একটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত স্কুলই স্থানান্তরিত হইয়া ইছাপুরা হাইস্কুল নামে পরিচালিত হইতেছে।

(২) টোলের পরীক্ষা।

কালীপাড়া বটেশ্বর সাহাবাজনগর প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্যক টোলছিল। তাহাতে আহার্য্য ও বাসস্থান দিয়া দূরদেশাগত ছাত্রগণকে অধ্যাপকগণ পড়াইতেন। কালক্রমে ইংরেজী পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রথায় টোলের পরীক্ষা না হইয়া পাশ্চাত্য-প্রণালীতে পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে কিনা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্যামাকান্ত বাবু তদীয় কালীপাড়া ভবনে এক মহতি সভা আহ্বান করেন। সভার নির্দ্ধারিত মতে ১২৮২ সনে [illegible] সভা নামে এক সভা গঠিত হইল উক্ত সভার অধীনে

টোলের ছাত্রগণের লিখিত পরীক্ষা-গ্রহণ, প্রশংসা পত্র বৃত্তিদান ও অধ্যাপকদিগকে পুরস্কার ও পাথেয় প্রদান করা হইত। শ্যামাকান্ত বাবু স্বয়ং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি এবং কালীপাড়া হাইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত কালীকুমার বিদ্যারত্ন সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর সুচারুরূপে কার্য্য চলিবার পর কালীপাড়া ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সভার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকের উদ্যোগে উহারই আদর্শে ঢাকা সারস্বতসমাজ হইতে বর্ত্তমান সময়ে টোলের পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে। কিন্তু উক্ত সভার স্মৃতিরক্ষার্থে শ্যামাকান্ত বাবুর ইছাপুরা ভবনে বৈষয়িক শুভ পুণ্যাহ দিবসে উক্ত হিতোপদেশিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ছাত্রদিগকে কিঞ্চিৎ বিদায় ও প্রদান করা হয়।

(৩) অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যালয়।

বিক্রমপুর মাইঝপাড়া নিবাসী ভূতপূর্ব্ব স্কুল বিভাগের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টার কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে শ্যামাকান্ত বাবুর যত্নে ও ব্যয়ে কালীকুমার বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণের অধ্যাপনায় কালীপাড়াতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) দাতব্য ঔষধালয়।

কালীপাড়াতে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত ঔষধালয়ের ডাক্তার ধোপড়াবাসা নিবাসী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অদ্যাপি সুপরিচিত। ধনী দরিদ্র বহুলোক উক্ত ঔষধালয়দ্বারা বিশেষ

(৫) অতিথিশালা।

প্রত্যেক হিন্দুরই অতিথিদের আহার ও বাসস্থানের সুনিয়মিত ব্যবস্থা ছিল। এজন্য পৃথক কর্ম্মচারি ও সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(৬) ডাকঘর।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ডাকঘরের সংখ্যা নাই কিন্তু পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী গ্রামভিন্ন ডাকঘর দৃষ্ট হইত না। স্কুলের সন্নিকটে স্থাপিত ডাকঘর কালক্রমে একটী প্রধান ডাকঘরে পরিণত হইয়াছিল।

(৭) নাট্যশালা।

সমাজ ও লোক-শিক্ষার অঙ্গবিশেষ মনে করিয়া কালীপাড়াতে একটী নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ঢাকানগরী ভিন্ন মফস্বলের কোথাও তখন নাট্যাভিনয় দৃষ্ট হইত না। বেণীসংহার, রামাভিষেক, সতী, হেমলতা, সীতাহরণ, বীরকলঙ্ক, রুক্মিণীহরণ, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আটপাড়া নিবাসী ঢাকা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের যত্ন ও উদ্যম উল্লেখ-যোগ্য।

(৮) পুস্তকাগার।

কালীপাড়াতে "হিতোপদেশিনী" পাঠাগার নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপিত ছিল। এখনও চন্দনধূল শ্যামাকান্ত বাবুর ও ইছাপুরা সুরেশকান্ত বাবুর ভবনে পৃথক পৃথক দুইটী গার্হস্থ্য লাইব্রেরী স্থাপিত রহিয়াছে।

উহাতে হস্তলিখিত ও মুদ্রিত সংস্কৃত বাঙ্গালা, ইংরেজী বহুসংখ্যক ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস নাটক ও উপন্যাসাদি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

(৯) দেবালয়।

কালীপাড়াতে জয়কালীর মন্দির, শিবমন্দির, বিষ্ণু-মন্দির প্রভৃতি দেবালয় ছিল। পূজা অর্চ্চনাদি জাঁকজমকের সহিত নির্ব্বাহ হইত।

(১০) ধর্ম্মকার্য্য।

হিরণ্যগর্ভ তুলা পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি যাগযজ্ঞ সর্ব্বজয়া ধর্ম্মঘট ইত্যাদি ব্রত নিয়ম, দীর্ঘিকা উৎসর্গ, দানসাগর শ্রাদ্ধাদি বহুব্যয় সাধ্য ধর্ম্মকর্ম্ম সকল জমিদার কর্ত্তৃক সুযশ ও কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

(১১) বিবাহাদি কৌলিক ক্রিয়া।

বল্লালীক্ষেত্রে ইহাদের আসন পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বিতীয়। সূর্য্যনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ দেহাটী ও পারেহাল প্রভৃতি মেলে কন্যা সম্প্রদান করিতেন কিন্তু সূর্য্যনারায়ণের সময় হইতেই নৈকষ্য বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের অসংখ্য নৈকষ্য বিচ্ছেদ (ভাষ্টভঙ্গ) করিয়া বংশপরম্পরা কন্যাকে ভরণ-পোষণ উপযোগী বিষয় সম্পত্তি এবং ঘটক কুলীনগণকে রীতিমত বৃত্তি বার্ষিক দিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে বংশপরম্পরা তন্তরের মাশ্চরক, পরাণীমণ্ডলের মহিন্তা, বটেশ্বরের ডিংসাই, বাজপুর ও খিদিরপাড়ার কোয়ারী, পুশিলাল, চান্দগাও ও বিড়ালদির ডিংসাই প্রভৃতি বিখ্যাত শ্রোত্রিয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া

(১২) হাট বাজার।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে থলিপাশা প্রভৃতি গ্রামের মালীক ইঁহারা ছিলেন। রামনারায়ণ বারৈয্যার সময় হইতে থলিপাশাতে হাট ও বাজার নামে একটী প্রাত্যহিক বাজার ছিল উহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। রামনারায়ণ তদীয় দৌহিত্র সন্তান দেহাটী অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায়গণকে থলিপাশা হাটের ধানের তোলা দান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা বার্ষিক ৬০০৲ টাকা উপস্বত্ব পাইতেন।

(১৩) সিকদারপাড়া।

জমিদারগণের এজমালী ও নিজ প্রায় শতাধিক ঘর সিকদার ছিল। তাহাদের বসতির জন্য বৌলবাড়ীর উত্তরাংশে "নরকান্দা" নামে পৃথক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(১৪) মেলা।

শ্রীপঞ্চমী, মাঘি সপ্তমী, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি পার্ব্বণ উপলক্ষে কালীপাড়াতে সাময়িক মেলা বসিত। তন্মধ্যে মাঘী সপ্তমীর মেলায় একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হইত। স্থানীয় নীচ জাতীয় জনৈক স্ত্রীলোক কৃত্রিম শ্মশ্রু গুম্ফ লাগাইয়া বিবিধ কৌতুক প্রদর্শন করিত; বর্ত্তমান সময়েও মেদিনী মণ্ডল গ্রামে ৺জয়কালীর বাটীতে উক্ত মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, চলিত ভাষায় উহাকে "মাগী প্যাদার হাট" বলিত। ঐ সকল মেলায় মেড়াডুস ঘুড়ি খেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদের অনুষ্ঠান হইত।

(১৫) রথযাত্রা ও হোলী উৎসব।

কালীপাড়া বাজারে বিশেষ সমারোহের সহিত রথযাত্রা ও হোলী উৎসব হইত। বরকন্দাজ এবং গ্রাম্যগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া হোলী গান করিত এবং রং ও আবির খেলিত।

কালীপাড়া ধ্বংসের পরবর্ত্তী বিবরণ।

কালক্রমে পদ্মা নদীর ভীষণ স্রোতবেগে ১২৮৫ সনের শ্রাবণ মাসে কালীপাড়া তৎপর বৎসর সাহাবাজনগর বটেশ্বর মাগুরখণ্ড গ্রাম প্রভৃতি পদ্মা গর্ভে নিমজ্জিত হইলে সকলেই মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ বিক্রমপুরে সুবৃহৎ এমন কোন স্থান ছিলনা যে স্থানে সকল লোকের সংকুলান হইতে পারে। এমতাবস্থায় কয়েক বৎসর নানা স্থানে থাকিয়া কতক লোক কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) কাঠাদিয়া প্রভৃতি গ্রামে এবং অবশিষ্ট অধিকাংশ সামাজিকগণ ইছাপুরা চামারদি রাজদিয়া চন্দনধুল প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কালীপাড়ার জমিদারগণ বিক্রমপুরের নানা গ্রামে বিভিন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। শ্যামাকান্ত বাবুর পুত্র যামিনীকান্ত দেবেন্দ্রকান্ত চন্দনধুল গ্রামে, অম্বিকাকান্ত বাবুর পুত্র সুরেশকান্ত এবং চন্দ্রকান্ত বাবুর পুত্র নর্ম্মদাকান্ত, স্বয়ং সূর্য্যকান্ত বাবু ইছাপুরা গ্রামে, ব্রজকান্ত বাবুর পুত্র ববদা, জ্ঞানদাকান্ত এবং রজনীকান্ত বাবুর পুত্র সুরেন্দ্র, নরেন্দ্রকান্ত চম্পকদি গ্রামে, বরদাকান্ত বাবুর পুত্র সতীশ, অনুপ, যতীশকান্ত পশ্চিম পাড়া গ্রামে, আর নীলকান্ত বাবুর পৌত্র মনীন্দ্র, কুমুদিনীকান্ত বাবুর পুত্র ভবরঞ্জন তরণী ক্ষীরোদ ত্রিপুরাকান্ত ও নিশিকান্ত বাবুর পুত্র প্রমদা কেদারকান্ত পদ্মাতীরবর্ত্তী মেদিনীমণ্ডল গ্রামে বাস করিতেছেন। এরূপে ইঁহারা নানা স্থানে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি ও অনেকাংশে বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু ভগবানের কৃপায় নানাবিধ দৈবদুর্ব্বিপাকের পরও বাঘিয়া চাচুরপাশা গ্রামের অধিকাংশ

সামাজিকগণ ইছাপুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বাস করাতে পুরুষ পরম্পরা অর্জ্জিত সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন।

চৌধুরি সনদের বয়নামার প্রতিলিপি।

মত্ত সুদ্দিয়ান ও মহম্মত হান ও আএল্লা ও চৌধুরি আন ও কাননগো আন ও তাহুত দারান ও রায়তান ও জিরাতিআন তপ্পে কাদিরাবাদ আমলে পরগণে বোজেরগু উমেদপুর মহাল জায়গীর সরকার আলি সরকার বাজু হায় মোতালকে জিলা জাহাঙ্গীরনগর মুজাফসুতে জিন্নতল বিলাত বাঙ্গলা বেদানন্দ তপা মজকুরের মামুদ সফি চৌধুরী সরকারের মবলক হায় খাজানা বাবদ সন ১১৮৬ শাল আপন জিম্বে বাকী রাখিয়াছে তাহাতে নিলামে দুই দফা হুকুম নামা লটকানে ও সরকার খাজানা আদায় করিলেক না একারণ বড় সাহেব ও কৌন্সুলি সাহেবানের হুকুম বমজিম বাং তারিখ ১৬ মাহে জ্যৈষ্ঠ সন ১১৮৭। সাল বাঙ্গালা মোতাবেক ২৬ মাহে মাই ১৭৮০ শাল ইংরেজী দেওয়ানী আদালতের কাচারিতে তপা মজকুর নিলাম হইল। নিলামের সময় চন্দ্রনারায়ণ বাড়ৈয়া বন্দবস্ত তপা মজকুর মঃ ১২৫০৲ বার শত পঞ্চাশ টাকায় সিক্কা কিস্মতে খরিদ করিয়া কিস্মতের টাকাহ নগদ দাখিল করিয়াছে অতএব তপা মজকুরের চৌধুরাই মামুদ সফি চৌধুরীর তসিরিতে নিলামের তারিখ ইস্তক চন্দ্রনারায়ণ মজকুরকে মোকরর হইল। আমলতো দেয়ানতে রাস্ত দুরস্ত থাকিবে। প্রজা লোকের সহিত সলুকে কাজ করিবে। যে দেহাহারের আরাজি অধিক জাহির হয়ে এবং সরকারি মাল গুজারি বর তক্ত আদায় করিবে ও দরগাতে যে আবুয়াব মানা আছে তাহাতে পরহেজ থাকিবেক ও তোমরা ইহাকে তপা মজকুরের চৌধুরি কাত্রম ও ইহার মোহর ও দস্তখত ও মার তকমিম কাগজে মাতব্বর জানিবা ও দোসরা কাহাকে ইহার

চতুর্থ অধ্যায়।

ভাগ্যকূলের কুণ্ডু-পরিবার—

পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ভাগ্যকূলের কুণ্ডু-পরিবারের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের সর্ব্বপ্রধান খ্যাতিমান্ ব্যক্তিরনাম জগন্নাথ কুণ্ডু রায়। ইহাঁকেই এই বংশের সৌভাগ্যের মূল-পুরুষ বলা যাইতে পারে। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস পূর্ব্বে লৌহজঙ্গ গ্রামে ছিল। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নাজিম সিরাজদ্দৌলার অধীনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ যখন ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেই সময়ে জগন্নাথ রাজবল্লভের জমিদারীর দেওয়ানী কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি ও সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। জগন্নাথ রাজবল্লভের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাঁহার কার্য্য-কুশলতায় প্রীতিলাভ করিয়া তিনি তাঁহাকে "রায়" এই সম্মানজনক উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। (১) সেকালে দানশীল এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতীত অপরেরপক্ষে এইরূপ গৌরবজনক উপাধিলাভ ঘটিত না।

সেকালে জগন্নাথ কুণ্ডুর ন্যায় সাঁতরা-পাড়ার কৃষ্ণরাম কুণ্ডুর নামও বিশেষ বিখ্যাত ছিল। সাঁতরাপাড়া বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া

(১) এ বিষয় মতভেদ আছে।

* 'District Gazetter of Dacca' তে ভাগ্যকূল সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইয়াছে। **Bhagyakul**—Viliage situated on the banks of the Padma river in the South-west Corner of the Munshignaj Subdivision. It is the family home of the wealthy Bhagyakul Babus, but as it is exposed to the erosive action of the river, they have abandoned the attempt to erect masonry buildings and their present quarters are of the most primitive description. There is a prosperous market at Bhagyakul and a charitable dispensary maintained by the family. The Bhagyakul Babus have made their fortunes in trade and the principal members of the family live in Calcutta. P. 171. (Dacca District Gageteer).

গিয়াছে। উহা বর্ত্তমান ভাগ্যকূল গ্রামের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। জগন্নাথ হইতেও কৃষ্ণরামের 'ধনী' খ্যাতি সেকালে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে যে তাহার স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা ও কড়ি এত অধিক ছিল যে একটি বেতের বটুয়ার' সাহায্যে সে সকল ওজন করিতে হইত। তখন চুরি, ডাকাইতি, রাহাজানি ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে ছিল, কৃষ্ণরামের জীবদ্দশায় তাঁহার বাড়ীতে চারিবার ডাকাইতি হয়। এখানে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে উপরোক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদ্বয় কুণ্ডু বংশোদ্ভব হইলেও বর্ত্তমানের খ্যাতিমান রায় বংশের ইঁহারা আদিপুরুষ নহেন, তবে ইঁহারা যে এক সময়ে কুণ্ডু বংশের গৌরবস্বরূপ ছিলেন তাহারও উল্লেখ করাও একান্ত প্রয়োজন।

ভাগ্যকুলের রায়বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কৃষ্ণজীবনরায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহার দ্বারাই ভাগ্যকুল রায় বংশের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। ইনি ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন ও যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি করেন। সহস্র সহস্র কুলীনব্রাহ্মণ নিবেসিত সুপ্রসিদ্ধ কালীপাড়া বা কাউলীপাড়ার দক্ষিণাংশে নূরপুর নামক গ্রামে ইঁহার বাসস্থান ছিল, তথায় ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অর্চ্চনা করিতে থাকেন। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর সেবায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহার ধনৈশ্বর্য্য অত্যধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে। কৃষ্ণজীবন রায় চারিপুত্র ও প্রচুর নগদ ধন-সম্পত্তি রাখিয়া কালকবলে নিপতিত হন। তন্মধ্যে কৃষ্ণজীবনের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র হইতেই ভাগ্যকুলের বর্ত্তমান কুণ্ডুবংশের উৎপত্তি। রামচন্দ্র রায় অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা পরমপিতার চিন্তাতেই অধিকাংশ সময় নিমগ্ন থাকিতেন। ব্যবসাবাণিজ্য বা ভূসম্পত্তি এসকলের তত্ত্বাবধানের দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখিতেন না। এইরূপ ধর্ম্মানুরাগের জন্য তিনি দেশবিদেশে

সর্ব্বত্র রামচন্দ্র বৈরাগী বা সন্ন্যাসী রামচন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন। বিষয় কর্ম্মে অমনোযোগী থাকিলেও লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ভূসম্পত্তি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি অন্যান্য ভ্রাতৃগণকেও নগদ অর্থে ও ভূসম্পত্তিতে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই একমাত্র পুত্র গঙ্গা-প্রসাদকে রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোকগত হন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার খুড়মাতার স্নেহাঞ্চলে পালিত হন। গঙ্গাপ্রসাদ ব্যবসা বাণিজ্যদ্বারা কেবল বিক্রমপুরে কেন, ঢাকার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই প্রসিদ্ধি ও উন্নতির মূলকারণ গঙ্গাপ্রসাদের তৎকালীন ঢাকার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী জীবনবাবুর সহিত মিলিত হওয়া। সে সময়ে জীবনবাবুর নাম সমগ্র বাঙ্গলাদেশেই বিশেষ খ্যাতিমান ছিল। তিনি একবার কলিকাতা আসিলে প্রত্যেক মজলিসে প্রত্যেক সভা-সমিতিতেই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। এহেন জীবনবাবুর লবণ ব্যবসায়ের অংশীদার হইতে পারায় সত্য সত্যই গঙ্গাপ্রসাদ আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় এদেশে লবণের ব্যবসায় একটি বিশেষ লাভজনক কারবার ছিল, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিই এই ব্যবসা করিতে চাহিতেন এবং অনেকে এ ব্যবসা করিয়াই পরিশেষে বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদও জীবনবাবুর সহকারী হইয়া প্রভূত অর্থ-সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কয়েকবৎসর একযোগে ব্যবসা চলিয়াছিল, পরে জীবনবাবুর অনুমত্যানুসারে গঙ্গাপ্রসাদ স্বতন্ত্ররূপে নিজ নামে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন, এবং কলিকাতা, নলচিটি, সৈদপুর, বাখরগঞ্জের অন্তর্গত নানাস্থানে ও নারায়ণগঞ্জে ব্যবসা চালাইবার সুবিধার জন্য কলিকাতায় এক বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এইরূপ বিচক্ষণতার সহিত ব বসা চালাইবার ব্যবস্থা করায় তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল,

অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভূসম্পত্তি ও ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থশালী হইয়া তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য এবং দানশীলতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তিনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতেন।

এই সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস নূরপুর গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হয়। সেজন্য ১২১৩ সালে আত্মীয়স্বজনবর্গ সহ আওয়াল নামক গ্রামে যাইয়া বাসবাটি নির্ম্মাণ করেন। এই সময় হইতে কুণ্ডুবংশ আওয়ালের কুণ্ডুবংশ নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হয়। বঙ্গীয় ১২১৪ সালের প্রারম্ভে গঙ্গাপ্রসাদ বহু সংখ্যক অনুচরসহ অনেক তরণী সহযোগে গয়া, কাশী, এবং বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ বৃন্দাবনধামে তীর্থযাত্রা করেন। তৎকালে তীর্থযাত্রা নিরাপদ ছিল না, পথে ঘাটে প্রায়ই বিপদ ঘটিত। তীর্থ যাত্রীদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করাই এসময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামবাসিগণের অর্থাগমের প্রধান উপায় ছিল। কাজেই গঙ্গাপ্রসাদ তিন চারি মাসের খাদ্যদ্রব্যাদির সংস্থান এবং উপযুক্ত রূপ লোকজন ও নৌবহর লইয়া বৃন্দাবনধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেই সময়ে তিন চারি মাসের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ হইতে বৃন্দাবনে যাওয়া যাইত না।

গঙ্গাপ্রসাদ নিরাপদে বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তথায় যমুনার তীরে একটী সুন্দর বাটী ক্রয় করিয়া রাধামাধবজীউর প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্তবাড়ী দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। তৎপর তিনি জয়পুরে গোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া ও অন্যান্য তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় একবৎসর পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার গুরুপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, চৈতন্যদাস, এবং প্রেমচাঁদ নামে চারিপুত্র এবং সত্যবতী নামে এক কন্যা যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করে। কন্যাসত্যবতী ও উত্তরকালে স্বামী গৃহে যাইয়া প্রচুর সুখশান্তি

উপভোগ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রায় নিত্যানন্দ রায় বাহাদুরের পিতামহী ছিলেন। পক্ষান্তরে তারামণির পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ, চৈতন্যদাস ও প্রেমচাঁদ বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। ১২২৭ সালে চারিপুত্র ও কন্যা রাখিয়া গঙ্গাপ্রসাদ বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল যে তিনি একদিকে যেমন প্রকৃত বৈষয়িক পণ্ডিত ছিলেন তদ্রূপ উদার চরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। এইরূপ কৃতজ্ঞব্যক্তি সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহাদের বংশের পরম হিতৈষী জীবনবাবুকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। জীবনবাবুর প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল।

গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুপ্রসাদ সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। গুরুপ্রসাদ, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় প্রেমচাঁদ ও চৈতন্যদাসের সহায়তায় সমাজে অল্পকাল মধ্যেই রায়পরিবারের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। এসময়ে ইঁহারা ধানকুনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ধানকুনিয়ার হাট প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর অল্প কয়েকবৎসর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ওলাউঠা রোগে হঠাৎ লোকান্তরিত হন, তিনি মৃত্যুসময়ে তদীয় পত্নীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন। এসময়ে ইহারা কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, সৈদপুর, নলচিঠি প্রভৃতি অঞ্চলে লবণের কারবার করিতেন।

সেই সময়ে কলিকাতা বোর্ডঅবরেভিনিউ-আফিসে সহস্র সহস্র মণ লবণ নীলামে বিক্রীত হইত, নানাস্থানের বণিক ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ উহা ডাকিয়া লইতেন। রায় ভ্রাতৃগণ প্রতি বৎসর উচ্চহারে লবণ খরিদ করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র তাহা চালান দিয়া লাভবান হইতেন। বরিশালে চাউলের কারবার ও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। একবার গুরুপ্রসাদ রায়

ও তাহার ভ্রাতৃগণ তেরলক্ষ টাকার লবণ নীলামে খরিদ করেন। রেভিনিউ আফিসের প্রধান কার্য্যকারক গুরুপ্রসাদের এই ডাকে একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার যে যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল তাহাও বলা বাহুল্য কিন্তু গুরুপ্রসাদ যখন তন্মুহূর্ত্তেই উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট নগদ তেরলক্ষ টাকা মজুত রাখিলেন তখন আর কাহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই একটী ঘটনার পর হইতে গুরুপ্রসাদের নাম কেবল যে কলিকাতা তাহা নহে বঙ্গের সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িল। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে আউয়ালের কুণ্ডু পরিবার ঢাকার মথুরপোদ্দার (রূপবাবু ও রঘু বাবুর পূর্ব্বপুরুষ), লৌহজঙ্গের পালবাবু এবং বালিয়াটির জমিদারেরাই সুপ্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু আড়াআড়ি বা দ্বেষের ভাব ছিল কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই কুণ্ডু পরিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। বাঙ্গলা ১২২৮ সালে গুরুপ্রসাদ প্রভৃতির মাতা ইহাদের কলিকাতাস্থিত বাসভবনে নব্বুই বৎসরে পরলোক গমন করেন। মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ইহারা বহু অর্থ ব্যয় করেন, বঙ্গের নানা স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেককে উপযুক্ত রূপে বিদায় ইত্যাদি প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ গরদের ধুতি চাদর এবং উপযুক্তরূপে দক্ষিণা পাইয়াছিলেন এতদ্ব্যতীত ষোলটি সোণার কলস সোণার প্রদীপ সোণার গ্লাস সোণার থালা ইত্যাদি ইঁহাদের গুরুবংশকে উপহৃত হয়। দীন দরিদ্র-গণের মধ্যে অবস্থা বিবেচনায় ১৲ ২৲ টাকা করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা বিতরিত হয়। এই দান সাগর-শ্রাদ্ধে কুণ্ডুপরিবারের নগদ ছয়লক্ষ টাকা ব্যয় হয় ইহার পর হইতে রায় পরিবারের ধন-গৌরব এবং রায় গুরুপ্রসাদের দানশীলতার কথা বঙ্গের সর্ব্বত্রই গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে জমিদারী এবং বাড়ী ইত্যাদি ক্রয়ে মনোনিবেশ করেন।

রায় ভ্রাতৃগণ বিখ্যাত রসুলপুর পরগণার পাঁচআনা অংশে ক্রয় করেন। ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহ জেলার জমিদারীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদার বংশ বিখ্যাত; ইঁহারা উপযুক্ত সময়ে সদর খাজানা দিতে না পারায় সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়, রায়ভ্রাতৃগণ সেই সম্পত্তি বিশ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করেন সে সময়ে উহার তাদৃশ আয় না থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে উহার আয়ই ত্রিশহাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে।

এ সম্পত্তি ক্রয় ব্যাপারে গুরুপ্রসাদ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। সম্পত্তি-বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, মর্ম্মপীড়িত বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্সী জহরুদ্দিন চৌধুরী সম্পত্তির নবীন মালিক গুরুপ্রসাদ ও তাহাদের ভ্রাতাদের সহিত নারায়ণগঞ্জ আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে যদি তিনি এক বৎসরের মধ্যে যে মূল্যে রায় ভ্রাতৃগণ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন তাহা দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্পত্তি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন কিনা। রায় ভ্রাতৃগণ বলিলেন যে, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা এক বৎসরের মধ্যে সম্পত্তি দখল করিব না, আপনার নিকট আমরা সুদ চাহিনা, কেবল মাত্র টাকাটা দিতে পারিলেই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিব। বৃদ্ধের আশা পূর্ণ হইল না। জহরুদ্দিন চৌধুরী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, সম্পত্তি কুণ্ডুবাবুদেরই রহিয়া গেল। বিক্রমপুরের মধ্যস্থিত, সেরাজদিখাঁ, সিংপাড়া, ইমামগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলিই এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

সে কালে জমিদারী পরিচালনা করা বিষম ঝঞ্ঝাটের বিষয় ছিল। নবক্রীত জমিদারী দখল করা আরও বিপজ্জনক হইল, সামান্য ব্যাপারেই দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়া যাইত। ইহারা প্রথম যে দিন সেরাজদিখাঁর কাচারী দখল করিতে যান, তখন এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া যান।

কুণ্ডু বাবুরা যে দিন কাচারী দখল করিতে প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন, সে দিন নানাস্থান হইতে বহু দুষ্টলোক তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সকলে দেখিল কর্ম্মচারী মহাশয় খুব বড় এক বজ্‌রায় আসিয়াছেন, আর সঙ্গে বহু ছোট বড় নৌকা, নৌকায় শত শত লাঠিয়ালের দল লাঠি হস্তে বসিয়া আছে। বজ্‌রা তীরে লাগিল। কর্ম্মচারী মহাশয় লাঠিয়ালগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে কাচারী গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাহার পশ্চাতে পঞ্চাশ জন মুটে পঞ্চাশটি থলিয়া ভরা টাকা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলে ভাবিল সহজ ব্যাপার নয়, দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য এবং মাম্‌লা মোকদ্দমার জন্য যে প্রথমেই এক লক্ষ টাকা সহ কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়াছে, এত বড় সহজ ব্যাপার নয়, কাজেই সকলে ভয়ে ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইয়া গেল। প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় নিরাপদে কাচারী দখল করিলেন। ঐ সকল থলিয়া মধ্যে মাত্র একটীতে টাকা ছিল, বাকী সব কয়টীতেই ইট পাটকেল মাত্র ভরা ছিল, এমনি করিয়া কৌশলে কাজ হইল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রেমচাঁদ সে সময়ের ধনীবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রেমচাঁদ রায় সুবিখ্যাত রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর, রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর এবং অনারেবল রায় সীতানাথ বাহাদুরের পিতা। সে কালে পার্শীভাষার সর্ব্বত্র আদর ছিল। আদালত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পার্শীভাষা প্রচলিত থাকায় সকলেই নিজ নিজ সন্তানদিগকে পার্শী ভাষায় শিক্ষা দিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ বালক প্রেমচাঁদকে পার্শী ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন। এবং যাহাতে কোনও ভাল মক্তবে তাহার পড়িবার ব্যবস্থা হয় সেজন্য জীবন বাবুকে বিশেষরূপ অনুরোধ করেন। জীবন বাবুর তত্ত্বাবধানে প্রেমচাঁদ বিশেষরূপে পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে

দুইবার ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সে সময়ে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের কোনরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষা ছিল না। সাধারণতঃ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশ হইতেই যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে ঐ সকল পদে নিযুক্ত করা হইত। গুরুপ্রসাদ প্রেমচাঁদের চাকরীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি তাঁহাকে পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। সরকার বাহাদুরের এইরূপ অনুগ্রহ প্রস্তাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া তিনি প্রেমচাঁদকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। গুরুপ্রসাদ ও প্রেমচাঁদের চেষ্টা যত্ন ও আন্তরিক অধ্যবসায়ের ফলেই বর্ত্তমান সময়ে রায়পরিবার দেশবিদেশে এত বড় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১২৪৬ সালে কুণ্ডুপরিবারের পৈত্রিক বাসগ্রাম পদ্মানদীর কুক্ষিগত হইলে ইহারা আউয়ালের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগ্যকূল নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন।

বর্ত্তমান কুণ্ডুপরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি খ্যাতনামা রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ভাগ্যকূলের বাড়ীতে বাঙ্গলা ১২৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদ রায়ের অপর দুই পুত্র রায়বাহাদুর জানকীনাথ ও মান্যবর সীতানাথ রায় বাহাদুর ও এই বাড়ীতে যথাক্রমে বঙ্গীয় ১২৫৫ ও ১২৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুপ্রসাদ রায়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিপ্রসাদ রায়ের মৌখিক অনুমত্যানুসারে হরিপ্রসাদ রায়ের বিধবা পত্নী গুরুপ্রসাদের তৃতীয় বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হরলাল রায়কে পোষ্যপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন। সিংপাড়ার বাজার সৃষ্টিও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি।

১২৫১ সালে গুরুপ্রসাদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ধর্ম্মে কর্ম্মে কিছু অর্থব্যয় করা স্থির করিয়া বর্দ্ধমান, বীরভূম, প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কীর্ত্তনিয়ার দল আনয়ন করিয়া এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। শান্তিপুর, খর্দ্দ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বৈষ্ণবগোস্বামীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া একে একে

আসিয়া ভাগ্যকূলে সমবেত হইলেন। প্রায় এক মাস কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তনিয়ার দল ও বৈষ্ণব গোস্বামীগণ ভাগ্যকূলে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গোস্বামী মহাশয়কে শালের জোড়, গরদের জোর, এবং নগদ ২০৲ বিশ টাকা হারে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। নানাস্থানের টোলের পণ্ডিতেরাও ঐরূপ ভাবে বিদায় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে মহোৎসব করিয়াছিলেন ঐরূপ মহোৎসব এ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের আর কেহই করেন নাই। ঐরূপ মহোৎসবকে চৌদ্দ মাদল মহোৎসব কহে।

গুরুপ্রসাদ রায়ের দুই পুত্র মথুরামোহন ও প্যারীমোহন উত্তর কালে শিক্ষা, জ্ঞান ও দানশীলতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মথুরামোহন পরমধার্ম্মিক ও দয়াশীল ছিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকেও কটু কথা বলিতেন না। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা এবং পার্শী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাদি বিশদরূপে করিতে পারিতেন। ১২৭৩ সালে যে বার ব্রহ্মপুত্রে বুধাষ্টমি যোগ হয়, সেইবার তাঁহার পালা ছিল, তদুপলক্ষে যাতায়াতে পঞ্চাশ হাজারের উর্দ্ধলোককে পাঁচ ছয় রকমের সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, চিনি এবং বালকদিগকে দুগ্ধ দিয়া তৃপ্তিমতে ভোজন করাইয়াছিলেন। একদিন রাত্রিযোগে সেই সময় বৃহৎ ঝড় হওয়ায় তিনি পাগলের ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত অতিথিদিগকে গরিবগণ ও গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণকে অনুরোধ করিয়া গৃহমধ্যস্থিত দালান ও গ্রাম্যবিশিষ্ট লোকদিগকে বাড়ীতে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এইরূপ নানাগুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট উদারচরিত লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা প্যারীমোহন ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ প্রাজ্ঞ ছিলেন। এজমালী সময়ে জমিদারী কার্য্যের ভার তাহার উপরেই ন্যাস্ত ছিল। তিনি এক পুত্র ও কন্যা রাখিয়া অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।

চৈতন্যদাসের তিন পুত্র কিশোরীমোহন, গোপীমোহন এবং বৈকুণ্ঠ মোহন। তন্মধ্যে কিশোরীমোহন ও গোপীমোহন উভয়েই বিশেষ ধর্ম্মশীল লোক ছিলেন। বৈকুণ্ঠমোহন অসাধারণ বুদ্ধিজীবি লোক ছিলেন এবং তাঁহারি চেষ্টায় উহারা নিজে বহু জমিদারীর মালিক হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তেজারতি কারবার দ্বারা তিন ভাই বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠমোহন অত্যন্ত মোকদ্দমাপ্রিয় লোক ছিলেন বলিয়া মামলায় মোকদ্দমায় বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। গোপীমোহনের পোষ্য-পুত্র গিরিধারী রায় অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তাঁহার উইলে ঢাকা জেলার হিন্দু বিধবাদের সাহায্যার্থ ৪০,০০৲, টাকা এবং সেরাজদিখাঁ গ্রামে দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য আরও চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। *

কিশোরীমোহন, গোপীমোহন, ও বৈকুণ্ঠমো ন রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে রূপার দান-সাগর, বৃষোৎসর্গ, একদৃষ্ট ইত্যাদি উৎকৃষ্ট রূপে সমাধা করিয়াছিলেন এবং ৪০০ চারিশত পণ্ডিতকে ৪০৲ চল্লিশ টাকা সহচারে দান এবং বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে জুরিশাল দেওয়া হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে জুরি শাল দেওয়ার প্রথা রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুরই সর্ব্ব প্রথম প্রচলন করেন ঐ রীতিই অতঃপর অন্যান্যে অনুকরণ করেন।

এতদ্ব্যতীত অলীক ব্রাহ্মণ এবং কাঙ্গালীকে নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া ভোজন করান এবং প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া বস্ত্র আর সাধারণ ব্রাহ্মণকে ২৲ দুই টাকা এবং বোবা, কালা, অন্ধ, আতুরদিগকে ৪৲ চারি টাকা হারে দেওয়া হয়।

---

* সেরাজদিখাঁ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুবিধবাদের সাহায্যার্থ যে চল্লিশ হাজার টাকা দানের কথা উইলে লিখিত ছিল, তাহার কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহে।

তৃতীয় ভ্রাতা চৈতন্যদাসের তিন পুত্র কিশোরীমোহন, গোপীমোহন এবং বৈকুণ্ঠমোহন। হরিপ্রসাদ অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। হরিপ্রসাদের বিধবা পত্নী পতির আদেশানুসারে আনুমানিক ১২২৭ কিংবা ১২৩০ সনে হরলাল রায়কে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। হরলাল অকালে কালকবলে নিপতিত হন।

তাঁহার বিধবা পত্নী পতির আদেশানুসারে ১২৭১ সনে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন—সেই পুত্রই দেশ-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়। যখন এই পরিবার পৃথগান্ন হ'ন, তখন গুরুপ্রসাদ কলিকাতাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ঐ সংবাদে এতদূর মর্ম্মাহত হ'ন যে আর কখনও বাড়ীতে ফিরিয়া যান নাই। এইরূপ ভাবে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি চিরদিনের জন্য বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন ধামে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। গুরুপ্রসাদের বৃন্দাবন যাত্রার অব্যবহিত পরে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রেমচাঁদ রায় জ্বর ও আমাশায় রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হ'ন। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া কালীপাড়ার জমিদারবর্গ এবং লৌহজঙ্গের পালবাবুগণ ও অন্যান্য বিক্রমপুরস্থ ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে ঢাকার সিভিল সার্জ্জন সিম্‌সন সাহেবের খুব নাম ও খ্যাতি ছিল। প্রেমচাঁদ রায়ের পুত্রগণ সিম্‌সন সাহেবকে ভাগ্যকূলে আনিবার জন্য ঢাকায় লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিম্‌সন সাহেব আসিতে না পারিয়া তাহার বন্ধু রেজিমেণ্টের ডাক্তার হোয়াইট সাহেবকে ভাগ্যকূল প্রেরণ করেন। দৈনিক একহাজার টাকা ভিজিটে হোয়াইট সাহেব ভাগ্যকূল আসিয়া মাত্র একদিন একরাত্রি ছিলেন। তিনি রোগীকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঢাকা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। পিতৃভক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় ডাক্তার সাহেবের

আদেশানুযায়ী পিতা প্রেমচাঁদকে ঢাকা লইয়া যান, ডাক্তার সিম্‌সনের সুচিকিৎসায় একমাস মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপে রোগ মুক্ত হন। রোগ মুক্ত হইয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া কয়েক মাস ভাগ্যকূলে অবস্থান করেন তৎপর সপরিবারে কলিকাত যাত্রা করিলেন।

১৮৭১ খৃঃ যে ভয়ঙ্কর ঝড় ও তুফান হয় তাঁহার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে মাত্র তিনি নিরাপদে কলিকাতা পৌছিতে পারিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ কলিকাতা হইতে একবার জন্মের মত স্বীয় স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনধামে গমন করেন। গুরুপ্রসাদ প্রেমচাঁদের প্রমুখাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র হরলালের মৃত্যু-সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাহার নিকট এই শোক-সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক হইয়াছিল। কিছুদিন বৃন্দাবন থাকিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-বন্দনা করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এ যাত্রায় তিনি জয়পুর, ভরতপুর, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি হিন্দুর পরম পবিত্র পুণ্য-তীর্থ সমূহ দর্শন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় গুরুপ্রসাদ স্নেহময় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিদায় দিতে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ ও বালকের ন্যায় অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রজের চরণ বন্দনা করিয়া বৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমচাঁদের শকট দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একদৃষ্টে শকটের দিকে চাহিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ তীর্থ-ভ্রমণের পর কলিকাতায় আসিয়া এক বৎসর অবস্থান করেন, তৎপর ১২৭২ সনের আশ্বিন মাসে ভাগ্যকূল প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে গুরুপ্রসাদ শ্রীবৃন্দাবন ধামে মানব-লীলা সংবরণ করেন। এই সংবাদ কয়েক দিন পরে ভাগ্যকূল পৌছিল, সেসময়ে ভাগ্যকূলে কোন টেলিগ্রাফ আফিস ছিলনা। নারায়ণগঞ্জের

প্রায় এক ঘটিকার সময় এই দুঃসংবাদ প্রেমচাঁদ এবং গুরুপ্রসাদের পুত্রদ্বয় জ্ঞাত হইল! এই সংবাদে প্রেমচাঁদ এবং গুরুপ্রসাদের পুত্রদ্বয় বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। তাহার মৃত্যু-সংবাদে কেবল যে ভাগ্যকুলবাসীর শোকের কারণ হইয়াছিল তাহা নহে, সমগ্র বিক্রমপুরবাসী এই দুঃসংবাদে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। গুরুপ্রসাদ প্রকৃত পক্ষেই দেশের একজন গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার দানশীলতা, বিষয় কার্য্যে পারদর্শিতা বস্তুতঃই দেশবাসীর গৌরবের কারণ ছিল।

১২৭২ সালের পৌষ মাসে ইহার শ্রাদ্ধ-কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ ব্যয়-বাহুল্য পূর্ণ শ্রাদ্ধ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গ, বিহার, ওড়ষ্যার নানা জিলার সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ইহাদের সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত হইয়াছিল। পাথেয় ব্যতিরেকে পাণ্ডিত্যানুযায়ী একশত হইতে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত বিদায় দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক পণ্ডিতকে ৪০৲ হারে বিদায়, গরদের জোর বহু সংখ্যক কাঙ্গালী দিগকে ২৲ টাকা ও ৪৲ টাকা দেওয়া হয়। সাধারণ কাঙ্গালীদিগকে ১৲ এক টাকা এবং বোবা ও অন্ধ আতুরদিগকে ২৲ দুই টাকা দেওয়া হয় ও নানাবিধ মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি দিয়া প্রায় বিশ হাজার লোককে পরিতোষ মতে আহার করান হইয়াছিল।

মথুরামোহনের মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ও উপরোক্ত রূপ রূপার দানসাগর, বৃষোৎসর্গ, একদৃষ্ট, ষোড়শ ইত্যাদি হইয়াছিল।

গুরুপ্রসাদের দুইপুত্র মথুরামোহন ও প্যারীমোহনের বংশধরগণও বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষায় এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বঙ্গের নানাস্থানে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মথুরামোহনের দুই পুত্র ব্রজলাল ও রাধিকালাল। ব্রজলালের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর

রায়, হলধর রায় ও শশধর রায়। মুরলী বাবু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একজন কৃতীব্যক্তি, ইনি কংগ্রেসের একজন অনুরক্ত ভক্ত। হলধর বাবু চিত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শশধরের শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। রাধিকালালের চারি পুত্র শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রকৃষ্ণ, উপেন্দ্রকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ ও খোকা। প্যারীমোহনের তিন পুত্র বিনোদী লাল, শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় ও শ্রীযুক্ত যশোদালাল রায়। বিনোদীলালের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়। তড়িৎ বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন এটর্ণী এবং বঙ্গীয় মহাজনসভার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু কলিকাতার জনৈক পোর্টকমিশনার এবং বর্ত্তমান ভাগ্যকূল রায় পরিবারের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং অমায়িক চরিত্রের লোক। ছেলেদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত করিবার জন্য ইনি সবিশেষ মনোযোগী। ইহাঁর চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ননীলাল এটর্ণীসিপপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনজনের এখনও শিক্ষা শেষ হয় নাই। যশোদা বাবু ও নন্দবাবু একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত। ইহাঁদের পরস্পরের প্রীতি পরস্পরের স্নেহ ও প্রীতি আদর্শস্থানীয়। যশোদালাল বাবুর একমাত্র পুত্র পুলীনকৃষ্ণ, তাহার শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। এখানে এইবংশের কতিপয় খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত হইল।

রাজা শ্রীনাথরায় বাহাদুর।

রাজা শ্রীনাথরায় বাহাদুর ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইনি যে কেবল ভাগ্যকূলও বিক্রমপুরের গৌরব তাহা নহে,সমগ্র বঙ্গদেশেরও একজন কীর্ত্তিমান পুরুষ। এ পর্য্যন্ত রাজাবাহাদুর ব্যতীত অপর কোন বিক্রমপুরবাসীই 'রাজা' এই সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন নাই। ইহাও কমগৌরবের কথা নহে।

বাঙ্গালী চাকুরী-প্রিয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই চাকুরী করিতে ভালবাসে, একটু' ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে কেহই বড় একটা অগ্রসর হইতে চাহেন না, যদিই বা হন, তাহা হইলে দু'এক বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চাকুরী করিয়াই কায়ক্লেশে জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ভাগ্যকূলের কুণ্ডুপরিবার কেবলমাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্য দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহাঁদের মত অভিজ্ঞ পরিবার বাঙ্গালা দেশে আর নাই বলিলেই চলে।

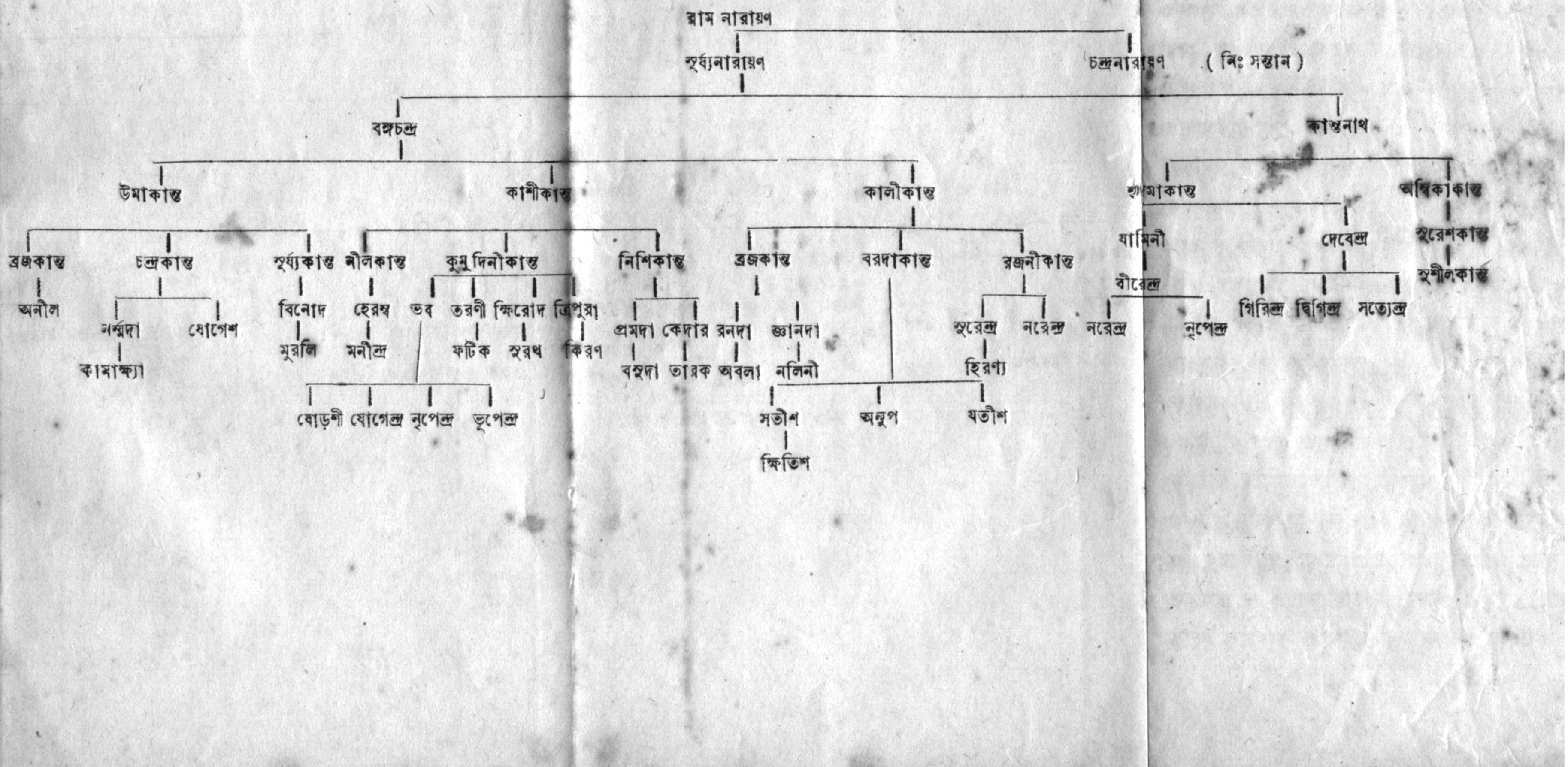
রাজা শ্রীনাথ বাহাদুর বাঙ্গলা ১২৪৮ সনে বিক্রমপুরস্থ ভাগ্যকূল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ইহার আরও কয়েকজন ভাই ভগ্নী জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কাল-গ্রাসে নিপতিত হওয়ায় ইনি পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। সন্তান সন্ততির মৃত্যুর পর তিনিও তাঁহার এক ভগ্নী মাত্র জীবিত ছিলেন। রায় জানকীনাথ ও সীতানাথ রায়বাহাদুর বহু পরে জন্ম-গ্রহণ করেন।

শৈশবে পিতা প্রেমচাঁদের সহিত ইনি নবদ্বীপ ধামে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে গমন করেন এবং সেখানেই কেবলমাত্র সপ্তবর্ষ বয়সে ইঁহার হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ হয়।

সেখান হইতে দেশে আসিয়া সেকালের রীতি-অনুযায়ী গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়া এবং টোলে থাকিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। ইঁহাদের পারিবারিক নিয়মানুযায়ী কেবল মাত্র একাদশবর্ষ বয়সে ইহার শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ঢাকা ইংরেজীবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ অঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ এলে

সাবিক না জানিবা ইতি সন ইং ১৭৮০ সাল তারিখ ২৪শে জুন সন ১১৮৭ সাল তারিখ আষাঢ় (বঃ মোহর কোম্পানি ও দস্তখত ইংরেজী)

বংশ-পত্রিকা।



হইয়া পড়ার আর পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পিতার অনুমত্যানুযায়ী বিষয়কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার হৃদয় দয়াপ্রবণ, সে সময়ে জল খাইবার জন্য সামান্য পয়সা পাইতেন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থ দিয়া দীন, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে দান করিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন।

তাঁহার পিতৃদেব প্রেমচাঁদ রায় গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া ঢাকায় নীত হইলে তৎকালীন ঢাকার সিভিলসার্জ্জন সিম্‌শন্ সাহেবের চিকিৎসাধীনে রহিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব চিকিৎসা-নৈপুণ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগমুক্ত হন। তিনি রোগমুক্ত হইলে রাজাবাহাদুর ঢাকাতে এক বিরাট মহোৎসব করেন, উহাতে আখরাইধারী বৈষ্ণবদিগের প্রচুর রূপ ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সংসারে প্রবেশ করিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। ডাক্তার সাহেবের অনুরোধ ক্রমে সে সময়ে ঢাকা পাগলাগারদে প্রায় ২০০।৩০০ পাগলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন এবং তাহাদের তৃপ্তির জন্য ক্রমাগত চারি পাঁচবার বিবিধ আমোদ-প্রমোদের ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি বঙ্গদেশের বিবিধ দেশ-হিতজনক অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ঢাকাতে যখন 'Economical Museum স্থাপিত হয়, সে সময় তদানিন্তন Magistrate, Lyall সাহেব তাঁহাকে উহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। রাজাবাহাদুর উহাতে দেশজাত বিবিধ দ্রব্য ও প্রায় ৬৫০ রকমের ধান্যের নমুনা প্রদর্শন করেন। এ সকল ধান কোন্ সময়ে বপন করিতে হয়, কখন কাটিতে হয়, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ ও রিপোর্ট লিখিত ছিল এতদ্ব্যতীত নানাবৃক্ষের

ছাল এবং গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যাদি উপহার দান করেন। তাঁহার এ বিষয়ে এতাদৃশ অনুরাগ ও সংগ্রহ দর্শনে গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাহার নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করেন।

সুবিখ্যাত পাদ্রী লং সাহেব যখন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ঢাকা আগমন করেন, সে সময়ে রাজাবাহাদুর গভর্ণমেণ্টের এই সাধু উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিজ বাড়ীতে যে সকল সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল সে সকল এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন এবং এই মহৎকার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা অন্যান্য সরিকগণের সহিত একতায় এককালে প্রদান করেন। তদবধি যখনই সংস্কৃত গ্রন্থাদির সূচী বিলাতে প্রস্তুত হয় তাঁহার এক এক খণ্ড রাজাবাহাদুরকে উপহৃত হইয়া থাকে।

দানশীলতা ইঁহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রকৃতি। উড়িষ্যায় যখন প্রথম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে সময়ে রায় পরিবার কলিকাতা ও দেশে অন্নসত্র খুলিয়া প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার লোকের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীরও গরীব দুঃখীর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন, পিতা প্রেমচাঁদ সর্ব্বাগ্রে কলিকাতাতে ইহার অনুষ্ঠান করেন, পরে রাজাবাহাদুর তাঁহার অনুমতিক্রমে সরিকানগণের সহিত দেশে উহা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের বিবরণ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, গ্রামের দীন, দরিদ্র অধিবাসীদিগকে জন প্রতি প্রতিদিন অর্দ্ধসের পরিমিত তণ্ডুল বিতরিত হইত, আর প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্রাদিও প্রদত্ত হইত। আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজাবাহাদুর নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর যতবার দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ততবারই তিনি সরিকানগণের সহিত মিলিত হইয়া অন্নসত্র খুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

তিনি নিজে চাউল খরিদ করিয়া অল্পমূল্যে ভদ্র-সমাজে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে রাজাবাহাদুরের চরিত্র-মাধুর্য্য মধুর ব্যবহারও দানশীলতার কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে; তদবধি যে কোন দেশহিতকর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে তিনি সে সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়া নচেৎ অর্থ-সাহায্য দ্বারা উহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার এ সমুদয় মহৎগুণ দীর্ঘকাল সদাশয় গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাত রহিল না। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের স্বর্গীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন, সে সময়ে certificate of honour প্রাপ্ত হন। উহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বদান্যতা, সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বিধান Economical museum এর সভ্য রূপে বহুবিধ দ্রব্যাদির উপহার প্রদান, সর্ব্বোপরি তিনি যে অত্যন্ত উদারপ্রকৃতি ও দানশীল মহাত্মা তাহারও বিশেষরূপে উল্লেখ ছিল।

সমাজ-সংস্কার, সমাজের উন্নতিবিধান, সামাজিক-কুপ্রথা নিবারণ বিষয়ে ও তিনি যত্নশীল। সামাজিক যে কোন ব্যাক্তি সমাজের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে, তিনি অমনি নিজ ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াও নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে তাহাদিগকে সে সকলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় মহানুভবতা এবং চরিত্রের ঔদার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

ঢাকা "সারস্বত সমাজ" রাজাবাহুরের মস্তিষ্ক-প্রসূত জীবনের একটী অক্ষয় অমর কীর্ত্তি স্তম্ভ। তাঁহার কৃত সমুদয় শুভানুষ্ঠানের কথা লোকে বিস্মৃত হইতে পারে কিন্তু এই অবদানের কথা কেহ ভুলিবে না।

আমরা এখানে সারস্বত সমাজের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে পাঠকবর্গ অনেক নূতন তথ্য অবগত হইতে

পারিবেন। রাজাবাহাদুর প্রথমে সমাজসম্পর্কে একটী scheme গঠন করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় রায়সাহেব দীননাথ সেন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করেন, রায়সাহেব উহাতে ব্যায়বাহুল্য দেখিতে পাইয়া, উহার ব্যায় লাঘব করিয়া সর্ব্ব প্রথমে বার্ষিক মং ৬০০৲ ছয়শত টাকা ব্যায় কার্য্যারম্ভের প্রস্তাব করেন। পরে ফলাফল দেখিয়া অধিক অর্থব্যায় করা যাইবে তাঁহার এই মন্তব্য ন্যায়—সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় রাজাবাহাদুর তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা প্রথমে টোলের সংস্কৃত অধ্যয়নশীল ছাত্রবর্গের বার্ষিক পরীক্ষা-গ্রহণের নিমিত্ত Body of sanskrit examination scheme নামে অভিহিত হইয়া, পরে উহা রায় অভয়াচরণ দাসবাহাদুরের প্রস্তাবানুযায়ী 'সারস্বতসমাজ' নামে অভিহিত হইল।

উহা তদানীন্তন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার রায় অভয়াচরণ দাস বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত কালীচরণ তর্কালঙ্কার, অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কালীকান্ত শিরোমণি প্রভৃতির নিকট প্রস্তাব করায় তাঁহারাও ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনিও উহার সমর্থন করিয়া ভাওয়ালের রাজাবাহাদুরের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় সমাজের নেতা রাজাবাহাদুরের এই সাধু উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সাধারণে মত বিরোধ উপস্থিত করেন, তাহারা সাধারণকে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে রায় পরিবার ব্রাহ্মণ-প্রধান বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজের উপর নিজেদের প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্তই এই এক কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে এই অসার মন্তব্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তাহারি ফলে দেশের সর্ব্বত্র এক

গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এমনকি প্রথম সভাধিবেশনের দিনে যাহাতে পণ্ডিতবর্গ সভাস্থানে উপস্থিত হইতে না পারেন তজ্জন্য বিপক্ষীয়েরা নানা স্থানে লাঠিয়াল পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, রাজাবাহাদুর পূর্ব্বে ইহার একটু আভাষ জানিতে পারিয়া পুলিসসাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে তাহা জ্ঞাত করেন, তাহাতে আর কোনও উপদ্রব হইতে পারে নাই। সভার আহ্বানকারী ও পৃষ্ঠপোষক রাজাবাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র, সারদাচরণ ন্যায়রত্ন, অদ্বৈতন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত সম্মিলিত হইয়া সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। অতঃপর সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাহারা এক সময়ে বিপক্ষ ছিলেন তাহারাও সভার ক্রমোন্নতি এবং সার্ব্বভৌমিক প্রীতি ও মহত্ত্বে পরে ভাওয়ালের প্রখ্যাতনামা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ও এ সময়ে আনন্দের সহিত এই সভায় যোগদান করেন ও অর্থসাহায্য করিতে থাকেন। গভর্ণমেণ্ট ভাগ্যকুল রায় পরিবারের এই মহৎ কার্য্যের জন্য গেজেটে ধন্যবাদ ঘোষণা করেন। প্রথম হইতেই বার্ষিক পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি রীতি হয় যে ঢাকায় যিনি যখন কমিশনার সাহেবের সহকারী (P.A.C.) হইবেন, তিনিই সভার সহকারী সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিবেন। তদবধি এ পর্য্যন্ত রায় অভয়াচরণ দাস বাহাদুর, রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর, মহিমচন্দ্র ঘোষ, রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,অন্নদাচরণ গুপ্ত বাহাদুর এপর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর সভার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমনকি রাত্রি ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া বিবিধ বিষয়ের পরামর্শাদি করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের সময়ে নবগঠিত নিয়মাবলী হয় এবং মান্যবর স্যাথান সাহেব ও

রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের চেষ্টা যত্নে সারস্বত সমাজের বার্ষিক ২৪০৲ টাকা সাহায্য গভর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর হইয়াছে।

সেই সময় হইতে সারস্বত সমাজের কার্য্য, নির্ব্বিঘ্নে ও বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত চলিয়া আসিতেছে। সমাজের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য প্রখ্যাতনামা ভূম্যধিকারীবর্গ মহারাজ সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মহামনীষিগণ সকলেই সমাজের সাহায্যার্থ অর্থ ও বিস্তর স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক—সমাজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বার্ষিক ছয়শত টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ক্রমোন্নতি ও ব্যায়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকূল রায় পরিবার বার্ষিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা হইতে ৫০০০৲ পাঁচহাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

"সারস্বতসমাজের" কল্যাণের জন্য এপর্য্যন্ত তাঁহারা বহু টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দানশীলতা ধনীমাত্রেরই আদর্শ স্থানীয়।

পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বরাবরই সবিশেষ আগ্রহ ও যত্ন আছে। ভাগ্যকূলের নিকটবর্ত্তী দোগাছী গ্রামে যে (Shooting Star) পতিত হয়, সে সময়ে বিনা মেঘে পুনঃ পুনঃ কামানের ন্যায় ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল, কোনও অলৌকিক কাণ্ড ঘটিতেছে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি এবং শঙ্খ ঢাক বাজাইয়া চারিদিকে একটা ভীতি-বিহ্বল ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। Shooting Star এর বহু খণ্ড প্রস্তর উক্ত দোগাছি-গ্রামে নিপতিত হয়, রাজাবাহাদুর ঐ সকল প্রস্তর খণ্ড হইতে কয়েক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া উহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া Metereological Societyর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত সভার Director বাহাদুর রাজাবাহাদুরের প্রেরিত প্রস্তরের ইতিহাস পাঠাইয়া পত্রিকা

তাঁহার এই সকল বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগের নিমিত্ত বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ শিক্ষাসমিতি (Education Committee, Economical Museum Committe, Municipal Commitee র) সভ্য এবং তৎপরে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কমিটীতে বহুকাল কার্য্য করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট প্রত্যেক কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করায়, তিনি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক ভাগ্যকুল Independent Benchএ অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে ঢাকা মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানেরও তিনি Honorary Magistrate ছিলেন। বিচারকার্য্যে তিনি অসাধারণ আইনাভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন এজন্য ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া Roadcessএর হিসাব পরিদর্শনের কার্য্যভার, পঞ্চাশ টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত যাহাদিগকে Income tax দিতে হইত তাহাদের assesment এর আপীল এর ভার পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিচারের ভার মাত্র অল্প কয়েকজন লোকের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এ সকল কার্য্য তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া যে সকল বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, সে সমুদয়ই আপীল এ বহাল রহিয়াছে, মাত্র দুইটীর দণ্ড হ্রাসের আদেশ আসিয়াছিল। তিনি কাহাকেও শারীরিক দণ্ড বিধান করিতেন না। এতকাল Honorary Magistrate এর পদে নিযুক্ত ছিলেন, কাহারও প্রতি কয়েদের হুকুম দেন নাই, স্থল বিশেষে কম বেশী পরিমাণে অর্থ দণ্ড করিয়াই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। এপ্রসঙ্গে তদানীন্তন ঢাকার খ্যাতনামা ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যানকিন (Jankin) সাহেবের সহিত তাঁর যে কথোপকথন হইয়াছে তাহা বস্তুতঃই কৌতূহলোদ্দীপক।



রাজা শ্রীনাথ রায়বাহাদুর।

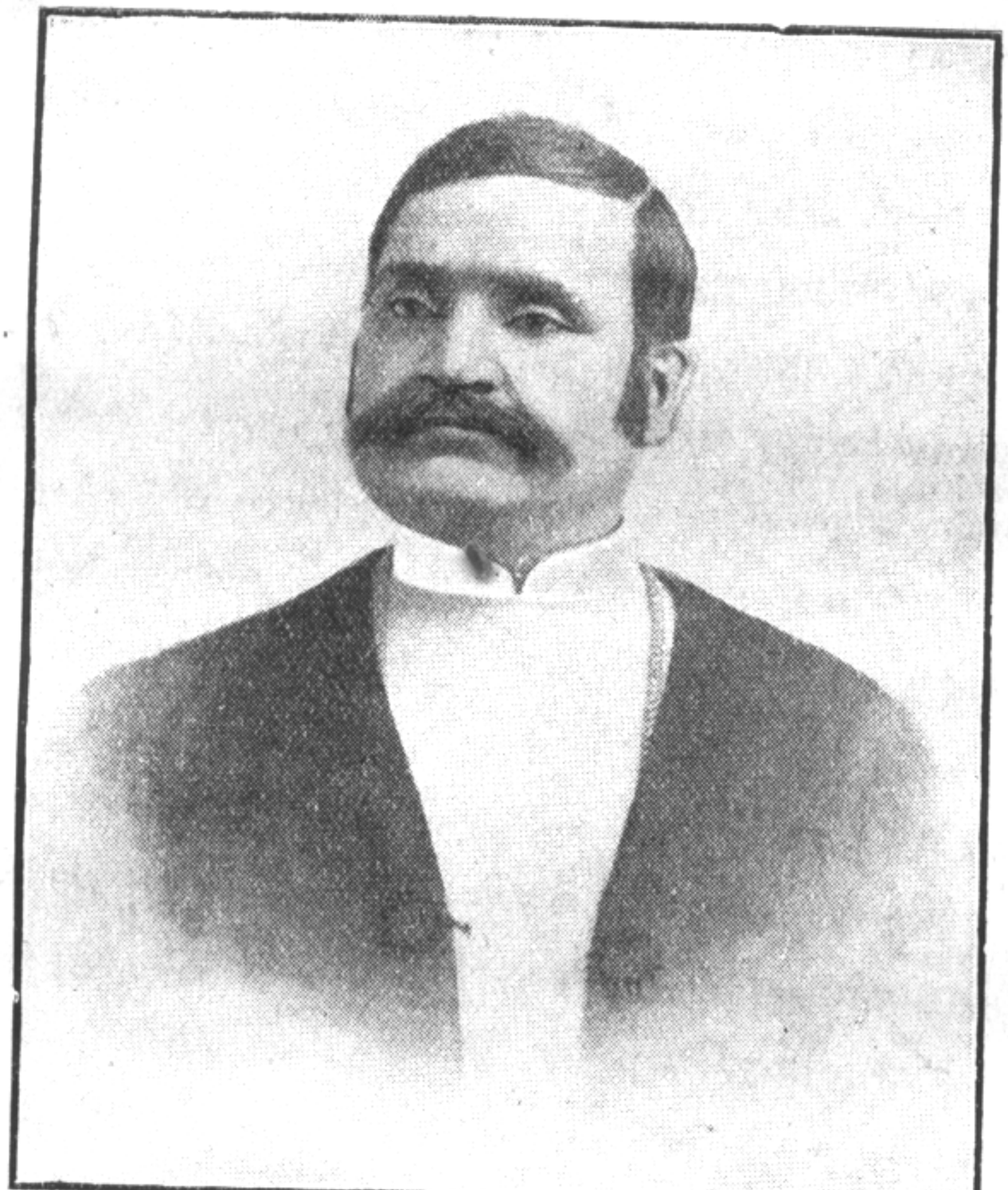
বিচারের ভার গ্রহণ হইতে এপর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও কয়েদের হুকুম না দেওয়ায় জ্যানকিন্ সাহেব অনুযোগ দিয়া বলিলেন "আপনি যে সকল লোকের কয়েদ হইতে পারে তাহাদিগকেও কয়েদের হুকুম না দিয়া কেবল অর্থ দণ্ড কেন করেন? ইহাতে বুঝা যাইতেছে আপনি দেশের লোকদের খাতির করেন? আমি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট Report করিব। তাহাতে রাজাবাহাদুর বলিয়াছিলেন "এ সম্বন্ধে Prejudiceই বলুন, আর Principle বলুন আমার বক্তব্য এই যে মনুষ্যমাত্রেরই বিচারের ভুল হইতে পারে। সন্দেহের ফল আসামীর ভোগ করা উচিত। আমরা বেতনভোগী নহি, মাত্র পুণ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ রাজসেবার জন্য এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি। কাহারও প্রতি অন্যায় রূপ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তব্য-চ্যুত হওয়া আমার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম শারীরিক শাস্তি বিধান করিলে, সে পাপ আমাকে ভুগিতে হইবে। বিশেষ নানারূপ গুরুতর অপরাধের মূল হেতু অর্থ—অর্থই সমুদয় অশান্তি ও বিপদের মূল কারণ। অতএব শারীরিক দণ্ড বিধান অপেক্ষা আমি আর্থিক দণ্ডবিধানই অধিকতর সঙ্গত মনে করি, আমার মনের ভাব এই যে "শত শত দোষী ব্যক্তি খালাস পা'ক একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিও যেন দণ্ড না পায়। Penal code এর মূল উদ্দেশ্য ও তাহাই। যদি আমার কার্য্যে গভর্মেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি পদত্যাগ করিতে সম্মত আছি। সাহেব একথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন "না— না- তাহা করিতে হইবে না। আমি আপনার মন বুঝিলাম। আপনি আপনার যেরূপ বিশ্বাস তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।'

ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য করিতে যাইয়া তাঁহার অনেকের নিকট বিরক্তিভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি কোনরূপে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হন নাই। ওয়েষ্টমেকট সাহেব যখন ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ঢাকার বকলেশ্বর বাঁধের পশ্চিম

প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত কোন নৌকা নঙ্গর করিতে পারিবে না, আরোহীগণকে নামাইয়া দিয়াই নৌকা অন্যত্র লইয়া যাইতে হইবে, এইরূপ Bye-law করিবার প্রস্তাব করেন। অনেক সভ্যই সাহেবের মত সমর্থন করে। কিন্তু রাজাবাহাদুর উহার প্রতিবাদ করেন এবং তিনটী ঘাটে নৌকা লাগাইবার এবং মালামাল তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া একটী Amendment প্রস্তুত করেন। উহা সভাস্থলে উত্থাপিত হইবার সময় কোন কোন সভ্যের পরামর্শে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দীর্ঘকাল রাজাবাহাদুর সভায় অনুপস্থিত বলিয়া Municipal সভ্যের Board হইতে তাঁহার নাম Withdraw করিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সভার Secretary মহাশয় উঠিয়া বলিলেন "রাজা বাহাদুর বিদায়ের প্রার্থী হইয়া আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ভ্রমবশতঃ তাহা দাখিল করি নাই, অতএব এই ত্রুটি রাজাবাহাদুরের নহে আমার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি Municipal Secretaryর নিকট হইতে রিপোর্ট লইয়া গভর্মেণ্টের নিকট রাজাবাহাদুরের বিরুদ্ধে পেশ করিলেন। Secretaryর Reportএ লিখিত ছিল যে তিনি বড় useful member, বৎসর ৩০০০৲ হইতে ৫০০০৲ assesment ও অন্যান্য তদন্ত করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য Member দের assesment এর appeal দুই একটী Memberএর সহিত একত্র বসিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি করেন।

শীঘ্রই Magistrate সাহেবের রিপোর্টের উদ্ধতন আফিস হইতে মন্তব্য আসিল যে "I am directed by his Honour the Lt, Governor that as he (Raja Bahadoor) is very useful member to the Committee, his services should be continued."

ঢাকার হাসপাতালে সংলগ্ন যে চক্ষুরোগীদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে



রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর।

তাহা রাজাবাহাদুরের সংস্থাপিত। রাজাবাহাদুরের একমাত্র পুত্রের নাম কুমার প্রমথনাথ রায়, ইঁহার ব্যায়ে, মুন্সীগঞ্জে একটী ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে।

যুবক বয়সেও রাজাবাহাদুরের দেশপ্রীতি ও সদাশয়তা প্রশংসনীয়। যদিও মুন্সীগঞ্জের জলের কল ও ক্লাব ব্যতীত তাঁহাদের অর্থব্যয়ে বিক্রমপুরের অন্য কোন হিতজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর—বিষয় কার্য্যে সুনিপুণ, এই পরিবারের বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে তাঁহার পরিশ্রম, চেষ্টা যত্ন ও ব্যবসায় বুদ্ধি প্রশংসনীয়। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র ব্যবসায় বুদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিগত ১৩২২ সনের ১১ই পৌষ তারিখে মুন্সীগঞ্জের যে 'বিক্রমপুর মহা সম্মিলনের, অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বিক্রমপুরের কল্যাণজনক বহু বিষয়ের সন্নিবেশ ছিল। মুন্সীগঞ্জের জলের কল প্রতিষ্ঠা রাজাবাহাদুর জানকী বাবু ও মহাশয় সীতানাথ রায় বাহাদুরের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর বি, এল—ইনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি। বড়লাট সাহেবের ব্যাবস্থাপক সভায় দুইবার সভ্য মনোনীত হইয়া দেশের বহু কল্যাণজনক কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়।

হরেন্দ্র বাবু তেজস্বী, নির্ভীক ও উদারচেতা ব্যাক্তি। শিক্ষার নিমিত্ত দানে ইনি মুক্তহস্ত। ভাগ্যকুলের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ভার বহন করিয়া ইনি উক্ত বিদ্যালয়বাহক উচ্চাঙ্গের বিদ্যা মন্দিরে পরিণত



শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়।

করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের **"হরেন্দ্রলাল কলেজ"** ইঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। হরেন্দ্র বাবু ঐ কলেজটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বহু অর্থব্যায় করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! যেরূপে হউক পূর্ব্ববঙ্গ-বাসীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির গোলযোগে পড়িয়া কলেজটির মুকুলেই বিলয় প্রাপ্তি হয়। ইহা যে কতদূর ক্ষতির কারণ হইয়াছে; তাহা বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরবাসী মাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন। ইঁহার সদাশয়তা ও মহানুভবতা দৃষ্টে সরকার বাহাদুর 'কৈসোর-ই-হিণ্ড গোল্ড মডেল' উপহার প্রদান করিয়াছেন। হরেন্দ্র বাবু অমায়িক ও সামাজিক লোক।

ভাগ্যকূল কুণ্ডু পরিবার বিক্রমপুরের গৌরব। ধনবলে বঙ্গদেশে ইহারা শীর্ষস্থানীয়। দুঃখের বিষয় ইঁহারা তাঁহাদের অর্থের পরিমাণানুযায়ী মুন্সীগঞ্জে জলের কল ব্যাতিরেকে বিক্রমপুরের উন্নতি কল্পে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য্য করেন নাই। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে তাঁহারা যদি দেশে কলেজ স্থাপন করেন, তাহা হইলে দরিদ্র দেশের লোকের পক্ষে শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রাম্যবিবরণ—ষোলঘর।

ষোলঘর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটি অধিক প্রচলিত এবং উভয় বিবরণেই স্থাপয়িতার নাম একরূপ। একটি প্রবাদ এই যে ষোলঘরের সুবিখ্যাত ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ বাণীদাস ঘোষবিশ্বাস ও চণ্ডীদাস ঘোষ বিশ্বাস নামক ভ্রাতৃদ্বয়ই এই গ্রামের স্থাপয়িতা। বর্ত্তমান জীবিত বংশধরগণের ঊর্দ্ধতন ছয়পুরুষ পূর্ব্বে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস যশোহর জিলায় চিড়নীয়া গ্রামে ছিল। বাণীদাস ও চণ্ডীদাস নবাব সরকারে সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতেন।* একবার ইহারা কোনও বিদ্রোহদমনার্থ পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হন। গমনকালে ষোলঘরে একদিনের জন্য ইহারা সেনানিবাস স্থাপন করেন। ষোলঘর তখন আড়িয়লবিল নামক নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত বিলের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যসমাকীর্ণ কতিপয় উচ্চভূমি মাত্র ছিল। এই স্থানে সৈন্যগণ বরাহাদি শীকার করিয়া মহানন্দে একদিন কাটায়। চতুর্দ্দিকেই নিসর্গশোভা দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিমোহিত হন এবং বিদ্রোহদমন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া পুরস্কারস্বরূপ সরকার হইতে স্থানটুকু চাহিয়া লন। চিড়নীয়াতে পরিবারবৃদ্ধির দরুণ তাঁহাদের তখন স্থানাভাব হইতেছিল। অবিলম্বে ভ্রাতৃদ্বয় সপরিবারে ক্ষৌরকার, ধোপা, মালাকর ইত্যাদি ষোলপ্রকার জাতিসহ ষোলঘরে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। ষোলজাতি স্থাপন করাতে গ্রামের নাম ষোলঘর হয়।

নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে বাণীদাস ও চণ্ডীদাস

* এইরূপ পারিবারিক ইতিবৃত্তের কথা আদৌ প্রমাণিক নহে।

এখানে আগমন পূর্ব্বক বাসের জন্য একরাত্রি যোগে ষোলখানা গৃহ নির্ম্মাণ করান এবং তাহা হইতেই গ্রামের নাম ষোলঘর হইয়াছে।

চণ্ডীদাস গ্রামের পশ্চিমাংশে ও বাণীদাস পূর্ব্বাংশে (বর্ত্তমান পাইকরা-পাড়ায়) বসবাস করেন।

বাণীদাস ও চণ্ডীদাস সরকার হইতে বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ষোলঘরের বাসস্থান পশ্চিম ঘোষপাড়ার উত্তরাংশে খালের ধারে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সেখানে বহু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সেতুর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই ইষ্টক সেতু ব্যতীত গ্রামের বহুস্থানে এত বেশী প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় যে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনপ্রকার সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। এই সকল কীর্ত্তিকলাপের চিহ্নাবশেষের সহিত প্রধানতঃ প্রাচীন ঘোষ ও সেন পরিবারের নামই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। অধিকাংশ ভগ্নাবশেষই শুকদেব রায়জী নামক ঘোষ পরিবারের এক বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাপুরুষের নামের সহিত বিজড়িত। গ্রামের অদ্যাপি বয়োবৃদ্ধগণ গৌরবের সহিত এই মহাত্মার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। অনেক প্রবাদ প্রবচন ইহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। ইনি নবাব সরকারে অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য বহু পুরস্কার ও 'রায়জী' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রাসাদোপম ভবনের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। বর্ত্তমান চৌধুরী বাড়ীর বিশাল প্রবেশদ্বারের ভগ্নাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোষপাড়ার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ও 'জোয়ারিয়া পুকুর' এবং বণিকপাড়ার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে খাল পর্য্যন্ত প্রস্থে এই বিশাল ভবন অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি বেষ্টন করিয়া একটি নালার চিহ্ন খালে যাইয়া মিশিয়াছে। 'মুন্সীবাড়ীর' জীর্ণপ্রায় 'ঝিকুটী ঘর' 'বৌ-পুকুরের' লুপ্তপ্রায় সোপান শ্রেণী ও বৈদিক বাড়ীর পশ্চিমস্থিত 'শান-বাঁধা পুকুরের'

সোপানের ভগ্নাবশেষ এই ভবনের অন্তর্গত ছিল। ঝিকুটী ঘরটির স্থাপত্য-কৌশল অভিনব—ঠিক দোচালা ঘরের মত; দেওয়ালের গায় দশ অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, তাহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'শান-বাঁধা পুকুর' সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর কথা এই যে ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান।

সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন সুবিখ্যাত জোড়দিঘী। এত বড় বিশাল দিঘী বিক্রমপুরে খুব কমই আছে। দিঘী দুইটি একেবারে পাশাপাশি খনিত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইলের মত হইবে। মাঝখানে একটি বৃহৎ সোপানের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। এই দিঘী দুইটি খননের ইতিহাস ও খননকর্ত্তা সম্বন্ধে কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। 'সেনবাড়ীর' প্রাচীন অট্টালিকাদিও ষোলঘরের সেনবংশের অতীত গৌরবের পরিচায়ক।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় স্থাপিত বিগ্রহও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিয়া থাকে। 'কাত্যায়ণীবাড়ীর' স্থাপিত বিগ্রহ পিত্তলের দশভূজা মূর্ত্তি বহু পুরাতন। চৌধুরী বাড়ীর পিত্তলের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ সাত কি আট পুরুষ যাবত পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

এই গ্রামে একখানি পুরাতন দলিল আছে তাহা পরগণাতি ৫০৫ সনের। দলিলখানা একখানা বিক্রয়পত্র, তাহাতে 'সমসাবাদের' উল্লেখ আছে। এই সমসাবাদ ষোলঘরেরই একটি পাড়া। অধিবাসিগণ প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। বাণীদাস, চণ্ডীদাস, এবং শুকদেব রায়জী ও সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ছাড়াও গৌরব করিবার আরও অনেকে আছেন। রায়জী সম্বন্ধে একটী প্রবাদ অনেকের মুখেই শুনা যায়। একবার কোনও বিখ্যাত দস্যু রায়জীর ধনগৌরবের কথা শ্রবণ করিয়া লুণ্ঠন মানসে তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। ভয়ে অনেক ধনরত্ন 'বৌ-পুকুরে' নিক্ষিপ্ত হইল। রায়জীর লোকবল কম ছিলনা, কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে শুনিল তিনি

কাহারও সাহায্য লইবেন না, একা দস্যুর সম্মুখীন হইবেন। অনুরোধ উপরোধ বার্থ হইল। নির্দ্ধারিত দিবসে দস্যুগণের আগমন সংবাদ পাইয়া রায়জী অশ্বারোহণে তদভিমুখে ছুটিলেন,—তাঁহার কোষে তরবারী, হস্তে একগাছি ফুলের মালা। দলপতির সম্মুখীন হইয়া তিনি অকস্মাৎ মালাটি তাহার গলে অর্পণ করিয়া 'বন্ধু' বলিয়া তাহাকে গৃহে আমন্ত্রণ করিলেন। দলপতি ইঙ্গিত করিল—এক মুহূর্ত্তে সশস্ত্র দ্বিশতাধিক দস্যুর কোলাহল ও ঝঞ্ঝনা নীরব হইয়া গেল। দলপতি মালা খুলিয়া 'রায়জীর' গলে পরাইয়া দিল এবং বলিল যে রায়জীর জীবিতকালে ও তাঁহার বংশধরগণকে আর কখনও দস্যুদ্বারা অত্যাচারিত হইতে হইবে না। দস্যু তাহার কথা রাখিয়াছিল। রায়জীর নামানুসারে, একটি পাড়া এখনও 'রায়জীনগর' ও সংক্ষেপে 'নগর' নামে কথিত হয়। তাঁহার পুত্র সীতারাম ও সদারামের নামে দুইটী পাড়া সদারামপুর ও সীতারামপুর নামে অভিহিত।

এই গ্রামে অনেক কৃতি ব্যাক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইল।

১। ৺ মুন্সী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।—ইনি প্রথমে সেরেস্তাদার পরে ডেপুটী হন। ইনি ষোলঘরের গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। ইঁহার মাতৃভক্তির বিবরণ শুনিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বরিশালে মহাসমারোহে ১০৮টী স্বর্ণজবা দ্বারা কালীপূজা করেন। ৺ গয়াধামে পাণ্ডাদের গৃহবিবাদ মিটাইয়া লক্ষটাকা পারিতোষিক প্রত্যাখ্যান করেন।

২। ৺ নবীনচন্দ্র ঘোষ।—ইনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ। সামান্য মাহিনায় গভর্ণমেণ্টের কাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ৮০০৲ টাকা বেতনে সব্ জজ্ হন। সে সময়ে ইঁহার মত আইনজ্ঞ বিচক্ষণ বিচারপতি বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। ইঁহার মীমাংসিত কয়েকটি বিখ্যাত মোকদ্দমা প্রিভি-

কাউন্সিল কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া আইনের প্রধান নজীর হইয়া রহিয়াছে। ১২৮৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৩। মুন্সী ফকিরচাঁদ ঘোষ।—পারস্যভাষায় ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

৪। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—ইনি হাইকোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবি বলিয়া সে সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখন সবেমাত্র হাইকোর্ট সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা আশানুরূপ ভাল না হইলেও একেবারে মন্দ নহে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যদিও ইহার শিক্ষিতের (সংখ্যা বর্ত্তমান) কম তবুও এবিষয়ে ইহার স্থান বিক্রমপুরে অতি উচ্চ।

আয়তনে ষোলঘরের স্থান বিক্রমপুরের মধ্যে বোধ হয় বজ্রযোগিনী ও হাঁসাড়ার পরেই। ইহার বিস্তৃতি উত্তর দক্ষিণে ২॥ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে (উমপাড়া হইতে সমসাবাদ) প্রায় ৩॥ কি ৪ মাইল। ষোলঘরের লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০০।

এই গ্রামের স্থাপিত বিগ্রহ ও পূজাস্থানের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কাত্যায়নী। ৺তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। পিত্তলের দশভূজা মূর্ত্তি, বহু পুরাতন।

২। কৃষ্ণ, বলরাম ও গৌরাঙ্গ। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ আম্বলীর বাড়ীতে স্থাপিত। নিম্বকাষ্ঠের সুন্দর মূর্ত্তিত্রয়।

৩। কালী। সার চন্দ্রমাধঘোষ মহোদয়ের স্থাপিত। তাঁহার বাড়ীর উত্তর দিকে অবস্থিত।

৪। শালগ্রাম ও শ্রীধর বিগ্রহ। মুন্সীবাড়ী, উত্তর মুন্সীবাড়ী, দারোগাবাড়ী, সেনবাড়ী, কর্ম্মকারবাড়ী, পুরোহিতবাড়ী, শ্রীযুক্ত

শরৎচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বাড়ী, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী, চৌধুরী বাড়ী এবং আরও কয়েক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত।

৫। ভৈরববাড়ী। বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ, উচ্চ ভূমিতে জন্মিয়াছে। প্রায়ই পূজা ও বলি হইয়া থাকে।

৬। 'বুড়া ঠাকুরাণীর তলা'। একটি প্রকাণ্ড হিজল গাছ, প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির দিন বৃক্ষতলে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। মেলাতে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরাই আসিয়া থাকে। বৃক্ষতলে কবুতর উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ষোলঘর গ্রামে প্রায় সকলপ্রকার জাতিই বসবাস করিয়া থাকে।

গ্রামে একটি সব্ পোষ্টাফিস্ আছে, টেলীগ্রাফ আফিস নাই।

গ্রামের একটি অশেষ কল্যাণকর কার্য্য পশ্চিম ঘোষপাড়ার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি কীর্ত্তি। ইনি তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মরণার্থ একটি পাকা শ্মশান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ষোলঘরের পাকা শ্মশান খুব উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত এবং সেখানে শবযাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য একটি টিনের ঘর ও কাষ্ঠাসন আছে।

উৎসাহী যুবকগণের চেষ্টায় গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার ও একটি ফুট্‌বল্ ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে সাধারণ পাঠাগারটি লুপ্ত প্রায়। উপযুক্ত মাঠের অভাবে ক্লাববটিও অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছে। গ্রামের কর্ম্মকারবাড়ী হইতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন ক্লাবে খেলার জন্য একটি প্রকাণ্ড রূপার শিল্ড প্রদত্ত হইয়াছে।

ষোলঘরে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল, একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় এবং পাঠশালা ও অনেকগুলি পাঠশালা এবং বালিকাবিদ্যালয় আছে।

উচ্চইংরেজী স্কুলটির অবস্থা ভাল নয়। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত স্কুলটি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সংস্রবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

বসু চৌধুরী হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে স্কুলটি স্থাপিত হয়, এবং তিনিই সহস্র প্রকার অসুবিধা ও বাধার মধ্যদিয়া স্কুলটিকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। এই গ্রামের বহুজনহিত-কর কার্য্যে ইনি অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইনি এই গ্রামেরই অধিবাসী ও ভূস্বামী। এই স্কুল স্থাপন কার্য্যে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এল্, এম্, এস্, শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত শশিভূষণ সেন ও শ্রীযুত কুলদাপ্রসন্ন ঘোষ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হওয়া অবধি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারিত হইতেছে। দুইটি সাহায্যুবক বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মৎস্যজীবি, তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক ছেলে স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে।

ষোলঘরে দীঘি পুষ্করিণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহার কারণ এই যে গ্রামটি 'আড়িয়ল বিলের' একাংশে স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং ভূমির উচ্চতা সাধন নিমিত্ত অনেক মৃত্তিকা উত্তোলন করা দরকার হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ পুষ্করিণীই শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তাহাদের পঙ্কোদ্ধার করা হয় নাই।

ষোলঘরের মুসলমানসম্প্রদায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। মুসলমানগণ অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ও নিরক্ষর। কেবলমাত্র 'কাজীগণই' উচ্চশ্রেণীর ও অনেকাংশে শিক্ষিত। তাঁহাদের বেশ একটি অতীত ইতিহাস আছে এবং বংশটিও বহু পুরাতন। এই কাজী বংশের দুইজন দারোগা হইয়াছেন। একটি ছেলে ঢাকা কলেজ হইতে দর্শন শাস্ত্রে 'অনার' সহ বি-এ পাশ করিয়াছেন। ষোলঘর কাজীপাড়ার আম্র দেশবিদেশে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত 'গিলা' আম্র অনেকের মতে 'ল্যাংড়া' হইতেও উৎকৃষ্টতর।

ষোলঘরের শিক্ষিত সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। নিম্নে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হইল :—

১। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এই গ্রামের Grand old man ছিলেন। প্রায় ৯৫ বৎসর, তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। গ্রামের অনেক খুটিনাটি ঘটনা পর্য্যন্ত ইঁহার অমূল্য দিনলিপিতে লিখিত আছে। ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিংহরায়। ইনি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার একটি 'কবির দল' ছিল, ইনি সেজন্য বহু সঙ্গীত ও গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু কিছু লেখা এখনও আছে, তাহা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। কবিত্বমাধুর্য্যে, ছন্দঝঙ্কারে, ভাবলালিত্যে তাহা এতই প্রাণস্পর্শী যে এই অখ্যাতনামা কবি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের স্থান পাইবার যোগ্য।

২। ৺মোক্ষদাকুমার বসু। ইনি আগড়তলার বর্ত্তমান মহারাজের গৃহশিক্ষক ছিলেন। 'ভারতী', 'বঙ্গভাষা' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দিনলিপিগুলি অপরূপ কাব্যমাধুর্য্যে পরম রমণীয়।

৩। শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ। মাসিক সাহিত্যের পাঠকবর্গের নিকট এই অতুল শক্তিমতী লেখিকার নাম সুপরিচিত। ইনি যে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখিকা তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইঁহার গল্প প্রবন্ধগুলি ভাষালালিত্যে ভাবে এবং চিন্তাশীলতায় বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। 'যূথিকা' নামে ইঁহার একখানি গল্পপুস্তক আছে। গল্পরচনায় লেখিকার কৃতিত্ব এই সুন্দর গল্পগুচ্ছেই প্রকাশিত। ইঁহার অনেক কবিতাও নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত

৪। 'শান্তি' ও 'নির্ব্বাণ' রচয়িত্রী। এই লেখিকার কাব্য দুখানি অনাড়ম্বর সরলতার জন্য যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আগড়তলা প্রবাসী ৺কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের ও 'চক্র দত্তের' অনুবাদক ৺প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের নাম এবং দু' এক জন নবীন সাহিত্যিকের নাম পরিচয় মধ্যে সুকবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম্ এর নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। পরিমলের কাব্যপরিমলে বর্ত্তমান মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠা সুরভিত।

ষোলঘর গ্রামের আভ্যন্তরীন অবস্থা অতি শোচনীয়। উপযুক্ত পথ ও সেতুর অভাবে গমনাগমন বড়ই অসুবিধাজনক। কয়েকটী কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতেও অসুবিধা দূর হয় নাই। আরও অন্ততঃ দশ বারটি সেতুর দরকার। রাস্তাঘাট এত অল্প ও অসুবিধাজনক, সামান্য বৃষ্টি হইলেই চলাচল একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়ে। গ্রামের শিক্ষিত জনমণ্ডলী প্রায়ই বিদেশে থাকেন, কাজেই দেশের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে। এখানে এ গ্রামবাসী মহাপুরুষ চন্দ্রমাধবের জীবনী প্রদত্ত হইল।

পথঘাট।

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

মানুষের মত মানুষ চলিয়া গেলে দেশ যুড়িয়া একটা হাহাকার পড়িয়া যায়, বঙ্গের উজ্জ্বল কিরীট-মণি, ভারত-গৌরব চন্দ্রমাধব আর এ জগতে নাই। বিক্রমপুরের যে সকল কৃতী সন্তান বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন তন্মধ্যে চন্দ্রমাধব এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া আমাদের যশ ও গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার মৃত্যুতে সে গৌরব চির বিলুপ্ত হইল। চন্দ্রমাধবের অভাব বঙ্গদেশে আর

'১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি নিজ বাস গ্রাম ষোলঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা **রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ** মহাশয়ের সুখ্যাতি সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র শ্রুত হইত, সুদীর্ঘকাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্টিত থাকিয়া নিজ প্রতিভা বলে ইনি গবর্মেণ্টের ও স্বদেশী জনসমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। পল্লীবৃদ্ধগণ এখনও দুর্গাপ্রসাদের নাম গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের প্রায় অর্দ্ধেক জরিপের কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি বিক্রমপুরের সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে নিরত থাকিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। রায় দুর্গাপ্রসাদ বিক্রমপুরের একজন অগ্রণীব্যক্তি ছিলেন। মাননীয় **চন্দ্রমাধব** উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ১৮৫৫ খ্রীঃ সর্ব্ব প্রথমে যখন হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়, তাহার দুই বৎসর পরে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে যাঁহারা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, চন্দ্রমাধব তাঁহাদের অন্যতম। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি নূতন ইউনিভার্সিটি-হইতে উপাধি লাভ করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ সংশ্লিষ্ট আইনক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ অতিশয় প্রশংসার সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন আইনঅধ্যাপক ব্যারিষ্টার মণ্টিরো সাহেব ইঁহার সূক্ষ্ম-বুদ্ধি দেখিয়া বিশেষ স্নেহ করিতেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন, সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছয়মাস যাইতে না যাইতেই সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন, এই কার্য্য ও তাঁহার ন্যায় উৎসাহী যুবকের নিকট বিশেষ ভাল বোধ না হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়া অদম্য উৎসাহের

সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন অতঃপর সদর দেওয়ানী ও সদর নেজামত হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টে ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে হাইকোর্টেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা বলে হাই-কোর্টে ওকালতি করিতে করিতেই প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করেন। বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি যেরূপ সূক্ষ্ম-বুদ্ধি, পদোচিত গাম্ভীর্য্য ও পদোচিত সম্ভ্রম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই গৌরবের বিষয়। হাইকোর্টের ইংরেজ জজেরা ও ইঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। বড় বড় ইংরেজ ব্যারিষ্টারেরা ও ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় সাবধান ও সংযতবাক্ হইতেন। কিছুকাল প্রধানতম বিচারক পদে কার্য্য করিবার পরেই ইনি সার উপাধি প্রাপ্ত হন। সমাজ-সংস্কার বিষয়েও ইনি একজন অগ্রণী ছিলেন, কায়স্থ সভার সভাপতি রূপে চন্দ্রমাধব সামাজিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈষিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইনি পেন্‌সান গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিয়া-ছিলেন তথাপি দেশের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি ছিল। নিজ গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্বীয় বাসগ্রামের নিকটবর্ত্তী অধিবাসীবৃন্দের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সংস্কারের জন্য তাহার একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে বড় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু জীবন-সন্ধ্যায় দেশে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের সূচনা দেখিয়া তিনি গত কংগ্রেসের সময় বঙ্গের দুই দলের মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া প্রকৃত দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে প্রিয় জন্মভূমির অকল্যাণ সাধিত

হইবে ইহা তিনি জানিতে পারিয়া নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পরস্পর বিরোধী বাঙ্গালির মনোমালিন্য বিদূরিত করিবার মানসে সমগ্র বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণকে তাঁহার আলয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অশীতিবর্ষ বয়সে তাহার দীর্ঘ কর্ম্ম জীবনের সবনিকা পতন হইয়াছে; এই সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনে তিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লইয়া নীরবে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। চরিত্রের এই মহৎ গুণই তাঁহাকে আজ বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে আসন প্রদান করিয়াছে. তিনি সাধারণতঃ কোনও রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন না; কিন্তু মিসেস্ বেসান্তের মুক্তির জন্য টাউনহলে যে বিরাট সভা হয়, সেই সভাতে ইনি স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতে থাকে। সেই অসুস্থতা আর সারিলনা। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল।

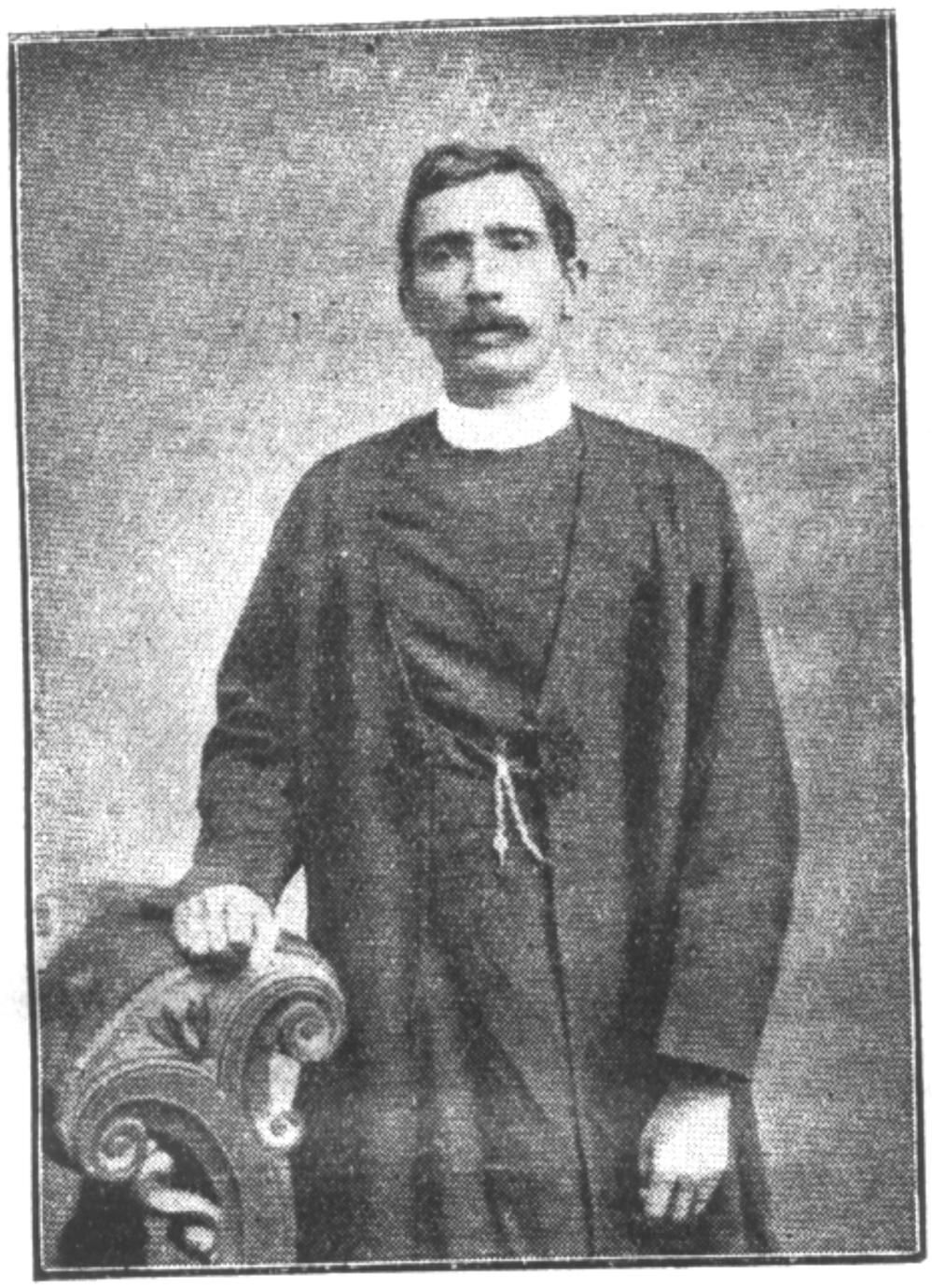
"বিক্রমপুরসম্মিলনীর" সভাপতিরূপে তিনি দেশের হিতজনক বিবিধ অনুষ্ঠানে সদা সর্ব্বদা নানারূপ উপদেশ দান করিয়া সম্মিলনীর পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন। আমরা কলিকাতা থাকিতে সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক রূপে নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রতি নিয়তই তাঁহার নিকট গমন করিয়াছি, তিনি যেরূপ স্নেহের সহিত বিনয়ের সহিত আমাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছেন, নানা বিষয়ের উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন তাহা কখনও এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। অমৃতবাজার যথার্থই লিখিয়াছেন—"Needless to say that the whole of India will

be made up." কলিকাতায় মহাসমারোহে সার চন্দ্রমাধবের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কাঙ্গালী ভোজনে ও দানে তদীয় উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয় ও তদীয় ভ্রাতৃগণ যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতার ন্যায় সহরে রূপার দানসাগর করিয়াছেন এবং দেশবিদেশের প্রায় ৬০০ ছয় শত অধ্যাপককে উপযুক্ত সহচারে বিদায় করিয়া ও দশ হাজারের অধিক কাঙ্গালীকে পরম পরিতোষ সহকারে নিজে উপস্থিত থাকিয়া ভোজন করাইয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইদানীং কলিকাতায় কেহ এইরূপ ব্যয় সপেক্ষ কার্য্য করেন নাই। রায়বাহাদুরের এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পুত্র-পৌত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রমাধব পরলোকে গমন করিয়াছেন, জগদীশ্বর তাঁহার অমর আত্মার চিরশান্তি প্রদান করুন। সার চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও দেশের উন্নতি কল্পে সবিশেষ মনোযোগী রহিয়াছেন, ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির সাহায্যে শিক্ষিত যুবকগণ দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ শিল্প কলা শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছে। এখানে যোগেন্দ্র চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করিলাম।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ,বি, এল।

সার চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আমাদের দেশের একজন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। তিনি শুধু বিক্রমপুরের নহেন বঙ্গদেশের নহেন-ভারত-গৌরব মহাপুরুষ। দেশে বাক্যবীরের অভাব নাই মুখে মুখে দেশোদ্ধার অনেকেই করেন, কিন্তু প্রকৃত ভাবে নিজ স্বার্থ-সুখ জলাঞ্জলি দিয়া, দেশের জন্য—শিক্ষাবিস্তারের জন্য এবং শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা কোটি কোটি নর নারীর ক্ষুধার্ত্ত মুখে দুটী অন্ন তুলিয়া দিবার যিনি সংস্থান



রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর।

করেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মবীর, এরূপ মহামানবের সংখ্যা জগতে অতি অল্প, আমাদের বড় গৌরবের বিষয় যে বিক্রমপুরের যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই মহা মানবের মধ্যে একজন।

ছাত্র-জীবনে তিনি অমানুষিক প্রতিভাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় পরীক্ষাই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে এম, এ, বি, এল উপাধি লাভ করিয়া হাইকোর্টের ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষাকাল হইতেই তিনি দেশহিতকর বিবিধ কার্য্যে আত্ম-শক্তি নিয়োগ করেন। যে 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' আজ মৃত প্রায় একদিন এই 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশের নরনারী জ্ঞানে ধর্ম্মে ও পবিত্রতায় চিরগৌরবান্বিত হইতে পারে, জগতের শ্রেষ্টজাতি সমূহের সমকক্ষ হইতে পারে, সেই পবিত্র দেশ প্রীতি বুকে লইয়া আহিতাগ্নিক ঋষির মত শুভ কল্যাণ-বহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া এই মহানুভব মহাত্মা দেশের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এখানে তাঁহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই সর্ব্ব প্রথম মনোনীত সদস্য (Elected Fellow) এবং পরে সিণ্ডিকেটের মেম্বার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক B. C. S. ডিগ্রী-প্রদত্ত হয় সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশের ছাত্রগণ অধিকাংশ স্থলেই রুগ্ন এবং জীর্ণ। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়, তাহারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন রহিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে একেবারে কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন, এবং অনেকে দরিদ্র পিতামাতার ও

অকালে অনন্ত-পথের যাত্রী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিদ্যাবত্তাও বিচক্ষণতা, দেশের বা সমাজের কোন কল্যাণেই আসে না। যাহাতে আমাদের দেশের যুবকগণ বিদ্যায় ও জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সবল দেহ লইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তঃর্গত সমুদয় বিদ্যালয়ে যাহাতে ব্যায়াম শিক্ষা বাধ্যতা মূলক (Compulsary) হয় সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এখন এই যে সহর ও মফঃস্বলের প্রায়সমুদয় বিদ্যালয়ে ব্যায়ামশিক্ষার জন্য এবং ক্রীড়া-কৌতুকের জন্য অধ্যাপক এবং কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা রায়বাহাদুরের অক্লান্ত উদ্যম ও চেষ্টা যত্নের ফল।

প্রত্যেককার্য্যেই রায় বাহাদুরের নির্ভীক ভাব ও তেজস্বিতা পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনাররূপে তিনি অনেক রাস্তা, ওগলিখুঁজির ও ড্রেণের সংস্কারের জন্য ব্রতী হইয়া সুবিখ্যাত ম্যাকেঞ্জি সাহেবের মতবিরোধিতায়ও সংস্কারকার্য্যে সাফল্য লাভ করেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেব রায়বাহাদুরের অলৌকিক তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে Certificate of Honour প্রদান করেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'সাবাস আটাশ' নামক প্রহসনের কথা সকলেই জানেন। যে ২৮ জন সাহসী, উদারচেতা ও নির্ভীক কমিশনার ম্যাকেঞ্জি (Mackenze Bill) পাশ হইলে কমিশনারের পদ পরিত্যাগ করেন তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়াই এই প্রহসনখানা লিখিত হইয়াছিল। রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই ২৮ জন কমিশনারের মধ্যে অগ্রণী হইয়া সে সময়ে কমিশনারের পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দেশ-প্রীতি ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অতঃপর তিনি এযাবত আর কখনও কমিশনারের পদপ্রার্থী হন নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপেও তিনি দেশহিতজনক বহু কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি যেবার সদস্য পদপ্রার্থী হন, সেইবার কাশীম বাজারের স্বনামধন্য মহারাজা বাহাদুর, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক (S. K. Mullik) মহাশয়, রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এম্ এ বি এল এবং নসীপুরের মহারাজা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলে ভোটে পরাজিত হন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় দেশের কল্যাণজনক বহু কার্য্যের প্রারম্ভ-সূচনা করিয়াছিলেন, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল দুই একটীর বিষয় উল্লেখ করিলাম। (১) বাৎসরিক বজেট ব্যাবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়া যথারীতি সমালোচনার পদ্ধতির প্রচলন (২) এবং রেলওয়েসেস্ তাঁহারি প্রযত্নে প্রচলিত হয় নাই।

স্বয়ং শ্রীশ্রীমান্ ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যোগেন্দ্রবাবুকে দিল্লীনগরীতে যে দরবার হইয়াছিল তাহাতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহার জীবনের গৌরব—চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি কলিকাতা মহানগরীতে 'শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতি (The Assoiation for the Advancement of scientific and Industrial Education of Indians) স্থাপন। ভারতবর্ষের আর কোথায়ও এইরূপ সমিতি নাই। কেবলমাত্র ওকালতী ও চাকরীদ্বারা দেশের উন্নতি হইতে পারে না, যাহাতে দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিয়া আসিতে পারেন তদুদ্দেশে বিগত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে রায়বাহাদুরের একমাত্র সাধনা উদ্যোগ চেষ্টা, যত্নে এই সভা সংস্থাপিত হয়। সেই সভায় আমাদের দেশের বহু গণ্যমান্য এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ও বহু ইংরেজ রাজপুরুষ যোগদান করিয়াছিলেন, বঙ্গ,

জন-বিবরণ—আদম সুমারী মতে এই গ্রামের লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত—২১৭২। চাকুরী উপলক্ষে এই গ্রামের বহুলোক পরিবার সহ বিদেশে বাস করেন; আদমসুমারীতে ইহাদিগকে গণনা করা হয় নাই তজ্জন্য লোকসংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত লোকসংখ্যা অনুমানে ৩৫০০।

এই গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূঁইমালী প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমানগণের বাস। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তৎপরে ব্রাহ্মণ ও বারুইর সংখ্যা প্রায় একরূপ। কায়স্থ এবং শূদ্রের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম। অন্যান্য জাতির সংখ্যা অতিশয় সামান্য। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ঘোষাল, চাটার্জি, বাড়ীও তালুকদারবংশ অতি প্রাচীন; কায়স্থগণ মধ্যে সরকার ও বিশ্বাস বংশই মৌলিক।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রধান অবলম্বন চাকুরী; সামান্য সংখ্যক লোকের জীবনোপায় তেজারতি, তালুকদারী ও মহাজনী। বারুজীবিগণের উপজীবিকা নিজ ব্যবসায়—পাণ ও তরী তরকারী প্রভৃতি বিক্রয় এবং গৃহস্থি। অন্যান্য জাতির কার্য্য নিজ নিজ ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য, সামান্য কারবার, দিন মজুরী প্রভৃতি। কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল নহে। মোটের উপর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বারুজীবিগণের অবস্থাই কিছু উন্নত বলিয়া অনুমিত হয়, অন্যান্যের অবস্থা শোচনীয়।

পল্লী-বিভাগ ও তদ্বিবরণ—আয়তনে বৃহৎ বলিয়া এই গ্রাম নিম্নলিখিত পল্লীসমূহে বিভক্ত। নিম্নে অতি সংক্ষেপে এই সকল পল্লীর বিবরণ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা হইল।

পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর বিগত ১৩০৬ সনে বেতকায় আগমনপূর্ব্বক একটী বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ

করাইয়া তথায় বাস করিতেছেন। সেটেলমেণ্ট কার্য্যে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন এইজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৬ সালে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

তালুকদারপাড়া—তালুকদার উপাধিধারী কতিপয় ব্রাহ্মণ বহুদিন যাবত এই স্থানে বাস করেন বলিয়া লোকে ইহাকে তালুকদারপাড়া বলে।

সিকদারপাড়া—সিকদার উপাধিধারী কতিপয় মুসলমান এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম সিকদারপাড়া।

ঘোষপাড়া—শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই পল্লীতে ঘোষ পদবী-বিশিষ্ট কতিপয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাস করিতেন বলিয়া লোকে ইহাকে ঘোষপাড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উক্ত ঘোষ মহাশয়গণের সময়ে এই পল্লীর অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল; সেই সময়ে অতি সমারোহে পল্লী মধ্যে ১১ বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত ও পূজা উপলক্ষে প্রতি বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ ও ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আদি বাড়ীর ঘোষ মহাশয়গণ সকলেই নিঃসন্তান; তাহাদের বাড়ী পতিত ও পরিত্যক্ত।

এই পল্লীর খ্যাতনামা ব্যক্তি (১) ৺হরিশ্চন্দ্র বসু। ইনি থাকবস্থার ডিপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া বিক্রমপুর ও অন্যান্য স্থানের থাক নক্সা ও থাক সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। (২) শ্রীযুক্ত রায় করুণাদাস বসু বাহাদুর। ইনি ডিঃ ও ছেস্‌ন জজের কার্য্য করিয়া এখন পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন। বিগত ১৯০৬সালে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রায়বাহাদুর বেতকা মৌজার প্রধান ধনী। (৩) শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার। ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির বৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক ১৯০৬ সনে আমেরিকা যুক্তরাজ্য হইতে অতিশয় কৃতিত্বের

সর্ব্বপ্রথম কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তৎপর তিনি কুচবিহার মহারাজের চাকুরী গ্রহণপূর্ব্বক তামাক চাষে Expert অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হইয়া কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে কুচবিহার রাজ্যে কয়েক বৎসর তামাকের চাষ করেন। তাঁহার উৎপাদিত তামাক ৮০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। উক্ত তামাকে অত্যুৎকৃষ্ট চুরট প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। সেই সমস্ত চুরট প্রত্যেকটী ৫।৬ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত।

এতদ্ভিন্ন এই পল্লীতে আরও কতিপয় পরোপকারী এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি বাস করিতেন। তন্মধ্যে ৺কালীহর গুহ ও ৺উমাকান্ত মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৺কালীহর গুহ ইনি কুমিল্লায় মোক্তারী করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেন। দেশীয় বহু উপায়হীন লোকের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান পূর্ব্বক সাহায্য করিয়া ও টাকার সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দয়া এবং পরোপকার সর্ব্বজন বিদিত। বহুদিন হইল এই মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে এখনও গ্রামের লোকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

৺উমাকান্ত মজুমদার—ইনি নোয়াখালী জেলা স্কুল হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঢাকাকলেজে সিনিয়ার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া (Mastership) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুকাল টেঘরিয়া উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টারের কার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে ৩২ বৎসর ২ মাস সহকারী শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পেন্‌সন ভোগ করিয়া ১৩০৯ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি ৪২ বৎসর কাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তাঁহার বহুছাত্র উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অতিশয় সৎস্বভাবান্বিত ও বিদ্বান

বলিয়া সর্ব্বত্র উমাকান্ত "মাষ্টার" নামে পরিচিত ছিলেন। সময় সময় তিনি "সংবাদপ্রভাকর" নামক মাসিক পত্রে বাঙ্গালা পদ্য লিখিতেন। তিনি ভাল পাশী জানিতেন।

মামুদাদপুর—জমিদারী কাগজপত্রে এই পল্লীর নাম জোয়ার মামুদাদপুর বলিয়া লিখিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই পল্লীতে ২০।২৫ ঘর সাধারণ মুসলমান গৃহস্থের বাস।

গোঁসাইপাড়া—গোস্বামী উপাধিধারী কতিপয় ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম গোঁসাইপাড়া।

সরকারপাড়া—বেতকার সরকার মহাশয়গণ এই পল্লীতে বাস করেন বলিয়া লোকে ইহাকে সরকারপাড়া বলে।

মুখুটীপাড়া—৺মহিমচন্দ্র মুখুটী মহাশয় এই পল্লীতে বাস করিতেন বলিয়া লোকে ইহাকে মুখুটীপাড়া বলে। আসাম বগড়ীবাড়ীর জমিদার বাড়ীতে চাকুরী করিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হন। বেতকা কালীবাড়ীর দালান তাঁহার উদ্যোগে প্রস্তুত হয়। তাঁহার বহির্ব্বাটীতে লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে।

গিলাবাড়ী—এই পল্লীর কোন বাড়ীতে একটী গিলা গাছ ছিল। ঐ গিলা লতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বহুস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য লোকে এই পল্লীকে গিলাবাড়ী কহিয়া থাকে।

ঘোষালপাড়া—বেতকার ঘোষাল মহাশয়গণ এই পল্লীতে বাস করেন বলিয়া ইহার নাম ঘোষালপাড়া। ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানাভাব হেতু বর্ত্তমান সময়ে ঘোষাল মহাশয়গণ ভিন্ন ভিন্ন বাড়া নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। অতি পূর্ব্বে এই স্থানে ঘোষাল মহাশয়গণের মাত্র দুই বাড়ী ছিল এখন ক্রমে ৭।৮ বাড়ী হইয়াছে। খিলপাড়া নিবাসী বিখ্যাত ধনী

বাস করিতেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ঘোষাল মহাশয় এই বেতকার ঘোষালবংশসম্ভূত। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত ঘোষাল মহাশয়ের নাম ও উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয়—বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে বিদ্যালয়ের বড়ই অভাব। একটী মধ্যমাকারের উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহার বহির্ব্বাটীতে একটী নিঃ প্রাঃ বালক ও বালিকা বিদ্যালয় এবং শ্রীযুক্ত কালীকুমার সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে তদীয় বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী রায়ের উদ্যোগে একটী ছোট রকমের বালিকাবিদ্যালয়, সর্ব্বসমেত মোট তিনটী প্রাইমেরী বিদ্যালয়।

গ্রন্থকার ও লেখক—এই গ্রামে তিন জন মাত্র গ্রন্থকার আছেন। রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থ (১) সার্ভেও সেটেলমেণ্ট সহচর (২) পরিমিতি (৩) প্রজাস্বত্ব ও তাহার লিখন। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দেব মজুমদার প্রণীত গ্রন্থ (১) মার্কিণ-যাত্রা (তাহার—আমেরিকা গমন বৃত্তান্ত (২) How to improve Tobacco Crops in India শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত "পাইকপাড়া মজুমদার বংশের বিবরণ।"

শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তি—এই গ্রামের শিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতির মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও উচ্চ শিক্ষা একরূপ নাই বলিলেই চলে। তবে বারুজীবিগণ আজ কাল ধীরে ধীরে শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই জাতির মধ্যে ১ জন আই, এ, ২ জন এম্‌ট্রেনস ও ২ জন ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। গ্রামের তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা অতিশয় অল্প। মাত্র ১১টী গ্র্যাজুয়েট, ৩টী আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট।

পশ্চিম ও বেতকা সীমানার পূর্ব্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র খালের ধারে একটী উচ্চস্থানে, বট, অশ্বত্থ, তেতুল প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষ একত্রে বর্দ্ধিত হইয়া অতিশয় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছে। গ্রামের লোকে ইহাকে সুবচনী গাছ ও চতুষ্পার্শ্বের ভূমিকে সুবচনীতলা বলে। প্রতি শনিবারে ও মঙ্গলবারে গ্রাম্য রমণীগণ এইস্থানে একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় মঙ্গলকামনায় দেবতাজ্ঞানে এই সকল বৃক্ষোপরি তৈল ও সিন্দুরাদি বিলেপন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সযত্নে তাম্বুল ও বাতাসা প্রদান করিয়া থাকেন। সময় সময় নব বিবাহিত বর ও কন্যাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া রমণীগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন কচিৎ ২।১ সময় পূজাঅন্তে পাঁঠা বলি প্রদান করিতে ও দেখা গিয়াছে।

বেতকা ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত নামে একব্যক্তি গ্রাম্য লোকের সহায়তায় প্রতিবৎসর চৈত্র-সংক্রান্তি দিবসে সুবচনী তলায় একটী মেলা মিলাইয়া থাকেন। ১৫ বৎসর যাবৎ যথাক্রমে এই স্থানে মেলা বসিতেছে। চড়ক-পূজার পর বৈকাল বেলায় এই মেলা আরম্ভ হয়। এই মেলায় ইংরেজী-বাদ্য প্রভৃতি বাজাইয়া নানারূপ সংও মিছিল বাহির করিয়া দর্শকগণের আনন্দবর্দ্ধন করা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রতি বৎসর সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। গ্রামবাসিগণ এই মেলা হইতে বিবিধ প্রকারের মাল মসল্লা, মিঠাই, তরী-তরকারী, পুতুল, খেলনা, মনোহারী দ্রব্য, হাড়িপাতিল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে।

ইউনিয়ান কমিটী—বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের আদেশে অন্যান্য স্থানের ন্যায় বেতকা গ্রামে ও নয় জন মেম্বর সহযোগে একটা ইউনিয়ান কমিটী গঠিত হইয়াছে। মুন্সিগঞ্জের লোকেলবোর্ড বেতকার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় এতদিন রাস্তাঘাট একরূপ কিছুই ছিলনা। ইউনিয়ান

গ্রামে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস আছে।

হাট বাজার—এইগ্রামে কোন হাট বাজার নাই। ১½।২ মাইল দূরবর্ত্তী আবদুল্লাপুর অথবা সোনারঙ্গের বাজার এবং ২-৩ মাইল দূরবর্ত্তী মিরকাদিম, তালতলা অথবা টঙ্গিবাড়ীর হাট করিতে হয়।

কীর্ত্তি মঠমন্দির ইত্যাদি—উল্লেখযোগ্য কোন মঠ মন্দির ইত্যাদি এই স্থানে নাই। ৺গুরুচরণ বসু ও ৺প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের চিতার উপরে তদীয় পুত্র দুইটী ছোট আকারের মন্দির এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তদীয় মাতা ৺ভগবতী দেবীর শ্মশানোপরি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেতকা নিবাসী ৺রামকান্ত বাড়রী ও শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয় পথশ্রান্ত আতপ-তপ্ত পথিকগণের তৃষ্ণা ক্লেশ নিবারণার্থে খৈয়ার চক নামক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে দুইটী দীঘি খনন করাইয়া দিয়াছেন। উহার একটী রামকান্তের ও অপরটি মল্লিকেরদীঘি নামে খ্যাত।

উদ্যান—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বসতবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে, বহু ব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কিঞ্চিদধিক পাঁচ বিঘা জমির উপরে "মনোমোহিনী উদ্যান" নামে একটী নাতি ক্ষুদ্র উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন। নিবারণবাবু তাঁহার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর নামানুসারে এই উদ্যানের নাম রাখিয়াছেন। তৎপ্রবর্ত্তিত এই উদ্যানে দেশী ও বিদেশীয় দশ প্রকারের আনারস, প্রায় ৫০ প্রকারের লেবু, কাগজী, জম্বুরা ও কমলা গাছ, দুই প্রকার সপেটা, চারি প্রকার জামরুল, ৪।৫ প্রকারের লিচু, বিবিধ প্রকারের আম্র, কাঁঠাল, ৩।৪ প্রকারের পেয়ারা, ২।৩ প্রকারের কুল, চারি প্রকার নারিকেল, বিলম্বি, লকেট, ফিয়নী, পেঁপে, বিলাতি ডেফল, গোলাপজাম, কালজাম, পীচফল, বেদানা, ডালেম, বিলাতি আমড়া, বিলাতি গাব, কাউ, চালিতা, লতা চালিতা, সিঙ্গাপুরী-

লালতেতুল প্রভৃতি ফলের; শতমুখী, পেপারমেণ্ট, গন্ধতৃণ, লতাকস্তূরী, অর্জ্জুন, কুটজ, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি বহু প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ এবং দারুচিনি, এলাচী, লবঙ্গ, গোলমরিচ, কর্পূর, হিং, আলুবোখরা, পান কর্পূর গাছপান, পচাপাতা প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের এবং বিবিধ প্রকার সুগন্ধি পত্রের গাছ আছে। এতন্মধ্যে আনারস ও লেবু জাতীয় গাছের সংখ্যাই অত্যধিক।

বিগত ১৩২৩ সনে নিবারণ বাবু ঢাকা-কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁহার উদ্যান জাত বিবিধ প্রকারের ফল ও বৃক্ষাদিসহ-উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ডকারমাইকেল সাহেব বাহাদুর প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নিবারণ বাবুর প্রদর্শনীস্থিত তাঁবুতে উপস্থিত থাকিয়া তৎপ্রদর্শিত ফল ও বৃক্ষাদি দর্শনে সবিশেষ প্রীতি হইয়া বলিয়াছিলেন "Babu you have made a very nice collection".

ঢাকা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত এফ্ জি ফ্রেঞ্চসাহেব বাহাদুর মেলা কমিটির প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির জন্য নিবারণ বাবুকে একখানা সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। নিবারণবাবু হাতে কলমে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় 'কৃষি-সম্পদে" বিজ্ঞাপিত ১৩২৩ সালের স্বর্ণমেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জামালপুর চৈতন্য নার্শারির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস্ মহোদয় নিবারণবাবুর উদ্যমশীলতার জন্য তাঁহাকে একটী রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করিয়াছেন।

দেবালয়—বেতকা গ্রামে একটী মাত্র দেবালয়—কালীবাড়ী। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার আদি বিবরণ অতিশয় অদ্ভুত। কথিত আছে ৺বারাণসীধাম হইতে কোন একব্যক্তি তিনটী প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি এদেশে বিক্রয়ার্থে আনয়ন করেন। তিনি

অতি সহজে দুইটী মূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া অপর মূর্ত্তিটী কোন প্রকারেই বিক্রয় করিতে সমর্থ হন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় "তুমি বেতকা নিবাসী আমার ভক্ত কালিদাস চাটাতির নিকট আমাকে রাখিয়া আইস। আমি তাহার নিত্য পূজায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।" এইরূপে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তি ৺কালিদাস চাটাতির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, মাত্র ৩৲ টাকা বেতনে চাকুরী করি, আমি মায়ের নিত্যসেবা, কি প্রকারে চালাইব?" এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি গ্রহণে অস্বীকার করিলে তাঁহার প্রতিও নাকি স্বপ্নাদেশ হয়। অতঃপর কালিদাস চাটাতি মহাশয় মূর্ত্তিপ্রদাতাকে ৭৲ টাকা প্রদান করিয়া অতিশয় ভক্তি ও যত্নসহকারে দেবীমূর্ত্তিসহ দেশে আগমন করেন এবং স্বপ্নাদেশ অনুসারে একটি পুষ্করিণী খনন করান, কথিত আছে তিনি ঐ পুকুরে গণেশ, কাল-ভৈরব ও একটী শিবলিঙ্গ এবং কিছু ধন প্রাপ্ত হন। উল্লিখিত ধনদ্বারায় তিনি তাঁহার পিতৃ ও মাতৃশ্মশানোপরি দুইটী ক্ষুদ্র ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার একটীর মধ্যে শিবলিঙ্গ ও অপরটীর মধ্যে কালিকাদেবীমূর্ত্তি ও প্রাপ্ত অপরাপর দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিজে পূজা দিতে থাকেন। চাটাতি মহাশয় অতিশয় ভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহই ছিলনা। তিনি তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী পর্য্যন্ত কালিকাদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান।

কালক্রমে চাটাতি মহাশয়ের প্রস্তুত মন্দির ভগ্ন হইলে ৺মহিমচন্দ্র মুখুটী মহাশয় বিশেষ উদ্যোগ করিয়া বিজনীরাজ-দুহিতা বগড়ীবাড়ীর জমিদার পত্নী ৺ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণী হইতে টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একটী ছোট দালান প্রস্তুত করান। স্থানীয় ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ নব নির্ম্মিত দালানের এক প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ ও অপর

প্রকোষ্ঠে অপরাপর দেবমূর্ত্তি সহ কালিকাদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। উক্ত মন্দির গাত্রে প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিয়া ৺ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণীর দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

"আসাম দেশে শিববংশজাতো।
বীজনীশ্বরোভূপ বাহাদুরোয়ঃ॥
ইন্দ্রাদি নারায়ণ দেব আসীৎ।
সাক্ষাৎ দিবেন্দ্রস্তনবাবতাবঃ॥

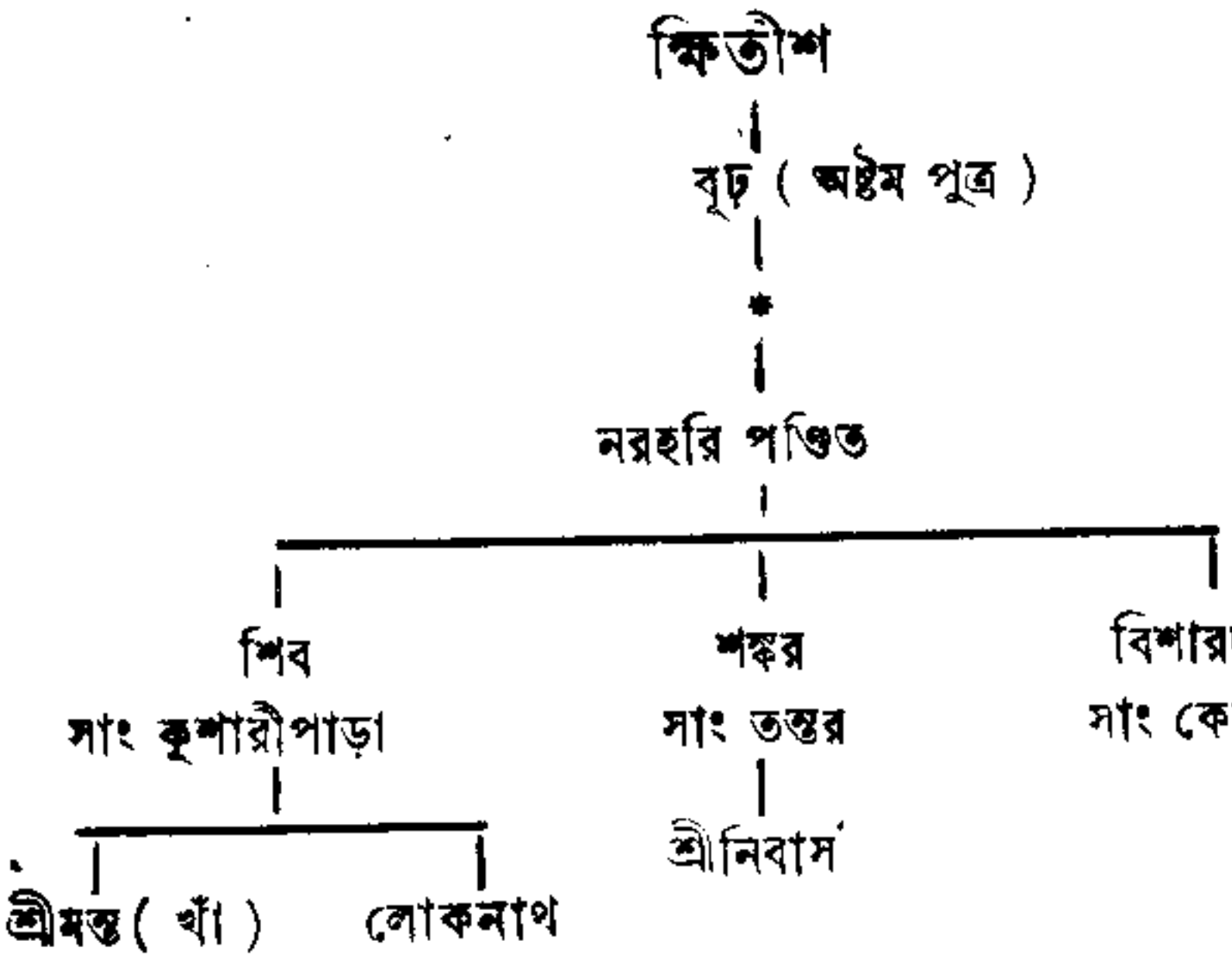
ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণী শ্রীমতী-শ্রীমতিঃসদা। পর্ব্বজ্জোয়ার বাস্তব্যা তৎকন্যা-ভক্তি ভাবতঃ॥ কাল্যাঃকৈবল্যদায়িন্যাঃ শাকেমৈত্তেন্দ্র সম্মিতে। নির্ম্মায় মন্দির মিদং প্রতিষ্ঠিতমথাকারিন॥

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ বর্ত্তমান সময়ে কালিকাদেবীর সেবাইত। তাঁহারা-পূজারিদ্বারা যথারীতি দেবীর নিত্য পূজার কার্য্য করাইয়া উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। চাটাতি মহাশয়ের প্রস্তুত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন ও বর্ত্তমান আছে।

গ্রাম্যবিবরণ—কুশারিপাড়া।

এই গ্রামটি শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। বিখ্যাত মাশ্চটকবংশ এই গ্রামের অধিবাসী সর্ব্বাগ্রে তাহাদের বিবরণী প্রদত্ত হইল।

রাজা আদিশূর যথাবিধানে যাগযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে আনীত, ভট্টনারায়ণের অষ্টম পুত্র বূঢ় বীরভূম জিলায় মানগ্রামে বাস করেন এবং তাঁহার বংশধরগণ মাশ্চটক গাঞীনামে অভিহিত হয়। প্রাচীন মানগ্রামের বর্ত্তমান নাম মানদহ। বূঢ়ের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ মানগ্রাম ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর শ্রীনগর থানার সন্নিহিত কুশারীপাড়া আসিয়া বাস করেন। নিম্নে মাশ্চটকের আদিবংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।



ক্ষিতীশ হইতে শ্রীমন্ত খাঁ পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত করিতে হইলে আদিশূর হইতে আকবর পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া মোটামুটি ৫৫০ বৎসর অনুমান করা যায়। এক শত বৎসরে চারি পুরুষ হিসাবে ধরিলে ক্ষিতীশ হইতে শ্রীমন্ত খাঁ পর্য্যন্ত বাইশ পুরুষ ধরা যায়। সুতরাং বূঢ় হইতে নরহরি পণ্ডিত পর্য্যন্ত অনুমান ষোল পুরুষের নাম পাওয়া যায়।

যতদূর জানা যায় নরহরি পণ্ডিতের পুত্রগণই প্রথমে বিক্রমপুর আসেন। এবং তাঁহারা কুশারীপাড়া কিছুকাল একত্রে বাস করিয়া অবশেষে দ্বিতীয় পুত্র শঙ্কর তন্তর গ্রামে এবং তৃতীয় পুত্র বিশারদ ঘটক উপাধি পাইয়া কোলা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু প্রথম পুত্র শিব বিক্রমপুরে মাশ্চট্টকদের আদিস্থান কুশারীপাড়াতে বাস করিতে থাকেন। অতঃপর কুশারীপাড়া হইতে শ্রীমন্তের এক পৌত্র কয়কীর্ত্তন গ্রামে স্থানান্তরিত হয়।

---

* অন্যান্যমতে পঞ্চাশ নরহরি পণ্ডিতের মাত্র দুই পুত্র শিব ও শঙ্কর।

শ্রীমন্ত খাঁ।

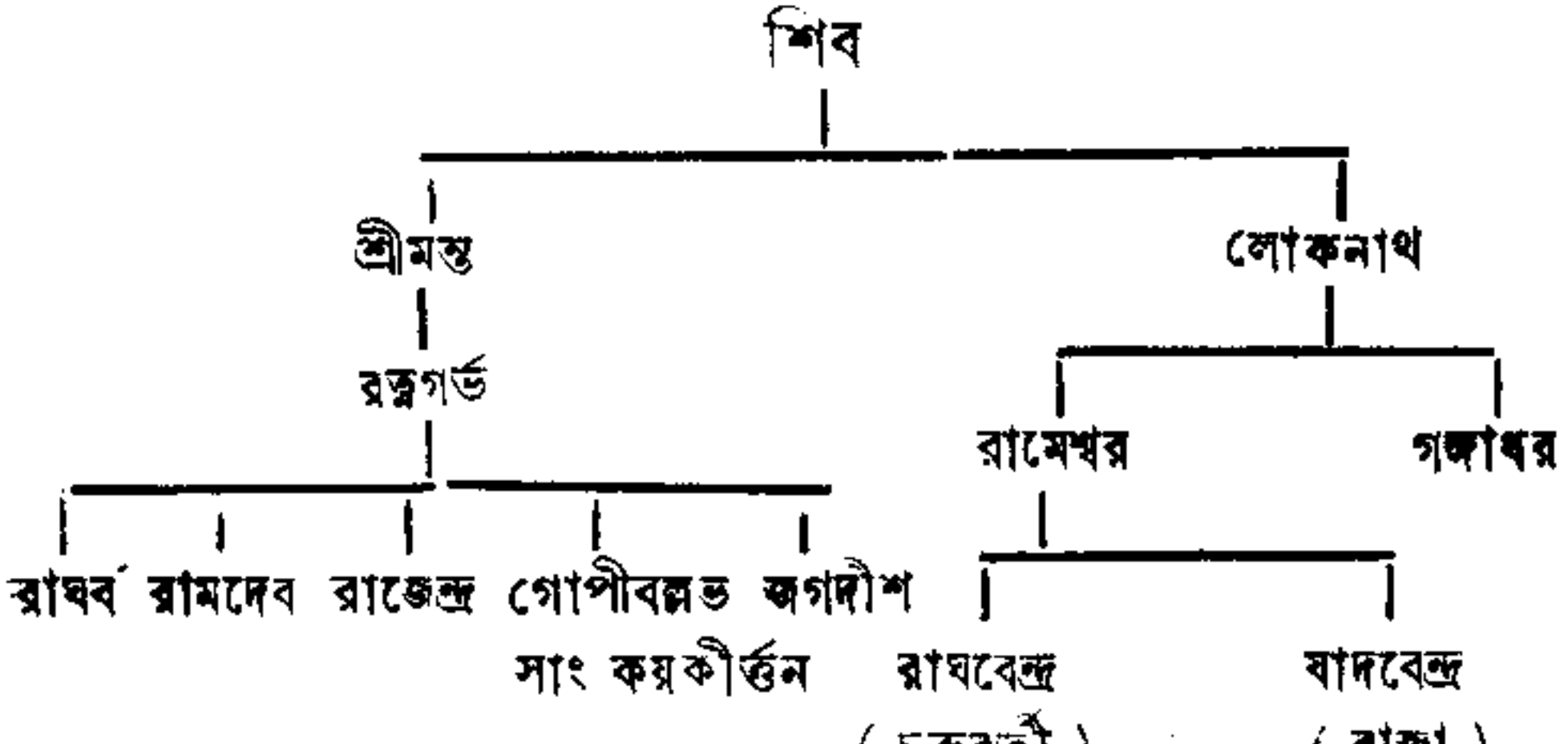
এই অতীব প্রাচীন মাশ্চটক বংশও একদিকে যেমন কুলমর্য্যাদায় সমাজে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, অপরদিকে তেমনই বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। বারভূঞার অন্যতম ভূঞা চাঁদরায় কেদার রায় যখন বিক্রমপুরে দুর্দ্দান্ত প্রতাপে শাসন করিতেছিলেন, দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহের নিকট একে একে অন্যান্য ভূঞাগণ নত শিরে বশ্যতা স্বীকার করিলে মধ্যাহ্নভানুর ন্যায় মহাপ্রতাপশালী কেদার রায়ের দুর্দ্দমনীয় তেজঃপুঞ্জ যখন সারা বঙ্গকে ঝলসিত করিয়াছিল, তখন এই বংশের শ্রীমন্ত কেদাররায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। শ্রীমন্ত প্রথমতঃ কেদার রায়ের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন সত্য কিন্তু কালক্রমে নিজের অসাধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে কেদাররায়ের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। *

শ্রীমন্ত পরে খাঁ উপাধি লাভ করেন। কথিত আছে—"কেদার রায় একদিন পদ্মাতে বেড়াইতে বহির্গত হইলে ভাসমান তাম্র পাত্রস্থিত একটী বালক দেখিতে পান এবং সেই শিশুকে বাড়ী আনিয়া লালন-পালন করেন। কালক্রমে উক্ত বালকের জাতি-নির্ণয় করিবার দরকার হইলে কেদাররায় এক মহতী সভার আহ্বান করেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইয়া উক্ত বালককে সভার মধ্যস্থানে ছাড়িয়া দেন। উক্ত বালক হাটিতে হাটিতে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে উপনীত হইলে কেদার রায় তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং "গোষ্ঠিপতি" (একগাঞীর) ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন; উক্ত বালককে ব্রাহ্মণ—সমাজে চলিত করিবার নিমিত্ত কেদার রায় যাবতীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন এবং উক্ত

* 'কেদাররায়' নামক গ্রন্থে চাঁদকেদাররায়ের ইতিহাস বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে

বালক দ্বারা পরিবেশন করান। এই নিমন্ত্রণ সভাতে শ্রীমন্তকে উক্তবালক অন্ন পরিবেশন করিলে শ্রীমন্ত অন্নগ্রহণ না করিয়া বসিয়া থাকেন। তখন কেদার রায়ের মাতা আসিয়া বলেন "শ্রীমন্ত খা (ও)" তথাপি শ্রীমন্ত খাইলেন না, কিন্তু তদবধি শ্রীমন্ত খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।"

উপরোক্ত কিংবদন্তী কত দুর সত্য, বলা যায় না। তবে শ্রীমন্ত সেই সময়ে যে প্রকার ক্ষমতাশীল, দক্ষ এবং কেদাররায়ের প্রিয়কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাতে মনে হয় কেদাররায় নিজেও তাঁহাকে খাঁ উপাধি দিতে পারেন।



পূর্ব্বোল্লিখিত গোষ্ঠিপতি ব্রাহ্মণ বালক পরিণত বয়সে বিবাহাদি করিলে কালক্রমে তাহার কন্যা বিবাহোপযুক্তা হয়। কেদাররায় শ্রীমন্ত খাঁর পৌত্রের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব করেন কিন্তু শ্রীমন্ত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর শ্রীমন্ত ধর্ম্মার্থে কিছু সময়ের জন্য ৺কাশীধাম গেলে কেদাররায়ের অনুমত্যানুসারে শ্রীমন্ত খাঁর পৌত্র গোপীবল্লভ উক্ত গোষ্ঠিপতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীমন্ত খাঁ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পৌত্রের এতাদৃশ যথেচ্চাচার সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হন এবং পৌত্রকে ত্যাগ করেন। গোপীবল্লভ ইতঃপূর্ব্বেই কেদাররায় হইতে বিবাহের যৌতুক

স্বরূপ কুশারীপাড়ার সংলগ্ন কয়কীর্ত্তন গ্রাম এবং অন্যান্য কতকগুলি মৌজা (খণ্ড তালুক বিশেষ) প্রাপ্ত হন। সুতরাং এখন পিতামহ দ্বারা ত্যাজ্য হইলে তিনি কয়কীর্ত্তনে যাইয়া বাস করেন এবং সেই অবধি কয়কীর্ত্তন মাশ্চটকের গ্রাম হয়।

কেদাররায়ের প্ররোচনায় পৌত্র গোপীবল্লভ গোষ্ঠিপতির কন্যা বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিয়াছেন, ইহা বৃদ্ধ শ্রীমন্ত খাঁ ভুলিতে পারিলেন না। এই ক্রোধ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি ছলে কেদাররায়ের ভগ্নী সোণামণিকে সোণারগাঁয়ের ভূঞা ঈশাখাঁর হাতে সমর্পণ করেন এবং অবশেষে মানসিংহের সহিত কেদাররায়ের যুদ্ধ সংঘর্ষণ হইলে কেদার-রায়ের বিরুদ্ধে তিনি নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে পরাজিত এবং নিহত করেন।

কুশারীপাড়া চক্রবর্ত্তী বাড়ী।

রাঘবেন্দ্র তৎসাময়িক প্রতিষ্ঠাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করেন এবং তাঁহার বংশধর অদ্যাবধি চক্রবর্ত্তী উপাধি বহন করেন এবং প্রত্যেক পুরুষে একজন শাস্ত্রাধ্যাপক খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়া আসিতেছেন। বোধকরি শঙ্কর ও বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং সেই জন্য তাহার বংশধরগণ অর্থাৎ তন্তরের সকল মাশ্চটকই চক্রবর্ত্তী উপাধি লিখেন। এই মাশ্চটক বংশে শঙ্করের বংশধর রুজদি নিবাসী রাসমোহন সার্ব্বভৌম মহাশয় অদ্বিতীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন এবং বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে কুশারী পাড়া নিবাসী রাঘবেন্দ্রের বংশধর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন মহাশয়গণ এবং

পুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। রাঘবেন্দ্র কুশারীপাড়ার যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা এখনও চক্রবর্ত্তী বাড়ী বলিয়া খ্যাত।

কুশারীপাড়া রাজবাড়ী।

তৎকালীন সমস্ত ব্রাহ্মণই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মাশ্চটক বংশধর যাদবেন্দ্র ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে দুইটী কিংবদন্তী আছে :—

প্রথম কিংবদন্তী—"রাজা" রাজবল্লভের সভাতে শাস্ত্র বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপিত হইলে উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী তাহা মীমাংসা করিতে পারেন না। সুতরাং পণ্ডিতপ্রবর রাঘবেন্দ্রকে উক্ত সভায় নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত তর্ক মীমাংসা করিয়া দিয়া আসিতে রাজবল্লভ অনুরোধ করিয়া পাঠান। সেই সময়ে রাঘবেন্দ্র কার্য্যান্তরে বাড়ী ছিলেন না; সুতরাং তাহার কনিষ্ঠ সহোদর যাদবেন্দ্র রাজার অনুরোধরক্ষার্থে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা উত্থাপিত শাস্ত্রীয় তর্ক মীমাংসা করিয়া দেন। তাহাতে রাজবল্লভ সন্তুষ্ট হইয়া যাদবেন্দ্রকে পুরস্কার স্বরূপ এক তোড়া টাকা অর্পণ করিলে যাদবেন্দ্র তাহা তুচ্ছ জ্ঞানে অগ্রাহ্যকরেন। রাজবল্লভ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এবম্বিধ উদারতা ও নির্লোভীতা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং যাদবেন্দ্রকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী—সে সময়ে কোন দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিলে গ্রামের মোড়ল বিচারের জন্য তাহাদিগকে কাজির নিকট উপস্থিত করে। কিন্তু বিচারপ্রার্থী উভয় ব্যক্তি কুশারীপাড়া নিবাসী যাদবেন্দ্র দ্বারা তাহাদের বিচার সম্পন্ন হওয়ার জন্য কাজির নিকট প্রার্থনা করিল। কাজি তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া যাদবেন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইয়া দেন। দরিদ্র

নামাবলী স্কন্ধে ফেলিয়া তালপত্রের ছত্র সহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। কাজি যাদবেন্দ্রকে দেখিয়া হাস্য সহকারে বিচারপ্রার্থীদের প্রতি যাদবেন্দ্রের প্রাধান্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল "তিনি ধনের কাঙ্গাল কিন্তু মানের রাজা।" সেই অবধি যাদবেন্দ্র কাজি দ্বারা "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই দুইটী কিংবদন্তীর মধ্যে প্রথমটীই বিশ্বাসযোগ্য এবং যাদবেন্দ্র যে রাজবল্লভের সমসাময়িক লোক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক কুশারীপাড়ার যে বাড়ীতে যাদবেন্দ্র বাস করিতেন সেই বাড়ী "রাজাবাড়ী" বলিয়া খ্যাত। শ্রীনগর পোষ্টআফিসের সৃষ্টি হইতে কুশারী পাড়া, "রাজাবাড়ী" ঠিকানায় চিঠি লিখিলে তাহা রীতিমত বিলি হয়। এই বাড়ীর বহু পুরাতন চিঠিপত্রাদি এবং দলিল গৃহীতার নামের পূর্ব্বে "রাজা" শব্দ আছে এবং রাজা যাদবেন্দ্রের বংশধরগণকে অদ্যাপি তাহাদের নামের পূর্ব্বে বা পরে "রাজা" শব্দ সংযোজিত করিয়া অভিহিত করা হয়।

কুশারীপাড়ার ভগ্ন মঠ।

মাশ্চটক মানগ্রাম হইতে বিক্রমপুরে কুশারীপাড়া আসিয়াই প্রথম বাসস্থান নির্দ্ধারিত করে এবং কুশারীপাড়া হইতে পরে তন্তর, কোলা, রুজদি ও কয়কীর্ত্তন গ্রামে যায়। কুশারীপাড়াতে এখনও এক দীঘি আছে এবং তাহা "শ্রীমন্তখাঁর দীঘি" বলিয়া খ্যাত। কুশারীপাড়ার মাশ্চটক বংশীয় এই দীঘি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনুমান ৩০০ এবং ১০০ হাত। এই দীঘির পূর্ব্ব পারে জুনুরগাও হইতে মাশ্চটক বংশীয় শিবচরণ চৌধুরী মহাশয় যোগবলে সিদ্ধি লাভ করেন; এবং নির্জ্জনে যোগাভ্যাস করিবার জন্য একটী মঠ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই মঠ এখনও জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

এবং অনুল্লিখিত নানাকারণে চৌধুরী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য এবং ঘটক উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সকলেই এক বংশসম্ভূত। চৌধুরী উপাধি অনুমান করি মুসলমান রাজা দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে, কারণ পূর্ব্বে তালুকদারদিগকে চৌধুরী বলা হইত। বল্লালের সময়ে যখন বংশমর্য্যাদার অত্যন্ত গৌরব ছিল তখন এই মাশ্চটকগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সেই সময় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের যাবতীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ এই বংশের কন্যার পাণিগ্রহণে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং তখন মাশ্চটকগণ প্রধান কুলীনকে ও মাত্র পাঁচটী হরিতকি বরপণস্বরূপ প্রদান করিতেন। প্রায় ৪০ বৎসর হয় কোন খাসবাড়ীর মুখোপাধ্যায় বিবাহ খরচ সঙ্কুলনার্থে বরং কন্যাকর্ত্তাকে দুইশত টাকা প্রদান করতঃ এই বংশের একটী কন্যা তাঁহার পুত্রকে বিবাহ করাইয়া সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন।

গ্রাম্যবিবরণ—ফেগুণাসার।

ফেগুণাসার বা ফেউগ্‌ণাসার গ্রামটি বিক্রমপুরের উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের বাস। গ্রামের নামোৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পুরাণা কাগজপত্র ইত্যাদিতেও সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না।

এগ্রামে বর্ত্তমান সময়ে রাস্তাঘাটের বিশেষ অসদ্ভাব। একরূপ নাই বলিলেই চলে। স্বর্গীয় খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের জীবিতকালে তিনি নিজ ব্যয়ে নিজ বাড়ী হইতে মালখানগর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অধুনা ঐ রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই গ্রামবাসী অন্যতম অর্থশালী ব্যক্তি স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয় ও [illegible] পূর্ব্বোক্ত রাস্তাটি পুনর্ব্বার সংস্কার

রাস্তা ঘাট, খাল ইত্যাদি।

করিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকেলবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। দুইটী খাল আছে। 'খরার' দিন জল থাকেনা, এজন্য নৌকাচলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয়।

মধ্য দিয়া যে খালটি চলিতেছে, তাহাকে 'ঝোরা' খাল বলা যায়। অপ্রশস্ত এবং উহার দুইধার জঙ্গলাকীর্ণ। গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ধার দিয়া যে খালটী গিয়াছে উহাকে গ্রামের একরূপ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমানা বলা যাইতে পারে। এখালটিতে কোন কোন বৎসর অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্তও জল থাকে।

বন, জঙ্গল, ডোবা, পুষ্করিণী।

গ্রামে বন, জঙ্গল বিশেষ নাই তবে প্রায় কুড়ি পঁচিশটি 'ডোবা বা 'গড়' আছে। পুষ্করিণীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশটি হইবে। বর্ষার সময়ে প্রত্যেকটির জলই ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, নচেৎ গ্রীষ্মের দিনে গ্রামবাসীর অত্যধিক পরিমাণে জল কষ্ট হয়। সে সময়ে মাত্র পাঁচ ছয়টির জল ব্যবহারোপযোগী থাকে।

হাট বাজার।

নিজ গ্রামের উপর কোনও হাট বাজার না থাকিলেও গ্রামবাসীর হাট বাজারের কোনও অসুবিধা নাই, তাহারা অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী তালতলা, কুণ্ডেরবাজার ইত্যাদি স্থান হইতেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন।

পাঠাগার, বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি।

মহামহিমান্বিত শ্রীশ্রীমান্ ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের করোনেশন উপলক্ষে এ গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। পাঠাগারটির নাম করোনেশন লাইব্রেরী, পুস্তক সংখ্যা, মাত্র একশত। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু এম, এ, বি, এল মহোদয়।

improvement society" নামে একটী সভাও আছে। সভাটী নামে মাত্র বিদ্যমান—উহা দ্বারা গ্রামের কোন কার্য্যই হয় না, গ্রামবাসীর ঔদাসীন্যই তাহার প্রধান কারণ। গ্রামে একটী নিম্নপ্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় আছে, এই দুইটীই ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত। কোনটির অবস্থাই সন্তোষজনক নহে।

ধলেশ্বরী নদী হইতে তালতলার খালে আসিয়া পঁহুছিলেই একটী সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মঠ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠটী ফেগুণাসারের মঠ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। মঠটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট হইবে। মঠটির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এজন্য গ্রাম্য জনসাধারণ ইহাকে 'শিববাড়ী' নামেও অভিহিত করে।

প্রাচীন কীর্ত্তি, মঠ।

ফেগুণাসার গ্রামের যে অংশে মঠটি অবস্থিত তাহা "শ্যামরায়ের পাড়া" নামে কথিত হইয়া থাকে। মঠটির ইতিহাস এইরূপ—"প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে শ্যামসুন্দর রায় নামক বৈদ্যবংশীয় এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের নবাবের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠটি নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঠের পশ্চিমদিকে একটি বড় দীঘি আছে। দীঘিকাটির অবস্থা এখন সন্তোষজনক নহে। এই দীঘির উত্তর পারে এখনও শ্যামরায়ের প্রাচীরবেষ্টিত দ্বিতল বাটীর এবং সিংহদরজার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামরায়ের সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না। শ্যামরায়ের মাতা খুব ধূমধামের সহিত প্রতি বৎসর চড়ক বা নীল পূজা করিতেন। এখনও সেই চড়ক পূজার গজারী গাছটি বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান সময়েও প্রতি বৎসর ঐ স্থানে বিশেষ ধূমধামের সহিত চড়কপূজা হয় ও তথায় মেলা বসে। মেলায় বহু লোকসমাগম হয়। এ গ্রামে আর একটী বড় দীঘি ও একটী বড়

বাড়ী বলিয়া বলেন—কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কেহই তেমন কিছু বলিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দাস মহাশয় ফেগুণাসারের মঠটিকে রাজা রাজবল্লভের পুত্র রামদাসের কীর্ত্তি বলিয়া বলেন। গ্রামের লোকসংখ্যা দুই হাজারের কিছু কম।

গ্রাম্যবিবরণ—বীরতারা।

বীরতারা একটী ক্ষুদ্র পল্লী। বীরতারা সম্ভ্রান্ত কায়স্থপ্রধান স্থান। এই গ্রাম শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উত্তরে ও পূর্ব্বে ধলেশ্বরী, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মানদী, এই উভয় নদী হইতেই বীরতারা তুল্য দূরে—প্রায় আট মাইল ব্যবধানে। উত্তরে উমপাড়া, ছয়গাঁও, মজিদপুর ও দয়হাটার কিয়দংশ; পূর্ব্বে মজিদপুর, দয়হাটা ও রক্ষিতপাড়ার কিয়দংশ; দক্ষিণে তিনগাঁও, শালেপুর ও পূর্ব্বদেউলভোগের কতকাংশ এবং পশ্চিমে ষোলঘর—বীরতারা গ্রামের এই চতুঃসীমানা। শ্রীনগর হইতে মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে বীরতারা তাহা হইতে এক চতুর্থ মাইল উত্তরে এবং সিরাজদিখার ষ্টীমার ঘাট হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

উৎপত্তি—প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানশাসনকালে বীরতারার প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺হরিনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণানন্দের সহিত জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় পাইকপাড়ার পৈতৃক ভদ্রাসন ও স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরতারা আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। বীরতারার নাম সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে হরিনাথ মজুমদারের পাঁচপুত্র সকলেই বীরোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া লোক সাধারণ গ্রামটীকে "বীরতারা" আখ্যা প্রদান

করে। দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কিন্তু অদ্যাবধি গ্রামটীকে "বিলতারা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা অসম্ভব নয় যে অভ্যুদয়ের দিনে "বিলতারাকেই" গ্রাম্য পণ্ডিতগণ "বীরতারা" এই শ্লাঘ্য অভিধানে ভূষিত করিয়াছেন। বিলতারা নামটীর সার্থকতা নাই বলিতে পারি না, বাস্তবিক বিস্তৃত আরিয়লবিলের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম সমূহ হইতে বিলতারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। উক্ত বিল অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে গেলে বিলতারা বহুদূর হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মজুমদার বংশের পূর্ব্ব ইতিহাস—এই বংশের আদিপুরুষ গণপতি দেব, যাঁহার নিম্নতম সপ্তম পুরুষ চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা দনুজমর্দ্দনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর বুরানদেবের পৌত্র ভাস্বর দেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত আবদুল্লাপুর, সোণাকান্দা প্রভৃতি স্থানের আংশিক জমিদারী ক্রয় করিয়া পাইকপাড়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। ভাস্বর দেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হরিনাথ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হরিনাথ বীরতারার সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি বীরতারায় আসিয়া রাজা চাঁদরায় কেদার রায়ের আত্মীয়া রূপমঞ্জরী দেবীর সাহায্যে সাতটী মৌজায় ৩৪৪৲ টাকা জমায় পুত্র রমাবল্লভের নামে এক তালুক সৃষ্টি করেন। গ্রামে বিভিন্ন জাতীয় প্রজা বসিল এবং সত্বরই বীরতারা একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বলিয়া দেশবিদেশে পরিচিত হইল। হরিনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার পাঁচ পুত্রের জন্য দীঘি-পুষ্করিণী-সমন্বিত পাঁচখানি সুরম্য বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি লোকহিতকর অনেক কার্য্য তিনি করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর, শিবরত্তি, নানকার, চাকরান প্রভৃতি নামে জমি বসৎবাটী

ইত্যাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ও বৃত্তা সকল গ্রামে আনিয়া স্থাপন করেন। এইরূপে পুরোহিত সূত্রে ব্রাহ্মণগণ ও জামাতা, দৌহিত্র ভাগিনেয়-সূত্রে বহু কায়স্থ বংশ বীরতারায় আনীত হন। হরিনাথের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণজীবন মজুমদার মালখানগরের প্রসিদ্ধ দেবিদাস বসুর একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রে রাজা রাজবল্লভের তিন পুত্র নরসিংহ মজুমদারের নামে এক তালুক সৃষ্টি করিয়া যান। এই তালুক এখন সিকিমি তালুকে পরিণত হইয়াছে, এবং নরসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া দশশালা বন্দোবস্তের সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্গাপ্রসাদের নামে তালুক নামান্তরিত হইয়াছে। পথকরের কাগজ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সেই সময় এই তালুকের বার্ষিক আয় ৭৮৫৬৲ টাকা ছিল। এই তালুক দুর্গাপ্রসাদের হাওলা বিক্রমপুরবাসী অধিকাংশ জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন, যথা—পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান ধনী ও জমিদার ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মাধিকরণ স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, রায়চৌধুরীগণ, শ্যামসিদ্ধির তালুকদার চন্দ্রকান্ত মিত্র প্রভৃতি।

লোকসংখ্যা—বীরতারা গ্রামে বর্ত্তমানে অনুমান আড়াই সহস্র লোকের বাস—ব্রাহ্মণ ১৪ ঘর, কায়স্থ ৩৩, শূদ্র ৪৬ বারুই ২৯, গোয়ালা ২, নাপিত ৫, ভুইমালী ৪, নমঃশূদ্র ৪০, জোলা ৭, মুসলমান ৭০ ঘর; মুসলমানগণ গ্রামের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে হিন্দুঅধিবাসীদিগের হইতে একটু দূরে বাস করে।

সাধারণ অবস্থা—এই গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হইলেও ইঁহারা উন্নতিশীল। ইহাদের মধ্যে অনেকে পৌরোহিত্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ

প্রভৃতি ইহাদের যজমান। কাশ্যপ গোত্রাবলম্বী চাটাতি গাই চক্রবর্ত্তী বংশই বীরতারার আদি ব্রাহ্মণ। এই চক্রবর্ত্তী বংশে অনেক অধ্যাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে কেহ রাজকার্য্য, কেহ শিক্ষকতা, কেহ চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কায়স্থদিগের মধ্যে এক ঘর কাঁঠালিয়ার দত্ত, এক ঘর বহরের বসু রায় চৌধুরী, এক ঘর ঘোষ আছেন।

মাওয়া হইতে আগত বীরতারানিবাসী বলবংশ বহুকাল যাবত উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ বলিয়া দেশে প্রখ্যাত। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ডাক্তার তারানাথ বল, এল্,এম্,এস্, এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র আমেরিকা (America) হইতে Ph. C. W. S. হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন,আর এক পুত্র এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন, এই বংশের আর ও ২।১ জন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বীরতারার নাজির উপাধিক আলী-মানগোত্র দে বংশ বিক্রমপুর কায়স্থসমাজে সুবিদিত। এই গ্রামের ধর ও কর বংশ ও পরিচিত। এতদ্ভিন্ন বসু, মিত্র, দত্ত ও পাল বংশ স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

শূদ্রদিগের অবস্থা আজ কাল মন্দ নয় অনেকেই চাকুরি কিম্বা ব্যবসায় করে, দুই এক ঘর রাজমিস্ত্রীর কার্য্য করে। ইহাদের একটী যুবক শিক্ষার্থ আমেরিকা গিয়াছে।

বারুইদিগের সাংসারিক অবস্থা মোটামুটি ভাল বলা যাইতে পারে। তাহাদের প্রায় সকলেরই মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নাই। নমঃশূদ্রের মধ্যে এক জন বিশেষ সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়াছে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই সূত্রধরের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। মুসলমানদিগের অধিকাংশই কৃষি কর্ম্ম করিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাদের

মধ্যে কয়েক ঘর তাঁত দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। মোটের উপর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়।

বিদ্যাচর্চ্চা।—বিদ্যানুশীলনে বীরতারা কোন দিনই দেশের সমসাময়িক অবস্থার পশ্চাতে নহে। মুসলমান রাজত্বকালে মজুমদার বংশের অনেকে পারস্য ও আরব্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ৺ পার্ব্বতীচরণ মজুমদার পারশীভাষায় একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়াই মজুমদারগণ অনেকে নবাব সরকারে উচ্চ পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নাজির বাড়ীর ভবানী দেব পারশী ভাষায় একজন বড় মুন্সী ছিলেন তাঁহাকে লোকে "ভবানীপার্শি" বলিয়া সম্বোধন করিত।

সংস্কৃত চর্চ্চায়-বীরতারার টোল এক সময় বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থীগণ এই টোলে শিক্ষালাভ করিতে আগমন করিত। পণ্ডিত ৺ রামকুমার ন্যায়ভূষণ, রামগঙ্গা তর্করত্ন, কালিদাস সিদ্ধান্ত, কালীকান্ত শিরোমণি, কালীকুমার বিদ্যারত্ন, অম্বিকাচরণ তর্করত্ন, প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৺রামগঙ্গা তর্করত্ন 'অমরকোষের' টীকা লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে ও গ্রামে তিন জন সংস্কৃত্যাধ্যাপক আছেন।

নর্ম্যাল স্কুলের সৃষ্টি হইলেই গ্রামের যুবকগণ অনেকে ঢাকা যাইয়া উক্ত স্কুলে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সকলেই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ৺ হরিশ্চন্দ্র মজুমদার ও ৺তারিণীচরণ মজুমদার কিছুদিন পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া উকিল হ'ন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার, ৺রামকানাই বল প্রভৃতি যুবকগণ জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অম্বিকাচরণ কিছু দিনের জন্য রাজসাহী কলেজের

অধ্যাপক হইয়াছিলেন, পরে ডেপুটি কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার (পরে প্রসিদ্ধ আচার্য্য) প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। মেডিকেল কলেজের আদিযুগের ছাত্র এই গ্রামের ডাক্তার তারানাথ ও প্রসন্নচন্দ্র। মুন্‌সেফী পদের সৃষ্টি হইলেই ৺ রামহরি মজুমদার স্বীয় ক্ষমতা বলে ঐ পদ লাভ করেন। ৺গুরুচরণ মজুমদার মুন্সেফী পদে, ৺ জয়চন্দ্র মজুমদার ও ৺শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠান করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বীরতারার অনেক শিক্ষিত সন্তান উচ্চ পদস্থ ছিলেন। গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম্, এ, এল্, এম্, এস্, উপাধিধারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে নিতান্ত কম নহে।

বহুদিন যাবত একটী মধ্যবাঙ্গালা স্কুল গ্রামে চলিয়া আসিতেছে, ছাত্র সংখ্যা অনুমান ৭০।৭৫ জন হইবে। বালিকাদের শিক্ষার জন্য দুইটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। কিছুদিন হইল কয়েকটী শিক্ষিত যুবকের উৎসাহে "Birtara Union Library" নামে একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাস্তা ঘাট ও স্বাস্থ্য—মজুমদার বংশের আদিবাড়ী অর্থাৎ পশ্চিমের বাড়ী হইতে পূর্ব্ব প্রান্তে হাটখোলা পর্য্যন্ত লোক্যালবোর্ডের একটী অনতিপ্রশস্ত রাস্তা আছে। সংস্কার অভাবে উহা ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়াছে। একটী "হালট" গ্রামের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উৎসবাদির দিন এই রাস্তা দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে পরিখা রহিয়াছে, বর্ষায় সেগুলি জলপূর্ণ হইলে নৌপথে পরিণত হয়। এই সময় নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের অন্য কোন উপায় থাকে না। গ্রামে ছোট বড় অনেক দীঘি পুষ্করিণী আছে, সংস্কারের অভাবে সে গুলির অধিকাংশে "দল" জন্মিয়াছে।

এই সমৃদ্ধ গ্রামের অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল পানের অযোগ্য। গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাবে গ্রামে দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে।

বিবিধ—গ্রামে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস আছে, নিকটবর্ত্তী টেলিগ্রাফ আফিস ২৷৷০ মাইল দূরে কোলা গ্রাম। বীরতারার হাট প্রসিদ্ধ, সপ্তাহে দুইদিন রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে। গ্রাম্য গৃহস্থের আবশ্যকীয় যাবতীয় সামগ্রী হাটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুইখানা মুদী দোকান ও একখানা মনোহারী দোকান গ্রামে স্থায়ীভাবে আছে। দৈনিক বাজার করিতে হইলে দুই মাইল দূর ষোলঘর, সিংপাড়া কিম্বা হাসাড়ার বাজারে যাইতে হয়।

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটী বড় মেলা হয়। এ মেলা হইতে বীরতারাবাসী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী মাল মসল্লা ক্রয় করিয়া রাখে। মেলায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। দোলের দিন গ্রামে একটী শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে; এই শোভাযাত্রায় কোন্ বাড়ীর ঠাকুর পূর্ব্বে যাইবে, ইহা লইয়া মাঝে মাঝে বাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। বিক্রমপুরের বহু গ্রামের ন্যায় এখানেও একটী বিবাহিত বটঅশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ইহা সুবচনী নামে সুপরিচিত, হাট খোলার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দণ্ডায়মান। ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে, নানা স্থান হইতে হিন্দুরমণীগণ আগমন করিয়া বৃক্ষে তেল সিন্দুর বিলেপন করিয়া থাকেন। **ডঙ্কুরকালী** নামে আর একটী বটবৃক্ষ হাটের মধ্যভাগে অবস্থিত। মানত দিবার জন্য ছাগ ইত্যাদি লইয়া বহুলোক ইহার পাদমূলে সমবেত হয়। হাটের মধ্যে বৃহৎ বট বৃক্ষদ্বয়ের দৃশ্য বড়ই নয়নাভিরাম। পশ্চিমের বাড়ীতে একটী রামচন্দ্রের প্রস্তর মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে ৺জয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সুয়াপুরের এক পুষ্করিণী খনন করিয়া এই মূর্ত্তিটী উদ্ধার

করেন এবং স্বগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার পরেই তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মে এবং তাহার নাম তিনি রামচন্দ্র রাখেন।

৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লুসাই যুদ্ধে রসদের কর্ম্মচারী হইয়া গিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে Bengal Ambulance Corps এ যোগ দিয়া জ্যোতিরঞ্জন মজুমদার মেসোপটমিয়া গিয়াছিলেন।

এখানে এ গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণের ও স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণ।

পণ্ডিত ৺রামকুমার ন্যায়ভূষণ বঙ্গীয় ১২২৫ সালে বিক্রমপুরস্থ বীরতারা গ্রামে তথাকার প্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামকিশোর চক্রবর্ত্তী। এই চক্রবর্ত্তী বংশ বহুদিন হইতেই পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা বিপদ ও দুঃখদারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মানুষ হইতে হইয়াছিল।

যৌবনের প্রতিভা শৈশবেই বালক রামকুমারের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে তিনি একদিনেই বাঙ্গলা বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণনা ও লেখা শিক্ষা করিতে তাঁহার কেবল মাত্র দুইদিন সময় লাগিয়াছিল। পিতা রামকিশোর পৌরহিত্য দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, স্বচ্ছল ভাবে না চলিলেও তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব ছিল না। সহসা পিতার মৃত্যুর পর সংসারের গুরুভার বালক রামকুমারের স্কন্ধে পতিত হইল। তখন রামকুমার টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে তাহার খুল্লতাতের একটী সরকারী চাকরী হওয়ায় তাহার সংসারের ভাবনা আর বড় একটা ভাবিতে হইল না। বালক রামকুমার অসাধারণ প্রতিভা বলে অল্প সময় মধ্যে দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া নবদ্বীপে যাইয়া সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য খুল্লতাতের অনুমত্যানুসারে তথায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি প্রায় ছয়বৎসর কাল বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন এবং বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা তাহাতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ তিনি স্বর্ণপদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। কেবল মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়সের সময় তিনি 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার যশঃরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

রামকুমার দেশে ফিরিয়াই 'টোলের' সংস্কার-সাধনে এবং যাহাতে দেশমধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চা বিশেষ করিয়া প্রসার লাভ করে তজন্য মনোযোগী হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনার কথা ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় দূর দেশে হইতেও বহু ছাত্র সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য এই টোলে আগমন করিত। ন্যায়ভূষণ মহাশয় খুব দক্ষতার সহিত বহুবর্ষ এই টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও স্নেহে, শিষ্যগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। বিক্রমপুরের বর্ত্তমান অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার শিরোমণি মহাশয় ইঁহারই ছাত্র।

দেশ বিদেশের নানাস্থানে শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য 'ন্যায়ভূষণ' মহাশয়ের নিমন্ত্রণ হইত। তাঁহার বাগ্মীতা, এবং বিচারের অকাট্য যুক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন এবং একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। এক দিকে

চরিত্র মহত্ত্বেও তিনি দেশবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি হাটবাজারে যাইয়া কোন দিন কোন জিনিষের দরাদরি করিতেন না। দোকানদারগণ যে জিনিষের যে মূল্য বলিত তিনি বিনাতর্কে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতেন। তাঁহার এইরূপ মহত্ত্বে অল্প সময়ের মধ্যেই দোকানদারগণ তাঁহার নিকট কোন দিন জিনিষের দরাদরি করিত না। বরং অন্য লোকের অপেক্ষা তাঁহার নিকট কিছু অল্প মূল্যেই দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। গ্রামে কেহই তাঁহার শত্রু ছিল না, সকলেই তাঁহাকে মিত্র জ্ঞানে ভক্তিও শ্রদ্ধা করিত।

তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয় সর্ব্বদা বলিতেন "হৃদয়ে পবিত্রতা চাই, মনে ভক্তি চাই।" তাঁহার পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে যাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"এত অর্থ নষ্ট ও শরীর ক্ষয় করিয়া গঙ্গা স্নানে যাইয়া কোন ও ফল নাই, ভক্তি-সমন্বিত হইয়া একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে পারিলে বাড়ী বসিয়া পনাপচা পুস্করিণীতে স্নান করিলেও অনেক পুণ্য হইয়া থাকে।" দিবসের অধিকাংশ সময়ই সন্ধ্যাআহ্নিকাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইত, বাকী সময়টুকু বিদ্যানুশীলনে ব্যয় করিতেন। পথে যাইতে যাইতে যদি কোনও স্থানে কাঁটা ইত্যাদি পাইতেন, তাহা হইলে উহা সযত্নে পথের অন্য পার্শ্বে নিক্ষেপ করিতেন। এজন্য অনেকে তাঁহাকে 'পাগল' বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না।

পারিবারিক জীবনে তিনি বিশেষ শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। একে একে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কাল গ্রাসে নিপতিত হয়।

এ সকল পুত্র-বিয়োগ-শোক তিনি অসীম সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন।

তিনি আজীবন নিরামিষাসী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রামলক্ষ্মী দেবী পরলোক গমন করেন।

রামকুমার পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বীরতারা গ্রাম হইতে সংস্কৃত চর্চ্চার অবসান হইয়াছে। এখন আর গ্রামে কোন টোল কিংবা তেমন উপযুক্ত পণ্ডিত নাই, জানি না এই অভাব কতদিনে পূর্ণ হইবে।

৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা ১২৪৪ সালের ২৪এ ভাদ্র, ইংরাজি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, বীরতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের পড়াশুনায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় ও টোলে তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। পরে ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য বরিশালে পিতার নিকট গমন করেন।

কিছুকাল বরিশালে থাকিয়া পড়িবার পর জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা জয়চন্দ্র মজুমদার আগ্রহ সহকারে গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার কার্য্যস্থল নোয়াখালিতে শিক্ষা-দানার্থে লইয়া যান। অল্প কিছুদিন নোয়াখালিতে থাকিয়া পরে গিরিশচন্দ্র ঢাকা যাইয়া পোগোজ স্কুলে ভর্ত্তি হন। পোগোজ স্কুল হইতে ১৮৬০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গিরিশচন্দ্র মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি ও একটী মেডেল প্রাপ্ত হন। ১৮৬১ সনে তিনি ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন।

গিরিশচন্দ্র যখন ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তখন মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া নগরে নগরে উপস্থিত হইতেছিল, গিরিশচন্দ্রের নির্ম্মল মানস-ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী দ্বারাই সত্যধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র যখন সব পরিত্যাগ করিয়া 'সেই একের' শরণ লইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার সংসারে অনাসক্তির ভাব টের পাইয়া বহর গ্রামের কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীকেই তাঁহার উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া হরিশ বাবু স্থির করেন। গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ (পরে সাহিত্যসম্রাট্ 'বান্ধব' সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই) পাত্রী দর্শনার্থ প্রেরিত হন, তাঁহার অনুমোদনের পর শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সহিত গিরিশচন্দ্র বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। গিরিশ বাবু ঘনিষ্ট ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন এবং অদম্য উৎসাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ হইল। সাংসারিক তথাকথিত উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের নবোন্নতির যুগে তিনি সঙ্গীতগায়ক, শাস্ত্রব্যাখ্যাকর্ত্তা, আচার্য্য, উপদেষ্টা হইলেন। যখন কেশবচন্দ্রের উপদেশ, আরাধনা ও প্রার্থনার শক্তি কলিকাতা রাজধানীকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, তখন গিরিশচন্দ্রের ভাষা-সম্পদ-পরিপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বাগ্মীতা উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে নবীন ভাবের অবতারণা করিল। ১৮৬৫ সনের ২৩শে আগষ্ট (৮ই ভাদ্র) তাঁহাকে স্থায়ীভাবে উপাচার্য্যের পদে বরণ করা হয়। এই সময় স্বনামখ্যাত বাবু সর্ব্বানন্দ দাস, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, বাবু রাখালচন্দ্র রায়, বাবু চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদানকরেন। বরিশাল-

সমাজের পক্ষে দুর্গামোহন বাবু, গিরিশবাবু ও সর্ব্বানন্দ বাবু এই তিন ব্যক্তির সম্মিলনকে ত্রিবেণীসঙ্গম বলা যাইতে পারে।

গিরিশচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম হইবার পরও এক বৎসর পর্য্যন্ত মনোরমা দেবী বীরতারা ছিলেন। গিরিশচন্দ্র স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় বীরতারা হইতে মনোরমা দেবী স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, চিরজীবনসঙ্গিনী হইবার একান্ত ইচ্ছা স্বামীকে জ্ঞাপন করিলেন। যখন মনোরমা দেবী স্বামীর দুঃখ দারিদ্র্যের ভাগিনী হইতে প্রস্তুত হইলেন তখন তাঁহাকে স্বীয় সকাশে আনয়ন করা স্থির হইল। যে দিন তিনি স্ত্রী ও অনুজ প্রসন্নচন্দ্রসহ বীরতারা হইতে বহির্গত হন সেদিনকার শোকাবহ দৃশ্য বর্ণনাতীত। শত শত লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে গিরিশচন্দ্রের সংসার, সমাজ ও দেশত্যাগ ব্যাপার দেখিতে সমবেত হইল। সকলেরই হৃদয়ে বেদনা, মুখ মলিন, চোখে জল। মাতা কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন, পিতা কাতর ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, চারিদিকে ক্রন্দনের হা হতোস্মির রোল উঠিল। মাতা প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "গিরি, তুই আমাকে কোন দিন কোন বাক্যে কি ব্যবহার দ্বারা কষ্ট দিস্ নাই, আজ কেন আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতেছিস্?" মাতার বক্ষ হইতে গিরিশচন্দ্র নিজকে ছিন্ন করিয়া কিছু দুর দৌড়াইয়া অগ্রসর হইলেন। পিতার পদধূলি মস্তকে লইতে যাইয়া বলিলেন, "পিতঃ! এই দেহ আপনা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি আদেশ করিলে এই দেহের রক্ত দ্বারা আপনার চরণ ধৌত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু আমি বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।" পিতাও উদারভাবে উত্তর করিলেন, "আমার এই ৭০ বৎসরের বদ্ধমূল সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার ধর্ম্মের অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমি বুঝিতেছি তুমি যে পথ ধরিয়াছ

তাহাও খাঁটী পথ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি এই পথে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ কর।" শোকার্ত্তহৃদয়ে পিতা যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

গিরিশচন্দ্র সস্ত্রীক সানুজ দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন। এই সময়কার লোকগঞ্জনা, সমাজের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সব অগ্রাহ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র কিরূপ শান্ত অবিচলিত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা অবাক হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সর্ব্ব জীবে সমদয়া ছিল। অপরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইত। রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অক্লান্তকর্ম্মা গিরিশচন্দ্র জাগিয়া, দয়াল নাম গাহিয়া সেবা করিতেন। যেখানে রোগ সেইখানেই গিরিশচন্দ্র উপস্থিত; কলেরা, বসন্ত, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আরম্ভ হইয়াছে, আত্মীয় স্বজন রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিপন্নের বন্ধু গিরিশচন্দ্র সেখানে মাতার ন্যায় রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। সেবাব্রত সাধনে তিনি অতুলানন্দ লাভ করিতেন। বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামক ভাবে আরম্ভ হয়, কোন হিন্দু ভদ্র লোকের বাটীতে তাহার ভৃত্যের ঐ দারুণ রোগে মৃত্যু হয়। কলেরার নামে তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইত যে ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না, শ্মশানে যাওয়া দূরের কথা। গিরিশ বাবু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, শুনিলেন এক মৃত ব্যক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে দাহ করিবার কেহ নাই। গিরিশচন্দ্র আর কোথায় যান? বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিলেন, "আমি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, শব ছুঁইলে তো কোন দোষ হইবে না?" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন, "দোষ গুণ বিচার এখন থাক, শব বাড়ী হইতে বাহির হইলেই বাঁচি।" গিরিশচন্দ্র



আচার্য্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

তৎক্ষণাৎ একাকী শব স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইয়া দাহকার্য্য সমাপন করিলেন। এই প্রকারে কত রোগীর সেবা, কত মুমূর্ষুর গতি, কত মৃতের শবদাহ তিনি একাকী করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র যে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহাকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিত মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "তত্ত্বকৌমুদী"তে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একাধারে ছাত্রদিগের শিক্ষক, গুরু ও বন্ধু ছিলেন। ছাত্রদিগের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ স্কুলগৃহের ভিতর আবদ্ধ ছিল না। তিনি অনেক ছাত্রকে নিজগৃহে লইয়া যাইতেন, নানাপ্রকারে তাহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার পত্নীও তাহাদিগকে মাতার ন্যায় যত্ন করিতেন। কেহ কেহ মনোরমা দেবীর নিকট নিয়মিতরূপে পাঠাভ্যাস করিত, কত আব্দার করিত এবং সময় সময় কত বালকোচিত উপদ্রব করিত; গিরিশচন্দ্র নিজ ছাত্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

যে সকল জনহিতকর কার্য্যে গিরিশচন্দ্র দেহের রক্ত জল করিয়াছেন স্ত্রী-শিক্ষা তাঁহার অন্যতম। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি নারীজাতির অধিকার বিষয়ে তাঁহার কেবলমাত্র মতের উদারতা ছিল না, তাহাদিগকে সকল উচ্চাধিকার দিবার জন্য হৃদয়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার দুর্দ্দমনীয় সাহস তাঁহার ছিল। তাঁহার স্ত্রী মনোরমা দেবী প্রথমতঃ সুশিক্ষিতা ছিলেন না, নানা সাধুকার্য্যে ব্যস্ততা এবং দারিদ্র্যজনিত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা দান করিবার অবসর তিনি করিয়া লইয়াছিলেন। মনোরমা দেবী দৈনিক পড়া প্রস্তুত করিতে না পারিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত

হইতেন এবং যে কোন প্রকারেই হউক সময় করিয়া দৈনিক পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইতেন। মনোরমা দেবী পাঠে কোনরূপ অমনোযোগ প্রদর্শন করিলে তিনি অতি অদ্ভুত শাস্তি বিধান করিতেন—স্বয়ং আহার না করিয়া মনোরমা দেবীকে আহার করিতে বাধ্য করিতেন। মনোরমা দেবী স্বহস্ত-প্রস্তুত খাদ্য স্বামীকে ফেলিয়া খাইতে বাধ্য হইয়া যে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেন তাহাই ছিল তাঁহার যথেষ্ট শাস্তি। গিরিশচন্দ্রের এইরূপ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই মনোরমা দেবী, ঢাকা "ইডেন ফিমেল স্কুলের" যশস্বিনী শিক্ষয়িত্রী মনোরমা দেবী, প্রখ্যাতনামা প্রচারিকা মনোরমা দেবী হইতে পারিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবু, দুর্গামোহন বাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্মগণের প্রযত্নে ১৮৬৭ সালে বিবাহিতা মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য একটী স্কুল স্থাপিত হয়। তৎকালীন জজ সাহেবের পত্নী মিসেস বেলফুর সাগ্রহে ইংরাজি ও সেলাই শিক্ষার সহায়তা করিতেন। ১৮৭১ সালে ইঁহাদের উৎসাহে স্ত্রী-জাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা (Female Improvement Association) স্থাপিত হয়। এই সভা বহুদিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা—গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সময়ে গিরিশচন্দ্র অদম্য উৎসাহ ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়সহকারে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে যোগ দিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া, মহিলাগণকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া, অলস আলাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, লেখাপড়া, সেলাই, রন্ধন ও সঙ্গীত শিক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে স্বর্গীয় রাখাল বাবু, দুর্গামোহন বাবু, সর্ব্বানন্দ বাবু, জগৎ বাবু, হরকান্ত বাবু প্রভৃতির বাড়ীর মহিলাদিগকে ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী ও শাশুড়ী মহাশয়াদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। গিরিশচন্দ্রের আর্থিক

অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া তাঁহার অবস্থাপন্ন বন্ধুগণ তাঁহাকে মহিলাগণের শিক্ষাদানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি স্ত্রী-শিক্ষা দিয়া অর্থগ্রহণ করিবেন না। স্ত্রী-শিক্ষা কার্য্যে গিরিশচন্দ্র কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বীয় কন্যাগণকে কলেজের উচ্চ শিক্ষা দিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই, কিন্তু তাঁহার অবস্থানুসারে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাঁহার সযত্নরোপিত স্ত্রী-শিক্ষালতা যে সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সার্থকশ্রম হইয়া গিয়াছেন। স্বীয় দৌহিত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেছেন দেখিয়া তিনি কত আনন্দ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

লোক সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে নিগড় একবার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আর কদাচ পায়ে তুলিয়া লন নাই। জীবনের প্রারম্ভে যাহা কুসংস্কার কদাচার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যেও তাহা সেই চক্ষে দেখিতেন। একদিন যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, জীবনে কখনও তাহা আর গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের সমাজ-সংস্কারের দিনে গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—বিবাহে যৌতুক প্রদান কিম্বা গ্রহণ করিবেন না, স্ত্রী কি কন্যাকে অযথা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করিবেন না। তিনি আজীবন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম দুই কন্যার বিবাহের সময় কলিকাতার বহু লোক যৌতুক লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, "আমার কন্যাদ্বয়কে আজ যে যাহা উপহার দিবেন সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি হইবে।" এই কথা শুনিয়া অনেকে যৌতুক প্রদানে বিরত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন ঋষির ন্যায় গিরিশচন্দ্র কর্ম্মকে পূজা জ্ঞান করিতেন। নিষ্কাম-

গিরিশচন্দ্র গৃহের সর্ব্ব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব লইতেন। কাহার কোন্ অভাব, কাহার কি দুঃখ সব মোচন করিবার জন্যই তাঁহার বিশাল হৃদয় ব্যাকুল হইত। তাঁহার দ্বারা পরিবারের কাহারও কোন ক্লেশ না হয় এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। প্রাতে আটটার সময় "ইডেন ফিমেল স্কুলের" গাড়ী আসিবে, প্রত্যুষে উঠিয়া বাজার করিয়া আনিয়া, স্নান আহার করিয়া মনোরমা দেবীকে অবসর করিয়া দিয়াছেন। গাড়ী আসিলে তাঁহার দ্বারে গাড়োয়ানকে যেন এক মিনিটও অপেক্ষা করিতে না হয় ইহা তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কোন দিন ঘটনাক্রমে ৫।৭ মিনিট দেরি হইলে স্কুলের গাড়ী বিদায় করিয়া দিয়াছেন এবং ভিন্ন গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজে স্ত্রী কন্যাকে স্কুলে দিয়া আসিয়াছেন।

দেনাপাওনা সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার আচরণ অতি বিরল। কাহারও এক পয়সা পাওনা থাকিলে তাহাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারিতেন না। ঢাকায় এক গোয়ালা হইতে কিছুদিন দুধ লইয়াছিলেন, বাড়ী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গোয়ালাকেও ছাড়িতে হইয়াছিল। একদিন স্ত্রীর নিকট শুনিলেন গোয়ালার কিছু পাওনা থাকা সম্ভব, অমনি ছুটিয়া গোয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকট তোমার কত পাওনা আছে?" গোয়ালার কিছুই স্মরণ নাই, তিনি তাহাকে ডাকিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন এবং হাতে দশটী টাকা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার প্রাপ্য স্বরূপ তোমাকে এই ১০টী টাকা দিলাম, যদি ইহা অপেক্ষা আমার নিকট তোমার বেশী প্রাপ্য থাকে তবে তুমি আমাকে তাহার জন্য ক্ষমা কর। আর যদি আমি তোমাকে বেশী দিয়া থাকি তজ্জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" গোয়ালা অবাক, অগত্যা প্রণাম করিয়া ঐ টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর শোকে, অটল বিশ্বাসের সহিত পুত্রকে পরম পিতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা গগন ভেদ করিয়া মঙ্গলময়ের চরণোদ্দেশে উত্থিত হইল। মনোরমা দেবী অধীরা হইয়া নিকটে পড়িয়া কাঁদিতেছেন দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা, আজ এই পুত্র-বিয়োগে আমার যতদূর কষ্ট হইতেছে, তাহা অপেক্ষা তোমার অবিশ্বাসজনিত অশ্রুপাত দর্শনে আমি অধিকতর কষ্ট অনুভব করিতেছি।" অমনি গভীর শোকে স্বর্গের সান্ত্বনা অনুভূত হইল, মনোরমা শান্ত হইলেন।

হঠাৎ বিগত ১৩১৯ সনের মাঘ মাসের শেষভাগে তাঁহার Augina রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জামাতা নীলরতন বাবু, বন্ধুবাবু ও অন্যান্য আত্মীয় ডাক্তারগণ তাঁহার জন্য আশঙ্কান্বিত হন। কিন্তু কিছুদিন সুচিকিৎসার পর তিনি পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করেন। গত কার্ত্তিক মাসে আবার ঐ দুষ্ট ব্যাধি অকস্মাৎ আক্রমণ করে। ডাক্তারগণ সর্ব্ব কর্ম্ম হইতে অবসর, সম্পূর্ণ বিশ্রাম ব্যবস্থা করায় তিনি তদবধি সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতেন। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যার সময় একবার বুকে জ্বালা উপস্থিত হইয়া শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১০।১২ মিনিট পরেই আবার রোগের উপশম হয়। রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বসিয়া তিনি নানাবিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে আলাপ করিতেছিলেন। একবার বলিয়াছিলেন "এই বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবশিষ্ট কার্য্য মৃত্যু, এইরূপ এক একটা হিল্লা অবলম্বন করিয়া হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন একমাত্র পরপারের কথা ভিন্ন অন্য কিছু আমার চিন্তায় আসে না।" তখন কে জানিত তাঁহার ভব-লীলা সাঙ্গ হইবার শেষ মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়! ১২॥ ঘটিকার সময় কণ্ঠ যখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল তখন পার্শ্বস্থিতা কম্পমানা পত্নীকে বলিলেন "ভয় নাই, সংসার এইরূপই" নিকটে উপবিষ্ট পুত্রের প্রতি বাহুপ্রসারণ করিয়া অকম্পিত

স্বরে বলিলেন "প্রেমরে, এই বুঝি আমার শেষ ?" যাঁহার বাগ্মীতায় কত শত লোকের হৃদয় বিগলিত হইত সেই বাগ্মীপ্রবরের মর্ত্ত্যলোকে ঐ শেষে কথা।

গ্রাম্যবিবরণ—ঘোষের কোলাপাড়া।

ঘোষের কোলাপাড়া, ভাগ্যকুল হইতে ২½ মাইল পূর্ব্বে এবং শ্রীনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

ঘোষ বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটি কোলাপাড়া নামে অভিহিত হইতেছে, প্রবাদ আছে স্বর্গীয় রামেশ্বর ঘোষ মহাশয় তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে স্নান করার জন্য যশোহর জিলার অধীন বনগাঁ হইতে লাঙ্গলবন্ধ তীর্থে যাইবার সময় পথে বিলপাগলা গ্রামের ঐশ্বর্য্যশালী করবংশের একটি রূপ-লাবণ্যবতী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তিনি সস্ত্রীক দেশে গিয়াছিলেন ; কিন্তু সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় শ্বশুরের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুরুষ দেওয়ান গৌরী প্রসাদ ঘোষ নামে বিদ্বান, পরাক্রমশালী, ধর্ম্মপ্রাণ, জ্ঞানদীপ্ত এক পুরুষের জন্ম হয়। এই দেওয়ান গৌরীপ্রসাদ কাহার দেওয়ান ছিলেন তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাঁহার সময়ের দলিল পত্রের সন তারিখ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় তিনি ঢাকার নবাব মিরজুমলার সমসাময়িক লোক।

এই দেওয়ান গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, ঘোষের কোলাপাড়ার সৃষ্টকর্ত্তা। খুব নিম্ন স্থান বাঁধিয়া গ্রামটী বসাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম ঘোষের কোলাপাড়া রাখা হইয়াছিল। কোল হইতেই কোলাপাড়া নামের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড কাইলানী নামক বিল আছে। এখনও ঐ বিলে বারমাস জল থাকে। গ্রামটি যে এক সময়ে গভীর জলাশয় ছিল ইহা হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সে

যাহা হউক গ্রামটি বসাইতে নানাস্থান হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক আনাইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গোয়াল, কৈবর্ত্ত, ভুঁইমালী, বণিক্য, সাহা, ধোপা, নাপিত, বেলদার, কাচারু প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোক বসাইয়া গ্রামটির সৌষ্ঠব সম্পাদন করা হইয়াছিল। গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করান; এবং প্রচুর নানকার ভূমিদান করিয়া দস্যু, তস্কর হইতে গ্রাম রক্ষার জন্য বেলদারদিগকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

গ্রামের মধ্য দিয়া একটা খাল পশ্চিমদিকের বিল হইতে লৌহজঙ্গ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। 'খরা'র দিনে এই খালে সামান্যমাত্র জল থাকে। তখন নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীনগর হইতে ভাগ্যকুল পর্য্যন্ত লম্বালম্বি একটা প্রশস্ত হাটল গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই হাটলের দক্ষিণ দিক ঘোষের কোলাপাড়া এবং উত্তর দিক উত্তর কোলাপাড়া নামে কথিত হইতেছে। ঘোষের কোলাপাড়ায় হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উত্তর কোলাপাড়ায় কেবল মুসলমানেরই বাস।

এই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কাচারু নামে অভিহিত। মুসলমানদের মধ্যে ইহাদের প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই কাচারুগণ পূর্ব্বে মেয়েদের চুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার আয়েই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু বিদেশীর কৃপায় এ দেশে নানা প্রকার চাক্‌চিক্যশালী চুড়ি ইত্যাদি আমদানী হওয়ায় তাহাদের ব্যবসাটি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কাচারুদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই দূর দেশ হইতে কড়াই ও চিনা বাসনের বিনিময়ে ভাঙ্গা পিতল কাঁসা ও তামার জিনিষপত্র আনিয়া তাহার লাভে অবস্থা অনেক ভাল করিয়াছে। কতক কতক কাচারু তরিতরকারি ও ষ্টেশনারী দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

এটি হিন্দুপ্রধান গ্রাম। ঘোষবংশই সম্মানিত। মুসলমানেরা ঘোষ-

দিগকে ভূঁইয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। হিন্দুর মধ্যে ঘোষবংশ ব্যতীত দুই ঘর গুহবংশ ও ১৫।২০ ঘর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু আছে। এই গুহবংশের মধ্যে স্বর্গীয় দুর্গাচরণ গুহ মহাশয় ঘোষেদের স্থাপিত। অপর গুহ মহাশয়দের বংশ পূর্ব্বে বিলপাগলা ছিল, পরে তাঁহারা ঘোষের কোলাপাড়া আসিয়া বসত করিতেছেন। বিলপাগলা গ্রাম ঘোষের কোলাপাড়ার লাগ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখন ঐ গ্রামে আর হিন্দুর বাস নাই। গুহবংশের মধ্যে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বংশই বিদ্যা ও বড় বড় চাকুরিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সিং ও দত্ত বংশের ব্যবসায়ে আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু গৃহ বিবাদে সিং বংশ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সাহাদের মধ্যে মধুসূদন সাহার নাম উল্লেখযোগ্য, গ্রামের মধ্যে সে-ই প্রধান ধনী। মুসলমানদের মধ্যে সিদ্দিক মুন্সীর বংশই সম্মানিত, মৌলবী রহম্মদ আরবী ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত, ইহাদের বাড়ীর অধিকাংশ ব্যক্তিই পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ ১০।১২ ঘর আছে। পণ্ডিত শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে চক্রবর্ত্তী বংশ ঘোষেদের পুরোহিত এবং স্বর্গীয় পূজ্য পণ্ডিত-প্রবর আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশ ঘোষেদের ইষ্টদেবতার বংশ। ভট্টাচার্য্য বংশ ঘোষের কোলাপাড়া হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই স্থানে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় ইষ্টদেবতা হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন উকিল ব্যতীত আর বড় দরের চাকুরী কেহ করেন না।

গ্রামের মধ্যে একটী হালট ব্যতীত আর কোন ভাল রাস্তা নাই, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কোন দিকে যাইতে হইলে সরু সরু আঁকা বাঁকা হাতালের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে হয়। স্বাস্থ্য ভাল।

আন্দিপুকুরের ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাঁধা পুকুরের জল

গ্রামবাসী অধিকাংশ লোকেই পান করিয়া থাকে। আন্দিপুকুর খুব বড়; ঘোষপাড়ার মধ্যে অবস্থিত; 'উন্নার' দিনেও ইহাতে ১০।১২ হাত জল থাকে। ঘোষের দীঘি প্রায় ½ মাইল স্থান নিয়া বিস্তৃত, এই দীঘি দত্ত, গোপ, সাহা ও কৈবর্ত্তপাড়ার মধ্যে থাকিয়া আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। দীঘিটির বর্ত্তমান অবস্থা ভাল নয়, সংস্কারের অভাবে ভরিয়া উঠিতেছে। গ্রামে দুইটি হাট আছে। সপ্তাহে তিন দিন করিয়া বসে। হাটে আবশ্যকীয় নিত্য-প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকারের জিনিষই আমদানী হইয়া থাকে। হাটের বিক্রেতা প্রায় সকলেই ঘোষের কোলাপাড়ার লোক, গ্রামে কোন বাজার নাই। বাজার না থাকিলেও গ্রামবাসীর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। গ্রামখানাকে একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাজার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রামে প্রায় ১০০ ঘর গোয়াল ও ৮০।৯০ ঘর কৈবর্ত্ত বাস করে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবসায় করিয়া থাকে। রাত দুপ্রহরের সময়ও প্রচুর মৎস্য, দধি, ক্ষীর, তরিতরকারি অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়।

এখানে ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত একটী সার্কেল স্কুল আছে, স্বর্গীয় রাধাকিশোর ঘোষ মহাশয় ইহার স্থাপয়িতা। এক সময় ঢাকা ডিভিসনের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কুল রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরাজি পড়ার উপর লোকের ঝোঁক পড়ায় এবং গ্রামের নিকটবর্ত্তী 'কাজিরপাগলা' একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সার্কেল স্কুল খুব শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কর্ম্মবীর, স্বার্থত্যাগী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সার্কেল স্কুলটির পতনদশা দর্শনে গ্রামের কয়েকটী উৎসাহী কর্ম্মীর সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় তাঁহার বাড়ীর পুকুরের পাড়ে একখানা টিনের ঘরে একটী মাইনর স্কুল বসাইয়াছেন। আনন্দ বাবু এই স্কুলটির জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন

তজ্জন্য গ্রামবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। স্কুলটি নিয়মিতরূপেই চলিতেছে। ইহা ভিন্ন দুইটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। একটি ৪৫ বৎসর যাবত ঘোষপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিদ্যালয়ে একজন গুরু ও একটি শিক্ষয়িত্রী আছেন। অপর বালিকা বিদ্যালয় ৩।৪ বৎসর যাবত ব্রাহ্মণপাড়ায় বসিতেছে; তাহার অবস্থাও বড় ভাল নয়।

ঘোষপাড়া "ফ্রেণ্ড ইউনিয়ন ক্লাব" নামে একটি পাঠাগার আছে। অর্থের অভাবে ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে না। গ্রামের অর্থশালী ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র গ্রাম্য দলাদলি নিয়াই ব্যস্ত। মোকদ্দমায় টাকা জলের ন্যায় নষ্ট করিতেছে। দেশের কাজে তাহারা একেবারেই অন্ধ।

ঘোষপাড়ায় **শ্রীশ্রী৺কাত্যায়নী** একখানা খুব পুরাতন অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দৈনিক মায়ের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পূজার ব্যয়ের জন্য দেবোত্তর ভূমি আছে। কিংবদন্তি আছে রামকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন। নিশার ঝোঁকে অধিবাসের দিন দশহরা মনে করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করেন। ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণ গৌরীপ্রসাদ ঘোষবংশের অমঙ্গল হইবে ভয়ে তাহা নিবারণ কল্পে দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ পিতল মূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺কাত্যায়নী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূজার সময় ও অন্যান্য সময়ে এখানে খুব ধূমধামের সহিত পূজা হইয়া থাকে। ঘোষেদের ইষ্টদেবতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরী ও পুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী ও দৈনিক শ্রীশ্রী৺বধি-মঙ্গলঠাকুরের সেবা হয়। ঘোষবংশ শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরীর অর্চ্চনার জন্য প্রচুর দেবোত্তর ভূমি ইষ্টদেবতাকে দান করিয়াছিলেন।

ঘোষপাড়ায় বহু প্রাচীন বাংলা ইট মাটির নীচে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কালীকিশোর ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণদিকের প্রাচীন বাংলা ইটের ভগ্ন প্রাচীর দেখিবার জিনিষ। এই প্রাচীর কি ভগ্ন অট্টালিকা কে কখন প্রস্তুত করিয়াছিলেন কেহ বলিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে সাড়ে তিন শত বৎসরের বহু প্রাচীন দলিল আছে। স্বর্গীয় ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ৩৬০ বৎসরের দুই খানা দাসখত পাওয়া গিয়াছে, অত্যন্ত পুরাতন ঘোষবংশের এক খানা বংশাবলী আছে। পুস্তকখানা এত পুরাতন যে ধরিয়া উঠাইতে ছিড়িবার আশঙ্কা হয়। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। এই পুস্তকে গ্রামের অনেক পুরাতন কাহিনী আছে।

গ্রাম্যবিবরণ—রাড়িখাল।

রাড়িখাল বা রাঢ়িখাল গ্রাম বিক্রমপুরের উত্তরপশ্চিমাংশে অবস্থিত। পদ্মা নদী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিমে কাঠিয়াপাড়া, নাগরনন্দী, কামারগাঁ ও ভাগ্যকুল; দক্ষিণে কবুতরখোলা, মান্দ্রা, মণিমণ্ডল ও কোনাপাড়া; পূর্ব্বে মাইজপাড়া ও দাম্‌লা এবং উত্তরে আরিয়ল বিল।

এই গ্রাম সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আরিয়ল বিল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। রাড়িখাল গ্রামটী এই বিলের দক্ষিণ তীর বা 'কান্দা'য় বিরাজমান। আরিয়লবিলের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে কল্পনাবলে বলা যায় যে, যে

আরিয়ল বিল।

সময়ে বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল, হয়ত তাহারি কোন অংশ বিলের আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিক্রমপুরে এত বড় বিল আর ছিল না এবং এখনও নাই বলা যাইতে পারে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন পদ্মানদীর দূরত্ব বিল হইতে প্রায় তিন চারি ক্রোশ ছিল, তখন বর্ষাকালে এই বিল অতিক্রম করিতে নৌকার

মাঝিগণকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে সামান্যবাতাসেই নদীর ঢেউয়ের ন্যায় ভীষণভাবে ইহার সারা গায়ে ঢেউ খেলিয়া যাইতে। সে সময়ে এ বিলে বহু ঘটনাও ঘটিয়াছে। তখন এই বিলের নৌকা-চলাচলের পথে (যাহাকে চলিত কথায় 'দাড়া' বলে উহাতে) চৌদ্দ হাত দীর্ঘ লগি ব্যবহার করিতে হইত। দস্যু ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও খুব ছিল। বিলের অধিকাংশস্থলই পূর্ব্বে অনাবাদী অবস্থায় জলজবৃক্ষ ও 'দাম'ভিটে পরিপূর্ণ ছিল। সে সকল জলজবৃক্ষমধ্যে নানাজাতীয় পক্ষী প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সমবেত হইয়া চীৎকার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিত। চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা ঐ সমুদয় জলজবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করিত। এক্ষণে বিলের অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্মানদী ক্রমশঃ বিলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিল ভরাট হইয়া চাষাদের যোগ্য হইয়াছে। পূর্ব্বের ভয়ঙ্কর ভাব আর নাই। এক্ষণে ইহা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শ্যামল-শস্যসম্ভারে পরিশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করে।

রাড়িখাল গ্রামটি বিলের দক্ষিণদিকে অবস্থিত বলিয়া গ্রামের 'হালট' বা প্রধান রাস্তা পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বালম্বি চলিয়া যাওয়ায় গ্রামটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরভাগের বসতি শুধু রাড়িখাল হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকের বাস, কিন্তু দক্ষিণ রাড়িখালে

গ্রাম্য-বিবরণ।

শুধু মুসলমানের বাস। এ গ্রামে এক সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, এখনও আংশিকপরিমাণে আছে। গ্রমের নামের উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ :—এক সময়ে এই গ্রামে 'রাড়ি' নামে এক সম্প্রদায় মুসলমান বাস করিত। তাহারা তীর, ধনু লাঠি, গুল্‌তি, (গুলাইল বাশ) প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র চালনে দক্ষ ছিল। তাহারা অতি পূর্ব্বে কি ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহা জানা যায় না।

রাড়ি বংশের শেষ ব্যক্তি আজিমরাড়ি এই গ্রামের মুন্সীবাড়ীতে বহুকাল সসম্মানে বরকন্দাজের (নিকামানের) কার্য্য করিয়া অল্পকয়েক বৎসর হইল প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার বহু বীরত্বখ্যাতি অদ্যাপি জন-প্রবাদ-পরম্পরায় সঞ্জীবিত। আজিমরাড়ি নিজ হস্তে একটা আমগাছ রোপণ করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল 'রাড়ির' গাছ, সে গাছটিও আর নাই। ঐ গাছটির সঙ্গে সঙ্গে রাড়িবংশের শেষ ব্যক্তির স্মৃতি বিজড়িত ছিল। গ্রামের অবস্থা দৃষ্টে এই বংশ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইহারা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, সাহসী মুসলমান ছিল। বোধ হয় আরিয়ল বিলের প্রান্তদেশে কিছু উচ্চ ভূমি পাইয়া এবং জীবনোপায় সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে অনায়াসলভ্য দেখিয়া প্রথমে এইখানে বসবাস নির্ম্মাণ করে। রাড়িখাল গ্রামের অধিকাংশ ভূমি এখনও তালুক মকিমখাঁ ও তালুক গোরাপিয়ানের অন্তর্গত। ইহা হইতেও এই গ্রামে পূর্ব্বকালে মুসলমান প্রাধান্য থাকা সূচিত হয়। এখনও দক্ষিণ-রাড়িখাল সম্পূর্ণ রূপে মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত এবং উত্তর রাড়িখালের অতি প্রাচীন বসতিভাগ যাহা "বিলপার" নামে খ্যাত তাহাতেও মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের বাস নাই। এই মুসলমানসম্প্রদায় কোন্ কালে কোন্ স্থান হইতে আসিয়া প্রথম এই গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন তাহা বলা কঠিন। এই গ্রামের মুন্সীবাড়ী ও ঘোষদের বাড়ীর মধ্যভাগে একটী গড়ের পঙ্কোদ্ধার করার সময় ৮।১০ হাত নীচে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ মাটীর স্তর দেখা গিয়াছে তাহাতে সুদূর অতীতে এই স্থান যে এক অরণ্যানি ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; নামদৃষ্টে যদিও এখানে একটী খাল থাকা অনুমান হয় কিন্তু এই গ্রামে রীতিমত কোন খাল বর্ত্তমান নাই। গ্রামের উত্তরাংশে মুন্সীবাড়ীর দক্ষিণ ভাগ ও বিল পারের পূর্ব্ব ভাগ দিয়া "নাও দাঁড়া"বলিয়া একটী নৌকা চলাচলের জন্য নিম্নস্থান দৃষ্ট হয় এবং ইহা পূর্ব্বকালে দক্ষিণ-

দিকস্থ উচ্চ ভূমি হইতে বিলাভিমুখে জল নিঃসারণের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বলিয়া অনুমিত হয় এবং খুব সম্ভব তাহাই খাল বিবেচিত হইয়া এবং তাহার সহিত রাঢ়ি-বংশের যোগ হইয়া গ্রামের বর্ত্তমান নামাকরণ হইয়াছে। বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ আমাদের অঞ্চলে কষ্টসাধ্য বলিয়া রাঢ়িখাল এখন রাড়িখাল নাম ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন কালের পত্রাদি ও দলিলে রাড়িখাল অপেক্ষা রাঢ়িখালের ব্যবহারই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই গ্রামে যে মুসলমান সম্প্রদায় বাস করে তাহাদের মধ্যে খাঁ বংশই প্রসিদ্ধ, এবং তাহারা এককালে ভূম্যধিকারী ছিল বলিয়া কথিত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা অধিকাংশই কৃষিজীবি। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কেহ কেহ বা জাহাজে খালাসী বা সারেঙ্গের কাজ করে এবং অতি অল্প সংখ্যক রাজসেবা বা অন্যবিধ চাকুরী করে। এই খাঁ বংশে দক্ষিণ রাড়িখাল নিবাসী মৃত সুজাতালীখাঁ ডিপুটীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশে শিক্ষা অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর মুসলমান এই গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বেলদার মুসলমান; তাহারা মাটীখনন বা কোদালীর কর্ম্ম, শূদ্র, নাপিত, গোয়াল, কৈবর্ত্তদাস, সাহা, ধোপা, নমঃশূদ্র প্রভৃতির বাস দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণবংশমধ্যে রাঢ়ি শ্রোত্রীয় মহিন্তা বংশ প্রাচীন। বৈদিক চক্রবর্ত্তী বংশ এ গ্রামে অতি অল্পদিন যাবত বাস করিতেছে। বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে রামরতন জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে ঢাকার নবাব আবদুল-গণিকে গণনাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নবাব সরকার হইতে বার্ষিক বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ভদ্রকায়স্থ মধ্যে রাড়িখালের দেব-বংশের শেষ ব্যক্তি হরিহরদের মৃত্যুর পর হইতে আর কেহ উক্ত বংশে বর্ত্তমান আছে কি না জানা যায় না। তৎপর দাসবংশ এবং তাহাদের স্থাপিত ঘোষ বংশও কার্য্যকলাপ দ্বারা ক্ষমতাশালী। মিত্রবংশ জনসংখ্যায় কম হইলেও সেই

বংশে দীন দয়াল মুন্সী ও জয়চন্দ্র মিত্র নামে দুই ব্যক্তিই কৃতি ছিলেন। দীনদয়াল মিত্র দিনাজপুর জেলার কালেক্টরীর সেরেস্তাদারের কার্য্য করিয়া এবং জয়চন্দ্র মিত্র আসামে একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের (E.A.C.) কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। উক্ত মিত্রদের সম্পর্কে দত্ত ও দেববংশ গ্রামে বসবাস করেন এবং দেব বংশের সম্পর্কে বসু বংশ পরে এই গ্রামে স্থাপিত হন। ইহা ছাড়া সেন বংশ, গুণ বংশ, গুহবংশ, সরকারবংশ ও বসুবংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বাস করিয়া আসিয়াছেন। দাস বংশের রামতনুদাস একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ সমারোহের সহিত তাঁহার বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্ত্তন হইত ও নানা স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাহাতে যোগদান করিত। দেব বংশীয়েরা রায়োপাধিক এবং সেই বংশের ৺ বৈদ্যনাথ রায় ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং "দেওয়ান বৈদ্যনাথ" নামে তাঁহার নাম ত্রিপুরার "রাজমালা" গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে তৎপুত্র ৺লক্ষ্মীকান্ত রায়ও নিজ বুদ্ধিমত্তাবশতঃ সামান্য নকলনবিশ হইতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং পারস্য ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মুন্সী আখ্যা পান। তাঁহার নামানুসারেই উক্ত দেব বংশের বাড়ী পূর্ব্বোক্ত মুন্সীবাড়ী নামধারণ করিয়াছে, এই গ্রামে উক্ত দেব বংশের আনীত বসু বংশই গ্রামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশে৺ভগবানচন্দ্র বসু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বাধীনচেতা ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ৺ঈশ্বর চন্দ্র বসু বহুকাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন উক্ত ৺ভগবানচন্দ্র বসুর একমাত্র পুত্র অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র নিজ প্রতিভাবলে স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া বিজ্ঞান জগতে অমর হইয়াছেন। * এককালে এই গ্রামে ৭।৮ খানা দুর্গা পূজা

* বিক্রমপুরের ইতিহাসে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে।

হইত। বর্ত্তমানে ৺কালী বসুর বাড়ী ও ৺লক্ষ্মীকান্ত রায়ের বাড়ী ও বৈদিক বাড়ী ছাড়া পূর্ব্বের দুর্গোৎসব সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ঘোষের বাড়ীর রাইমোহন ঘোষ মহাশয় পুনরায় নিজ বাড়ীতে দুর্গোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

এই গ্রামে সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় ও সরকারী সাহায্যে প্রায় ২০ বৎসর যাবত একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় চলিয়া আসিতেছে এবং নানা প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টী গ্রামস্থ দাস পাড়ার দক্ষিণে ৺সিদ্ধেশ্বরীতলায় একটী উন্নত

গ্রাম্য বিদ্যালয়।

প্রশস্ত ভূমিতে টিনের গৃহে স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়ে অনেক আশান্বিত হইয়াছেন। এখানে বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, এই বিদ্যালয় স্থাপন করার সময় শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীকান্ত রায় যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি গ্রামবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহের স্থান এবং পোষ্টাফিশ ও বাজার নির্ম্মাণের স্থান গ্রামের দক্ষিণ ভাগে হালট পাট ৺সিদ্ধেশ্বরী তলায় দান করায় ঐ স্থানের মালিকগণের বিশেষতঃ দাস পরিবারের বদান্যতা সূচিত হইয়াছে। শ্রীনাথ গুণ ও প্যারীমোহন দাস মহাশয়গণের পর্য্যবেক্ষণে স্থানভরট ও গৃহাদিনির্ম্মাণ হওয়ায় তাঁহারাও গ্রামবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। রাড়িখাল গ্রামে মুন্সেফ, ডিপুটী, উকিল, মোক্তার, ইনস্পেক্টর, দারোগা, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বহু রাজকর্ম্মচারী ও জমিদারের কার্য্যকারক, কণ্ট্রাক্টর, ওভারসিয়ার প্রভৃতি আছেন এবং গ্রামে কেহ খুব অবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলেও সুখে হউক দুঃখে হউক সকলেরই এক প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইয়া নিজ নিজ আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।

গ্রামের মধ্যে চলাচলের ভাল রাস্তা নাই এবং গ্রামের দলাদলিও মামলা মোকদ্দমাবশতঃ এই গ্রামের আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। এই গ্রামের স্বাস্থ্য একরূপ মন্দ নয়। পানীয় জলের মধ্যে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীর বাঁধা পুকুরের জল উল্লেখযোগ্য। এই গ্রাম বিলের নিকট অবস্থিত বলিয়া স্থান অত্যন্ত নীচু। বর্ষায় অনেক গৃহস্থের বাটীতে জল উঠে এবং শুক্‌নার দিনে জল সরিয়া গেলে প্রতি বাড়ী সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেক উঁচু বলিয়া এক এক খণ্ড উচ্চ ভূমিস্তূপ বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তি বা মন্দিরাদি নাই এবং উল্লেখযোগ্য কোন মেলাও মিলে না। মুন্সীবাড়ীতে যে একটী প্রাচীন ঠাকুরদালান ছিল তাহারও এখন ভগ্নাবস্থা। ৺সিদ্ধেশ্বরীতলায় যে একটী বটবৃক্ষ আছে তাহার তলভূমি বর্ত্তমানে বাঁধান হইয়াছে। তাহাতে বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য কালে গ্রামবাসীদের ব্যবহারোপযোগী মৎস্য, তরকারী, তৈল, লবণ, মসলা, চিনি, বাতাসা, গুড়, তামাক প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামান্য একটী বাজার বসে মাত্র। কয়েক বৎসর যাবত গ্রামে একটী পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রামের অবস্থা রাস্তাঘাট ও হাট বাজার।

প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে মুন্সীবাড়ীতে একখানি "পদ্মপুরাণ" পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ কাহারও নিকট থাকা জানা যায় নাই। এই গ্রাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া ইহাতে কোন প্রাচীন কীর্ত্তি দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন পুথি।

গ্রাম্য বিবরণ—পাঐলদিয়া

শুধু বিক্রমপুরে কেন—সমগ্র বঙ্গজ কায়স্থসমাজের নিকটই "পাঐলদিয়া" বিক্রমপুর কায়স্থ কুলীন সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থান বলিয়া

সুপরিচিত। ইহা ঢাকা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে 'ধলেশ্বরী'র পশ্চিম এবং 'ইচ্ছামতী'র দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। রাজা রাজবল্লভের বিখ্যাত "তালতলার খাল" ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

গ্রাম্য বিবরণ।

এই অভিনব অদ্ভুত নামের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান-যোগ্য; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই উহার কোন সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন দলিলাদিতেও ইহার নাম "পাওলদিয়া" দেখা যায়।

এ গ্রামের ঘোষবংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী। ইহাঁদেরই সমবায়ে বিক্রমপুরের "সাড়ে তিন ঘর" কায়স্থ কুলীনসমাজ গঠিত। এখানে সমাজ সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই প্রায় ব্রাহ্মণগণ সমাজপতি; কিন্তু পাওলদিয়া ঘোষবংশ ও মালখাঁনগরের বসু-বংশই তাহাদের স্ব স্ব সমাজপতি। ইহা হইতেই বিক্রমপুর কায়স্থ কুলীন মহাশয়দিগের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অনুমিত হইতে পারে।

কাণ্যকুব্জাগত কায়স্থ শিরোমণি মহাত্মা মকরন্দ ঘোষ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ রামচন্দ্র ঘোষই বর্ত্তমান পাঐলদিয়া ঘোষ-বংশের আদি পুরুষ। ইনি ঠিক্ কোন্ সনে পাঐলদিয়া আগমন করেন তাহা জানা যায় না, কিন্তু ইনি যে বাং ১০৮৭ সালের কিছুকাল পরে ঢাকার তদানীন্তন নবাব সরকারে কার্য্যগ্রহণান্তর শুভ্র-সলিলা 'ধলেশ্বরী" ও "ইচ্ছামতী" পরিবেষ্টিতা "পাঐলদিয়া"র নিস্তব্ধ প্রান্তরে সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা স্বাস্থ্য গৌরবে সমাকৃষ্ট হইয়া এখানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। রামচন্দ্র ঘোষঠাকুর মহাশয় আসিবার পূর্ব্বে বোধ হয় এখানে কোন বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী ছিল না, তিনিই প্রথমে এখানে বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক বহু কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ স্থাপিত করতঃ পাওলদিয়া সমাজ গঠিত করেন। গ্রামে রাস্তাঘাটেরও তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়া-

ছিলেন। এখনও গ্রামে নবাবি আমলের বড় বড় দুইটি রাস্তার চিহ্ন দেখা যায়, এ রাস্তাগুলি ৫০।৬০ হাত প্রশস্ত ছিল ও 'দরজা' নামে অভিহিত হইত। প্রবাদ শুনা যায় যে এ সকল 'দরজা' নবাবের ফৌজ যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও এ সকল দরজার প্রশস্ততা প্রায় ৩০।৩৫ হাত দেখা যাইত, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বুভুক্ষু কৃষককুলের অনুগ্রহে দরজার অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ২০ হইতে স্থানে স্থানে ৪।৫ হাত সংকীর্ণতা লাভ করিয়াছে।

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিবস হইতে ক্রমাগত তিন দিন এখানে দুইটি 'গলইয়া'র মেলা হয়। গ্রামটী প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে যে মেলা হয় তাহা মেলাস্থাপয়িতার নামানুযায়ী "লক্ষ্মীঘোষের মেলা" বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম ভাগের মেলাটি "সুবচনীর মেলা" বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ আছে, ইহাকে সর্ব্বসাধারণ "সুবচনী" বলিয়া বলে ও অনেকে এই গাছটিকে তেল সিন্দুর দিয়া পূজাও করিয়া থাকে। ইহা হইতেই এই স্থানটির নাম "সুবচনী-তলা" ও মেলার নাম "সুবচনীর মেলা" হইয়াছে।

মেলা।

এই সকল মেলা হইতে গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ধনিয়া, সরিষা প্রভৃতি মসল্লা সংগ্রহ করিয়া রাখে। এ সকল মেলা-উপলক্ষে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। 'কবি' বা 'জারি' গান ব্যতীত নানাবিধ হাস্যোদ্দীপক সাজসজ্জা এবং "বাইদার গান" নিম্নশ্রেণীস্থগণের অতীব প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রামে একটী পোষ্টাফিস, একটি মাইনর স্কুল, দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (এখানে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে)

ও মুসলমান বালকগণের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র মক্তব আছে। শেষোক্ত মক্তবটিতে ইংরেজী, বাঙ্গালা, পারসী এ তিনটি ভাষাই সামান্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মালখাঁ-নগরের স্কুল কেবল মাত্র এক মাইল ব্যবধান বলিয়া এখানে কোন স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা নাই। নিম্নশ্রেণীস্থ দরিদ্র মুসলমানগণও স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একটু একটু উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মক্তবে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

মক্তব, বিদ্যালয় ইত্যাদি।

এ গ্রামে তিনটি মঠ আছে। ইহাদের সকলটিই আধুনিক, কোনটিই ৫০।৬০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আখ্‌রা বা (আশ্রম) আছে। আখ্‌রাতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপিত, দৈনিক পূজা হয়, এবং পর্ব্বোপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হয়।

মঠ, মন্দির, দেবমূর্ত্তি।

৺রামকানাই ঘোষঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে একটী "নাককাটা বাসুদেবের" প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা যায়, উহা প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বহির্ব্বাটীর দীর্ঘিকা খনন কালে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের শতবর্ষ বয়োধিকা মাতা ঠাকুরাণীর প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার দিদি শ্বাশুড়ী, ৺গদাধর ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী, পুণ্যশ্লোকা সতী "অভয়া" দেবী তাঁহার পতির সহিত আনুমানিক বাঙ্গালা ১১৫৭ সালে (ইং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে) সহমৃতা হন। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার ধাই শ্বাশুড়ী প্রচলিত প্রথানুযায়ী সতীর শ্মশানোপরি 'বটাশ্বত্থ বিবাহ' প্রদান করতঃ সতীর সম্মাননা করেন। সেই 'বটাশ্বত্থ' দম্পতীও প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত নীরব ভক্তিভরে সগৌরবে উন্নত মস্তকে 'সতী'র গৌরব গাঁথা দিগ্‌দিগন্তে

পরিব্যাপ্ত করিয়া অবশেষে বিগত বাং ১৩০০ সনে সর্ব্ববিধ্বংসী কালের করাল কবলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহার পর সেই স্থানের চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। তবে সেই বটাশ্বত্থ বিটপীতলে সতী 'অভয়া'র উদ্দেশে ভক্তি নম্র হৃদয়ে গ্রাম্য সতীগণ এতকালাবধি পূজা প্রদান করিতেন বলিয়া সেই স্থানটি বহু দিন যাবত "কুলাইতলা" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

গ্রামটি নদীতীরবর্ত্তী। কলিকাতা, ঢাকাও অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। এখান হইতে প্রত্যহ দুইবার ষ্টীমারে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যায়। গ্রামটী বৃহৎ না হইলেও এখানে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট। বর্ত্তমানে এই গ্রামে দুইজন "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন ঢাকার নবাব পরিবারের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর বাহাদুর, অপর কুমিল্লার সুবিখ্যাত গভর্মেণ্টের উকিল বর্ত্তমানে ঢাকার উকীল রায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ ঠাকুর বাহাদুর। শশাঙ্কবাবু অতি সদাশয়, চরিত্রবান এবং মহানুভব ব্যক্তি।

গ্রাম্য বিবরণ—সিংপাড়া।

সিংপাড়া বা সিংহপাড়া বিক্রমপুরের মধ্যে একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা শ্রীনগর থানার তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কেন যে এ গ্রামের এইরূপ অদ্ভুত নামাকরণ হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কিংবদন্তী এইরূপ এখানে 'সিংহ' উপাধিধারী কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার প্রতাপে "বাঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাইত"। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বকালে এখানে অনেক হিংস্র জন্তু বাস করিত। এখন তাহার কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

এই গ্রামের লোকসংখ্যা বিগত লোকগণনায় দেখা যায় আড়াই হাজারেরও অধিক। অর্দ্ধেকের বেশীই মুসলমান। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র,

স্বর্ণবণিক্য, মালাকার, কুম্ভকার, ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, বারুই ইত্যাদি অনেক জাতিয় লোক বাস করে। এই গ্রামের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে "লস্কর" ও "ঘটক" বংশই সুবিখ্যাত। এক সময়ে ইঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন কেবল ইঁহাদের পূর্ব্বনামই ইঁহাদের অস্তিত্ব জানাইয়া দিতেছে। এখনো অনেকে এই গ্রামকে "ঘটকের কোলা" বলিয়া থাকে। কুলীন ব্রাহ্মণ এই গ্রামে অতি বিরল। যে কয় ঘর আছেন তাঁহারাও হয় "ঘটক" না হয় "লস্কর" বংশের স্থাপিত কুলীন। কায়স্থদিগের মধ্যে ৺অক্ষয়কুমার বসু মহোদয়ের নাম প্রায় প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীই জানেন। কেন না, মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তাটী আছে, তিনিই তাহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া মধ্যবিক্রমপুরবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

এই গ্রাম ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত; কতকটা অংশ উত্তর দিকেও পড়িয়াছে। রাস্তার পার্শ্বেই অনতিপ্রশস্ত খাল। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই খাল দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে। ইহা ব্যতীত গ্রামে অন্য কোন প্রশস্ত রাস্তা নাই। বড় রাস্তাটী বর্ষাকালে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে পথিকের বিশেষ অসুবিধা হয়। ভরা বর্ষার সময় স্থানে স্থানে রাস্তার উপরও জল উঠে। পুলগুলি সংস্কার অভাবে জীর্ণ শীর্ণ। একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলে কাহারো বাড়ীর সম্মুখ দিয়া কাহারো বাড়ীর পেছন দিক দিয়া যাইতে হয়। গ্রাম্য রাস্তা অপ্রশস্ত ও আকাবাঁকা। তদ্দ্বারাই লোকে চলাফেরা করে। গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কতকগুলি ক্ষেতের পরই মুসলমান পল্লী। অধিকাংশই দীন দরিদ্র, "দিন আনে দিন খায়" গোছের। গ্রামের পশ্চিম

প্রান্তে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বেই বাজার অবস্থিত। বাজারের উত্তর দিকে একটি অনতিদীর্ঘ পুষ্করিণী। ইহার উত্তর পারেই "বেলতলী গঙ্গা-প্রসাদ জগন্নাথ" উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টী গত ১৯০১ খ্রীঃ বেলতলী নিবাসী শ্রীযুক্তবিনোদবিহারী পাল মহোদয় প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বিগত ১৯১১ খ্রীঃ অগ্নি-সংযোগে এই স্কুলের যাবতীয় আসবাব পত্র ও সৌন্দর্য্য ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে এই বিদ্যালয় ইষ্টক নির্ম্মিত হওয়ার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তম ফল হইয়া থাকে। বিনোদ বাবুর স্কুলটীর উন্নতিকল্পে, স্বার্থত্যাগ ও অর্থব্যয় বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কোন কোন স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। তাহাতে নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য, মিঠাই, ধনিয়া, সরিষা প্রভৃতি মসল্লা বিক্রীত হয়। এই সময় প্রত্যেক পল্লীবাসী বৎসরের জন্য মসল্লা কিনিয়া রাখে। কোন কোন মেলায় নানা কৌতুকজনক তামাসা, বহুরূপী ইত্যাদি আইসে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সাহায্যে একটী বালকবালিকা বিদ্যালয় চলিতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করিতে গ্রামস্থ ভদ্রমহোদয়গণ একেবারে উদাসীন। সুযোগ্য শিক্ষক মহাশয়, সাদাসিদা, সে কালের লোক। এই বিদ্যালয়ের আয় হইতেই পরিবারের ভরণপোষণ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ২০।২৫ টীর অধিক নহে, ছাত্রী সংখ্যাও ১০।১২ টীর অধিক নহে। দেশবাসী ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত বাজারে একটি পাঠশালা আছে, কাহারো অধীন নহে। ছাত্র সংখ্যা ৪০।৫০ হইবে। ছাত্র বেতন হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।

বাজারে চাউল, ডাল, মৎস্য, দুগ্ধ, তরকারী প্রভৃতি গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই প্রতিদিন ভোর ৭ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত পাওয়া

যায়। দুইখানা মিঠাইয়ের দোকান, দুইখানা কাপড়ের দোকান, চারিখানা ষ্টেশনারী দোকান, ৮।৯ খানা মুদী দোকান, দুইখানা দর্জ্জীর দোকান আছে। সর্ব্বদাই এই সকল দোকান হইতে দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

এখানে চিকিৎসকের একান্ত অভাব। বাজারে তিনটী ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। একটির অবস্থা উন্নত। একজন গভর্ণমেণ্ট পাশকরা ডাক্তার আছেন। ডাক্তারত্রয়ের কেহই গ্রামবাসী না হইলেও নিকটবর্ত্তী গ্রামের। গ্রামের অনতিদূরে বেলতলী গ্রামে কয়েকটী সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আছেন। গ্রামের স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নহে। তবে কোন কোন সময় কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। উহার প্রধান কারণ উত্তম পানীয় জলের অভাব।

এই গ্রামে সাধারণের পাঠের জন্য কোন পাঠাগার নাই। একবার কতিপয় যুবকের উদ্যমে একটী ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই জলবুদ্বুদের ন্যায় নষ্ট হইয়া গেল। একটি পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে রাস্তার অনতিদূরে ৺অক্ষয়কুমার বসু মহাশয়ের বাড়ীতে "কোলা" সব পোষ্টআফিশ ও টেলিগ্রাম আফিশ অবস্থিত। অনেক দিন হইতেই এই পোষ্ট আফিশটীকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব চলিতেছে।

গ্রামে ভদ্র-পল্লীতে ৫।৬টীর অধিক ভাল পুষ্করিণী নাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটী কি দুইটা পুকুর আছে, যাহা সংস্কার করিলে গ্রামের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। দলাদলি, ঝগড়া কলহ লইয়াই সকলে বিব্রত,—গ্রামের কিসে উপকার হইবে, না হইবে সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। অথচ প্রতিবৎসরই সামান্য সামান্য ঘটনায় উকীল মোক্তারকে অর্থশালী করা হয়। যেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিবাদ মীমাংসা করিতেন

এখন সে স্থান বিচারালয় অধিকার করিয়াছেন! গ্রামে "প্রকৃত শিক্ষিত" লোকের একান্ত অভাব। মুসলমান পল্লীতে একটি মাত্র পুকুর আছে, এতদ্ব্যতীত ডোবার অপরিস্কৃত জল পান করিয়া বৎসর বৎসর বহু লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

এই গ্রামের ৺শ্রীকান্ত লস্কর মহাশয়ের পুষ্করিণীর দক্ষিণ পূর্ব্ব পারে এক অত্যুচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষ সমুন্নত দেহে অতীত কালের কত স্মৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। এই বৃক্ষে ৺শ্রীশ্রীকালীমাতা অধিষ্ঠিতা। দেবী বড় জাগ্রতা। নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক প্রায়ই ছাগবলি দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক শনিবার, হিন্দুললনাগণ এখানে তেল সিন্দূর দেন। অধিকারী বাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর যুগলমূর্ত্তি অনেক দিন হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৺শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণ-বণিকগণ রাস-পূর্ণিমায় 'রাসলীলা' করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে অনেক ব্যয় হইত। গ্রামে কয়েক বাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

গ্রাম্য বিবরণ—কান্দাপাড়া।

চতুঃসীমা —এই গ্রামের উত্তর সীমানা দ্বিপাড়া, পূর্ব্ব সীমানা চাঙ্গরী, পশ্চিম সীমানা কাইচাইল, এবং দক্ষিণ সীমানা আউটসাহী।

আয়তন ও লোকসংখ্যা—ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে এক মাইলের উপর এবং উত্তর দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইলের উপর। অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু মুসলমানে ন্যূনাধিক এক সহস্র হইবে।

পূর্ব্বে এই গ্রামে মুসলমান, বারুজীবি, কুম্ভকার ও নমঃশূদ্র ব্যতীত কোন ভদ্রলোক ছিলনা। বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সনের শ্রাবণ মাসে পদ্মা তীরবর্ত্তী তারপাশা গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় তথাকার স্বনামপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়

পরিবার এই গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছেন। তারপাশার সুবিখ্যাত মহাশয়বংশ ও এই গ্রামে উঠিয়া আসিয়াছেন। তদবধি এই গ্রাম বিক্রমপুরের কুলীন সমাজে বিশেষ পরিচিত।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ প্রায় ৩৫ ঘর হইবে। পূর্ব্বে আরও ৭।৮ ঘর বেশী ছিল। অবস্থাহীন হওয়ায় তাঁহারা অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই প্রসিদ্ধ ফুলিয়ামেলের কুলীন। শ্রোত্রী বংশজ ৭।৮ ঘর হইবে।

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মুখোপাধ্যায়গণই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। মুখোপাধ্যায়গণ তিন ভাগে বিভক্ত :—১। ৺কৃষ্ণকিশোরের সন্তান ২। ৺বৃন্দাবনের সন্তান ৩। ৺শিবপ্রসাদের সন্তান।

৺কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়ের বংশে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা-ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। ৺রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক এবং কবি ছিলেন। কুলীনসমাজে বহু বিবাহ নিবারণ এবং মেলবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য এবং শ্রোত্রীয় ও বংশজগণ মধ্যে কন্যাপণ নিবারণ জন্য ইহার প্রাণপণ এবং আজীবন চেষ্টা সর্ব্বসাধারণের এবং গভর্মেণ্টেরও অবিদিত নাই। ইহার কৃত "সীতারবনবাস" পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল এবং "বিদ্যাবিধি" ও "শৈশবজ্ঞানচন্দ্রিকা" উচ্চ প্রাইমেরীর পাঠ্য ছিল। তদ্ব্যতীত ইহার "কুলীন-কীর্ত্তন" "বিবিধ সঙ্গীত" এবং "রমণীরমণ" নামক কাব্যপুস্তিকা ও সর্ব্বজন বিদিত। *

২। ৺চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন সবজজ ছিলেন এবং মাতামহ বাড়ী রামভদ্রপুরে বাস করিতেন।

* "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" ইঁহার বিস্তারিত জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি বর্ত্তমানে আলিপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টার।

৪। শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি রাজসাহী নওগাঁয়ে সরকারী ডাক্তার।

৺বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বংশে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছেন :—

১। ৺মদনমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন কবি ছিলেন। ইহার কৃত "জ্ঞানদীপিকা" "কবিতা-কলাপ" 'কবিতা-চন্দ্রিকা' "ব্রুটাস্ ও এণ্টানিওর বক্তৃতা" "মহাশক্তির নির্ম্মাল্য" প্রভৃতি পুস্তক তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

২। ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি, এ,। ইনি সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন এবং "সমুত্থান" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনি কিছুকাল কলিকাতা বেঙ্গল প্রেসের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকীল এম, এ ও শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ মহাশয়দ্বয়ের সহযোগী ছিলেন।

৩। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। ইনি ভাওয়ালের রাজ-জামাতা এবং বর্ত্তমানে জয়দেবপুরনিবাসী হইয়াছেন।

৪। ৺গুরুতারণ মুখোপাধ্যায়—ইনি "বাল্মিবধ" নামক কাব্য প্রণেতা।

৫। ৺অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়—ইনি "নলদময়ন্তী" এবং "সচিত্র রাজস্থান" প্রণেতা।

৺শিবপ্রসাদের বংশে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছেন :—

১। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এ বরিশালের পুলিশের ডিষ্ট্রীক্‌ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ইনি বর্ত্তমানে নিকটবর্ত্তী কাইচাইল গ্রামে বাস করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত 'ইন্দুমতী' কাব্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায়মহাশয় সাহিত্যার্ণব, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺বলরাম ঘটক, ৺নবীন বিদ্যারত্ন, ৺অমরচাঁদ কবিরত্ন, ৺প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা এবং সামাজিক ব্যক্তি এই গ্রামের অধিবাসী।

ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অপর সকল জাতিই প্রায় নিরক্ষর। ৩।৪ ঘর ব্যতীত প্রায় সকলেরই আর্থিক অবস্থা খারাপ। মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অধিকাংশেরই অবস্থা শোচনীয়। বারুইগণ কৃষিকার্য্য করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থায় আছে।

ব্যবসায় বাণিজ্য—নিকটবর্ত্তী কুণ্ডেরবাজারেই গ্রামবাসিগণের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিষাদি ও মৎস্য তরকারী দুগ্ধ ইত্যাদি পাওয়া যায়। নিত্য প্রভাতে বাজার বসে। সোম ও শুক্রবারে হাট বসে। কুণ্ডেরবাজারে বহু পাটের আফিস বসিয়াছে।

রাস্তাঘাট—খুব উল্লেখযোগ্য রাস্তা গ্রামে না থাকিলেও চলাচলের বিশেষ অসুবিধা নাই।

শিক্ষা—এই গ্রামে পূর্ব্বে এক মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। ৺মদন-মোহন মুখোপাধ্যায় উহার সেক্রেটারী ও ৺কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সহকারী শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিশ্বাস হেড পণ্ডিত ছিলেন, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন দ্বিতীয় পণ্ডিত। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০ দেড়শত ছিল। তখন পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রাম সমূহের ছাত্রগণ এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিত, কালে গ্রাম্য দলা-দলির ফলে উহা উঠিয়া যায়। গ্রামের বালকগণ এখন সন্নিকটবর্ত্তী মালখাঁ-নগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে গ্রেজুয়েট ও আণ্ডার গ্রেজুয়েটের সংখ্যা ১৪। সভা ও পুস্তকাগার ৺মদনমোহন

মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় "সুহৃদ সম্মিলন সভা" নামে একটী সভা এই গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে ঐ সভার অধিবেশন হইত। সভায় বালকগণ নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিত। ৺মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সকলের সাহায্যে একটী পুস্তকাগারও ছিল। যমদণ্ডে ও গ্রাম্য দলাদলি সূত্রে সকলই এখন লোপ পাইয়াছে। উক্ত সভার অর্থে ৺প্রসন্ন-কুমার চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় গ্রামে একটী রাস্তা বাঁধান হইয়াছিল।

চিকিৎসা—গ্রামে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দুইজন এবং এলোপ্যাথ ডাক্তার সংখ্যায় তিন জন। তন্মধ্যে একজন গ্রামে থাকিয়া চিকিৎসা পত্র করিতেছেন। শ্রীযুক্তা প্রসন্নকুমারী দেবী বিনা পারিশ্রমিকে 'কামলা' রোগের চিকিৎসা করেন। গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু রোগী তাঁহার চিকিৎসায় প্রতিকার লাভ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য—গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। গত ২০ বৎসরের মধ্যে মাত্র দুই বার কলেরা ব্যারামে কতক লোক মারা গিয়াছে।

পুষ্করিণী—এই গ্রামে পুষ্করিণীরসংখ্যা খুব কম। গ্রামবাসিগণের জলাভাব অত্যন্ত বেশী।

দেবালয়—এই গ্রামে শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ তর্করত্নের বাড়ীতে ৺মনসাদেবী ও ৺ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ৺ চণ্ডিকা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই চণ্ডিকাদেবী শতাধিক বৎসর যাবত প্রতিষ্ঠিতা ও ইহার মাহাত্ম্য খুব বেশী। যখনই বাটীস্থ জনগণের কোন ঘোর বিপদ উপস্থিত হয় তাহাদের পূর্ব্বে এই দেবীর ঘট ঘামিয়া অজস্র জলধারা পড়িতে থাকে। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় একবার এই ঘট বিসর্জ্জন করায় তাঁহার বহু বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। পরে গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৩২শে আষাঢ় বহু অর্থ ব্যয়ে উক্ত চণ্ডীকা দেবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই দুই স্থানেই নিত্য পূজা হয়।

তদ্ভিন্ন দুর্গোৎসবের সময় এবং বিবাহ উপনয়ন ও অন্নারম্ভের সময় দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা হয়।

মেলা—এই গ্রামে শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণে প্রতি বৎসর একটী মেলা বসিত। এখন উক্ত মেলার সন্নিকটবর্ত্তী কুণ্ডের বাজারে বসিয়া থাকে। ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য কুণ্ড পরিবারের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের স্থাপিত বলিয়া এই বাজারের নাম হইয়াছে "কুণ্ডের বাজার"। হরেন্দ্র বাবুই এই গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার। তাঁহার পূর্ব্বে এই গ্রাম মালখাঁনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বসুর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল।

গ্রাম্য বিবরণ—পশ্চিমপাড়া।

পশ্চিমপাড়া গ্রামখানি আয়তনে ক্ষুদ্র; ইহার জনসংখ্যাও কম—দেড় হাজারের অনূর্দ্ধ; তথাপি শিক্ষা-দীক্ষায় এবং জ্ঞানগরিমায় পশ্চিমপাড়া বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান গ্রামগুলির সমকক্ষ। কোন কোন বিষয়ে গ্রামখানি বেশ উন্নত।

বিক্রমপুরের কি ছোট, কি বড়, সকল স্থানেরই অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাস 'যথার্থরূপে' উদ্ধার করা যেমন তেমন কথা নয়। গবেষণা এবং পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যা'কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহাও সামান্য মাত্র। পশ্চিমপাড়া গ্রামের পক্ষেও ঐ রকম কথা বলা যাইতে পারে, বিশেষতঃ এখানে এমন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি নাই যাঁহার নিকট হইতে এস্থানের অতীত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বের গ্রামের ইতিহাস স্পষ্টরূপে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। ইহার পরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা আমরা শুনিতে পাই তাহা হইতে বুঝা যায় যে একসময়ে—যখন মুখোটী, ভট্টাচার্য্য এবং চাটুয্যেদের

প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, যখন মুখোটীদের কার্য্যকলাপের জন্ত পশ্চিমপাড়া, মুখোটীর পশ্চিমপাড়া আখ্যায় অভিহিত হইত তখন এই ক্ষুদ্র পশ্চিম-পাড়া বিক্রমপুরের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ গ্রাম ছিল। কিন্তু এখন আর পশ্চিমপাড়ার অবস্থা সেরূপ নাই।

প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ এগ্রামে বিশেষ কিছুই নাই। বর্ত্তমানে মুখোটী বাড়ীতে একটী ধ্বংসোন্মুখ শিব-মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী পুরাতন বটে। দেবালয়টী অনুমান দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহা ৺ জগন্নাথ মুখোটীর শ্মশানোপরি অবস্থিত। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জগন্নাথ তৎপুত্র গৌরসুন্দর এবং রামনিধির নিকটে তদীয় শ্মশানের উপর একখানি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতার অন্তিম অনুরোধ স্মরণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার শ্মশানের উপর এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহাই পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দির। দুঃখের বিষয় মন্দিরটী এখন ধ্বংসের দিকে—আর যে বেশী দিন টিকিবে এমন বোধ হয় না। একসময়ে মন্দিরটী বেশ সুন্দর ছিল। মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা (বর্ত্তমানে যেখানে সড়ক) দিয়া যাহারা যাতায়াত করিতেন তাহারা ইহার কারুকার্য্যের প্রশংসা না করিয়া যাইতেন না। মন্দিরের ভিতর একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মুখোটী বাড়ীর ভিতরকার দোতালা দালান খানিও খুব পুরাতন ইহা প্রাগুক্ত শিবমন্দিরের সমসাময়িক—নির্ম্মাতা পূর্ব্বোক্ত রামনিধি মুখোটী। ইহাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে ইহার সংস্কার হইয়াছে। সংস্কার হইবার পর হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ উপরের তলায় নীত হইয়াছেন। এই লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহটী বেশ প্রত্যক্ষের।

গ্রামের অপর একটী শিববন্দির দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা তত প্রাচীন নহে। এই গ্রামস্থ মুখোটী বাড়ী যে একসময়ে কিরূপ জনপূর্ণ ছিল

পারা যায়। প্রাচীন গাছের মধ্যে গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটা বটগাছ এবং মুখোটী বাড়ীর একটা নিমগাছ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে তাহারা ছেলেবেলা হইতে এই গাছ দুইটাকে এক রকমই দেখিতেছেন—বিগত ৮০।৯০ বৎসরের ভিতর ইহাদের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সকলেই জানেন যে বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া দুইটী। একটী পয়সাগাঁর —নিকটবর্ত্তী—লোকে তাহাকে বলে 'পয়সা পশ্চিমপাড়া' আর অপরটী জৈনসার এবং ভবানীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত বিধায় লোকে 'বলে 'জৈনসার-পশ্চিমপাড়া' বা 'ভবানীপুর-পশ্চিমপাড়া'। এ গ্রাম 'জৈনসার পশ্চিমপাড়া' নামে খ্যাত।

গ্রামের অদূরে—দক্ষিণে প্রসিদ্ধ পোড়াগঙ্গার খাল। খালের একটী শাখা এই গ্রামের ভিতর দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় নৌকাদি এই খাল দিয়াই যাতায়াত করে। খালের অনেক স্থান হিজল আর বউয়া (বরুণ) বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। 'গতিকে গতিকে' দুই একটা 'বড়' নৌকা এই খালে আসিয়া পড়িলে চালাইয়া নিতে মাঝিদিগকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে কাঁঠালতলী এবং প্রসিদ্ধ জৈনসার গ্রাম। উত্তরসীমায় খিলগাঁ এবং সুজানগর নামক দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত; পশ্চিমে নওপাড়া। ভবানীপুর পশ্চিমপাড়ার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এই গ্রামের সীমা বলিবার সময় ইহাও বলা আবশ্যক যে গ্রামের সকল দিকেই উন্মুক্ত ময়দান। এই সমস্ত গ্রামগুলি ময়দানের পারে।

গ্রামের নাম পশ্চিমপাড়া কেন হইল, এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী মাত্র সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। প্রবাদটী এই :—পূর্ব্বে কখন—তা' বলা যায় না—পশ্চিমপাড়া মালপদিয়া

নামক গ্রামের অংশ বা পাড়া ছিল। গ্রামের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন মালপদিয়া অতি বিস্তৃত গ্রাম ছিল। কালক্রমে কোনও কারণে উহার পাড়াগুলি এক একটা গ্রাম বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে। এই জন্যই পশ্চিম সীমায় পাড়া বলিয়া গ্রামের নাম হইয়াছে "পশ্চিমপাড়া"। প্রবাদের যাথার্থ প্রমাণের জন্য আজও ধারে পাশে মধ্যপাড়া (গ্রামের মধ্য স্থানের পাড়া), ধারপাড়া (একধারে অবস্থিত যে পাড়া) প্রভৃতি 'পাড়া' অন্ত গ্রামগুলি বর্ত্তমান আছে।

মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর যে রাস্তা (সড়ক) চলিয়া গিয়াছে, তাহার একটী প্রশাখা গ্রাম খানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগটা দক্ষিণ ভাগ হইতে সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়; কারণ দক্ষিণ-পাড়ায় কোন পুরাতন ইষ্টকালয় অথবা কোন পুরাণো গাছ দেখা যায় না; আর পুষ্করিণী খননকালে এমনভাবে বালি উঠিতে থাকে যে তাহাতে পুকুর কাটান পণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়। শেষোক্ত কারণ দৃষ্টে বুঝা যায় যে দক্ষিণ পাড়ার নিকট দিয়া কোনও নদী প্রবাহিত হইত। এই নদী অন্য কোন নদী নহে—পোড়াগঙ্গা বলিয়া যে নদীর কথা শুনা যায় উহাই বোধ হয় সেই নদী। একটা কারণ হইতে এ ধারণা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কারণ এই যে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে এবং গ্রামের (পশ্চিমপাড়ার) দক্ষিণস্থ বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটা বটগাছ ব্যতীত অন্য কোনও প্রাচীন গাছ দৃষ্ট হয় না। কালক্রমে পোড়াগঙ্গা নদী একটা বিলে পরিণত হইয়াছিল। ইদানীং যেখানে পোড়াগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত সেখানে একটী খালমাত্র পরিলক্ষিত হয়। লোকে ইহাকে পোড়াগঙ্গারাখাল বলিয়া থাকে।

দত্ত অর্থাৎ বারুইরা এ গ্রামের সর্ব্বপ্রাচীন অধিবাসী। ইহাদের পরেই ভট্টাচার্য্যেরা এবং মুখোটীরা রাজনগর হইতে আসেন। প্রায় আড়াইশত

বৎসর যাবৎ ইঁহারা এ গ্রামে বাস করিতেছেন। কাশী হইতে আসিয়া ভট্টাচার্য্যেরা প্রথমতঃ চামারদিতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে অন্য কোনও ব্রাহ্মণের বাস না থাকায় মুখোটীরা ভট্টাচার্য্যদিগকে পশ্চিমপাড়ায় আসিতে বলেন—তাহাদিগের কথামত ভট্টাচার্য্যেরা এখানে আসিয়াছিলেন।

গ্রামে তিনঘর তালুকদার বাস করেন—মুখোটী, ভট্টাচার্য্য এবং চাটুয্যে। পূর্ব্বে বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মুখোটীদের খুব প্রতাপ ছিল। প্রত্যহ ইহাদের বাড়ীতে তিন চার মণ চাউল রন্ধন হইত! কিন্তু সেই অবস্থা এবং প্রতাপ সকলই চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের কার্য্যকলাপের স্মৃতিমাত্র লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভট্টাচার্য্যেরা খুব ধার্ম্মিক —আজ পর্য্যন্তও ইহারা আমিষ ভক্ষণ করেন না। এই বংশে অনেক কৃতী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চাটুর্য্যেরা মুখোটীদিগের ন্যায় অত নামজাদা না হইলেও ইহারাও কম নন। ডাক্তার নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত প্রভৃতি এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চিমপাড়াকে ধন্য করিয়াছিলেন। * এই গ্রামস্থ চাটুয্যেবংশ বিক্রমপুরের অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত চাটুয্যে এবং মুখোটীরা পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন—একের উন্নতি অপরে যেন দেখিতে পারিতেন না। এই উভয় বংশের যে সব কারণে অবনতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ আত্ম-কলহ। সামান্য কারণে ইহারা মোকদ্দমা করিতেন আর লাঠিয়া-

* ইঁহাদের বিষয় "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ আছে।

কাহারও কাহারও মত এই যে, পূর্ব্বে এখানে দত্ত এবং হরি সাজির বাড়ীবলিয়া এক ঘর কাপালীর মাত্র বাস ছিল। কোন ব্রাহ্মণের বাস না থাকায় দত্তরা বড়ই অসুবিধায় পড়েন। কাশী হইতে এক ঘর ব্রাহ্মণ চামারদিতে আসিবেন জানিয়া দত্তরা তাঁহাদিগকে এখানে আসিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাহারা পশ্চিম পাড়ায় আসেন। মুখোটীরা ইহাদের পরে আসিয়াছেন।

লের লড়াই যেন ইহাদের মধ্যে লাগিয়াই ছিল। "কলহ-বিবাদে" ব্যাপৃত না থাকিয়া মিলিয়া মিশিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলে আজ হয় ত পশ্চিমপাড়া বিক্রমপুরে সর্ব্ববিষয়ে প্রধান গ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ পর্য্যন্তও তাঁহারা সে বিদ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই—সময়ে সময়ে আজও ইঁহারা দলাদলি করিয়া থাকেন। চাটুয্যেদের পূর্ব্ব-পুরুষ ভট্টাচার্য্যদের দৌহিত্র সন্তান। এই সম্মিলিত দুইবংশ 'ভারটী' নামে প্রসিদ্ধ। কালীপাড়ার জমিদার একঘর এ গ্রামে মুখোটী এবং ভট্টাচার্য্যদিগের সমসাময়িক কাল হইতে বাস করিতেছেন। দত্তদের অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল ছিল; এখন তাহারা মধ্যবিত্ত। গ্রামের নীচ জাতীয়গণের অবস্থা বেশী ভাল নয়। সকলকেই 'মাথার ঘাম পায়ে' ফেলিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হয়। মুসলমানেরা গ্রামের পূর্ব্বধারে বাস করে, তাহাদের পাড়ার নাম 'পূর্ব্বকান্দা'। তাহাদের দুই চারিজনের অবস্থা মন্দ নয়; আর সকলেই 'দিনে আনে দিনে খায়' ধরণের।

গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা মন্দ নয়। গ্রাম খানি ছোট হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা লোক সংখ্যার অনুপাতে ভালই বলিতে হইবে। এই গ্রামে ক্ষণজন্মা 'নামেডাকা' পুরুষ বেশী জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও এ বিষয়ে এগ্রাম অন্যান্য গ্রাম হইতে সৌভাগ্যবতী, কারণ যা, দুই চারি জন এ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা শুধু এই গ্রামের কেন—সমগ্র বঙ্গের গৌরবস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ডাক্তার নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত এবং নবকান্ত—এই চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিক্রমপুরবাসী শিক্ষিত মাত্রের নিকটই সুপরিচিত। বাস্তবিক ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ব্যক্তি বিশাল ভারতে ও দুই চারিটী বই মিলেনা। ইনি ঊনবিংশতিটী ভাষায় সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নে এই গ্রামস্থ স্বর্গগত

১। ৺ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ফয়জাবাদের Assistant Surgeon ছিলেন। স্বগ্রামের প্রতি ইহার বেশ টান ছিল।

২। ৺ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—গৌরীপুর Estateএর দেওয়ান ছিলেন।

এই গ্রামে কোনও উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় নাই। এ অসুবিধাটা গ্রামস্থ ছাত্রদিগকে খুবই ভোগ করিতে হয়। রক্ষা যে নিকটেই ইছাপুরা হাই ইংলিশ স্কুল—তাহাই বা বিশেষ নিকটে কি?—প্রায় দুই মাইল দূর হইবে যাইতে কোন ভাল বান্ধানো রাস্তা নাই। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং কার্ত্তিক মাসে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নিরুপায় হইয়া তাহারা সেই স্কুলেই পড়ে।

এখানে একটী উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা আছে। তাহাও বর্ত্তমানে বেশী ভাল চলিতেছে না। পূর্ব্বে ইহার অবস্থা আশাতীত ভাল ছিল—প্রতি বৎসরই ৭।৮টী উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিত। গ্রামের বর্ত্তমান যুবকগণে অনেকেই এই পাঠশালার ছাত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের (দুই একজন ব্যতীত) কোনও সাহায্য না পাওয়ায় ইহার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। শিক্ষকেরা কিন্তু যত্ন চেষ্টার ত্রুটী করেন না।

না থাকার মত একটী বালিকা বিদ্যালয় এই গ্রামে আছে। দুই চারি দিন মেয়েরা স্কুলে যায়, আবার দুই চার দিন বন্ধ থাকে। মেয়েদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না।

দুঃখের বিষয় এই যে ছেলেদের জন্য স্কুল, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপন করিতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণের বিশেষ চেষ্টা না থাকিলেও তাহারা যাহাতে দুশ্চরিত্র না হইতে পারে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের প্রখর দৃষ্টি আছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে বক্তব্য।

ভদ্রলোকের ছেলেপিলেদের সকলেই স্কুলে পড়ে। নিম্নশ্রেণীস্থ কয়েকটী ছেলে এখন পাঠশালায় পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম।

প্রায় ১০ বৎসর হইল এ গ্রামে ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় যুবকের চেষ্টায় এই গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন চলিয়াই উহা উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে মুখোটী বাড়ীতে "Literary Association" হইত। গ্রামের সমস্ত ছাত্র সেখানে যাইত। সকলেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া নিত—আর সেখানে তাহা পাঠ করিত। এই কার্য্যে তাহাদের অশেষবিধ উপকার হইয়াছিল। দুই চার জন ভদ্রলোকও এই কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। বর্ত্তমানে উহা নাই।

গ্রামে কোনও হাট বাজার নাই। এ অসুবিধাটা কিন্তু গ্রামবাসীর তত বেশী ভোগ করিতে হয় না। কারণ, নিকটেই ভবানীপুর এবং নওপাড়ার হাট, আর ইছাপুরার বাজার। অধিকন্তু হাট বাজার বসিতে পারে এমন 'রোকের' জায়গাও এখানে নাই। গ্রামে ৭.৮টী মুদি দোকান আছে।—সেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

গ্রামের ভদ্রলোকদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় চাকুরি। কাহারও কাহারও 'খামার' আছে, তদ্দ্বারাই তাহাদের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। নীচ জাতীয়গণের কৃষিই জীবনধারণের প্রধান সম্বল।

গ্রামের যুগীরা বস্ত্রবয়নে ওস্তাদ। কাপালীরা পাটের ছালা বুনাইতে পারে। উহারা এই সমস্ত ছালা সেরাজদিখাঁর হাটে বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। এই গ্রামের কৈলাস মণ্ডল লাঠির খেলা দেখাইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে বেশ নাম করিয়াছে। উহার বয়স এখন ৬০

বৎসর ; কিন্তু সে এখনও দাঁত দিয়া ঢেকি ঘুরাইতে পারে। নীলপূজার * সময় গ্রামের নিম্নশ্রেণীরলোক নানাপ্রকার সাজ দিয়া জাকজমকের সহিত গ্রামে গ্রামে বাহির হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে দুই তিনটা মেলাও এখানে বসিয়া থাকে। মনা যুগীর (মনমোহন নাথ) 'কবির দলটী' কিছুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে।

গ্রামের জল বায়ু এবং স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ৩।৪ বার মাত্র কলেরা দেখা দিয়াছিল। এই ৩।৪ বারের মধ্যে ২বার খুব ভীষণভাবে লাগিয়াছিল। একবারের আক্রমণে মুখোটীবাড়ী জনশূন্য হওয়ার পথে গিয়াছিল। আমাশয় এবং জ্বরের উপদ্রবও সময়ে সময়ে দেখা যায়। ডাক্তারের সংখ্যা বেশী নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে নিকটবর্ত্তী জৈনসার গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সেখানে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন ; আর ধারে পাশের গ্রামসমূহেও কয়েক-জন চিকিৎসক বাস করেন। নতুবা অকালে অচিকিৎসায় অনেককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত।

পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে গ্রামে ভাল পুকুর ছিলনা। জল ছিল পনাপচা—ঘোলা। অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল ; কিন্তু এখন তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রামে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩৫টী তন্মধ্যে ১০।১৫টীর জল সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত ; আর গুলির সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। জলের উপর লোকের স্বাস্থ্য নির্ভর করে গ্রামবাসীদিগের পানীয় জলের ভাল বন্দোবস্তকরা উচিত। ইদানীং কয়েকটী পুকুর—reserve রাখিবার কল্পনা জল্পনা চলিতেছে।

পশ্চিমপাড়া গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য নয়নমনোমুগ্ধকর। চারিদিকেই উন্মুক্ত ময়দান এই গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। রাস্তাঘাট মন্দনয়।

* নীলপূজা—নীলকণ্ঠ পূজা, চড়কপূজা।

বাধান রাস্তা একটী মাত্র ; আর সকলই হালট। সড়কটার উপর তিনটা পুল আছে। বর্ষাকালে এই রাস্তাটা জলে ডুবিয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে দুর্গন্ধের জন্য রাস্তা দিয়া চলা যায় না। রাখালবালকেরা এই রাস্তায় গরু চরায়।

গ্রামখানিতে ঝোপ-জঙ্গল-পরিপূর্ণ স্থান বেশী নাই। সড়কের উত্তরস্থ মুখোটী বাড়ীর 'চিতাখোলায়' অনেককেই ভয় পাইতে হইয়াছে। ওখানে নাকি অনেক অপদেবতার বাস। গ্রামে আর একটা ভয়ের স্থান আছে ; উহা গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনস্থ বটগাছের নিকট। কথিত আছে এক ব্যক্তি ওখানে জগন্মাতা শীতলাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। গাছটা বহুকালের—কেহ বলেন এখানে দক্ষিণাকালিকা আছেন ; কেহ বলেন গাছটা শীতলাদেবীর আবাসস্থল ; কেহ বলেন এখানে অনেক দেবতা বাস করেন। কিন্তু যেই যা বলুন না কেন, গাছটা যে 'দেবাংশি' এ বিষয়ে কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। বৃক্ষটীকে দেখিয়া ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়—যখন এ গ্রামে আসিয়াছিলেন—তখন বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিমপাড়া গ্রামের উন্নতি অবনতি মঙ্গল অমঙ্গল এই গাছটার উপর নির্ভর করিবে। অর্থাৎ যখন গাছটা সতেজ এবং পত্রে সুশোভিত হইতে আরম্ভ করিবে তখন জানিবে যে গ্রামের উন্নতি এবং মঙ্গল হইবে আর গাছটা যখন 'টাণ্ডামুণ্ডা' হইতে আরম্ভ করিবে অর্থাৎ পাতা পড়িয়া ইহার ডালগুলি ভাঙ্গিয়া অথবা শুকাইয়া যাইবে তখন জানিবে যে গ্রামের অমঙ্গল হইবে।' মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে ; কয়েক বৎসর হইল ঝড়ে ইহার একটা ক্ষুদ্র শাখা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কয়েকটী উজ্জ্বল রত্নও লোকান্তরিত হইয়াছেন।

হিন্দু এবং মুসলমানই এই গ্রামের অধিবাসী। ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের ফলস্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ এই গ্রামের গৃহে গৃহে

প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামে প্রত্যেক দিনই খোল করতাল সংযোগে 'হরি সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই গ্রামে একজন সংসারত্যাগী আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী সন্ন্যাসী আছেন। ইঁহার নাম কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। এই মহাত্মার "শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ" নামক তিন খণ্ড গ্রন্থ নানাবিধ সদুপদেশ পূর্ণ। ইনি এবং ইহার অপর তিন ভ্রাতা হরকান্ত, বরদাকান্ত এবং সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় —পুরীতে অবস্থান করেন। এই গ্রামের ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নামও বঙ্গদেশের অনেকের সুপরিচিত। হিন্দুদর্শনে ইঁহার জ্ঞান অসাধারণ। ইনি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতী মহাশয় বৎসরে দুই একবার স্বীয় জন্মভূমিতে আসিয়া বালক এবং যুবকদিগকে একত্র করিয়া নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়া যান। শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী বিগত দ্বাদশ বৎসরের ভিতর একবার মাত্র পশ্চিমপাড়ায় আসিয়াছিলেন।

পশ্চিমপাড়া সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত না হইলেও বিক্রমপুরে ইহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কোন কোন অংশে পশ্চিমপাড়া এতদূর উন্নত যে বিক্রমপুরে ইহার সমকক্ষ গ্রাম নাই বলিলেই চলে।

গ্রাম্য বিবরণ—পুরাতন মালপদিয়া।

মালপদিয়া প্রসিদ্ধ মালখানগরের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব সীমানা বড়ইপাড়া, চৈয়াপাড়া, নাটেশ্বর, তেলীপাড়া, ঘাসভোগ বা খাসভোগ এবং দিগম্বরীর মাঠ। দক্ষিণে তেলীপাড়ার অংশ, দিগম্বরীর মাঠ ও ধাইরপাড়া। পশ্চিমে করারবাগ মধ্যপাড়া, কাউয়াসারের মাঠ, বাহিরকুচি ইত্যাদি। ইহা উত্তর বিক্রমপুরের মধ্যে একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রাম। পুরাকালে বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের সময় ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী, বিস্তীর্ণ ও লোকবহুল স্থান ছিল।

পশ্চিমপাড়া বর্ত্তমান মালপদিয়া হইতে অন্যূন তিন মাইল দুরে। বর্ত্তমান সময়ও মালপদিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী খণ্ড গ্রাম বাহিরকুচি, মরাপাড়া, বণিক্যসার, কৈবর্ত্তসার ও তেলীপাড়ার অধিবাসিগণ তাহাদিগকে "মালপ-দিয়াবাসী" বলিয়া সগর্ব্বে পরিচয় দেয়। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও ভূস্বামীগণের বংশধর সেন জমিদারগণের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। সে সময় কেহই তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে পাল্কি বা ছাতা ব্যবহার করিতে সাহস পাইত না। এখন তাহাদের বংশধরগণ দীনহীন ভাবে পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিত্যক্ত ভিটায় এখানে সেখানে ও মালপদিয়ার অন্যান্য অংশে বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের একজন বহুকাল পূর্ব্বে চাঁদপুর স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার বংশধরগণ প্রতিপত্তির সহিত তথায় বসবাস করিতেছে। প্রাচীন ভূস্বামীগণের বাসস্থান মালপদিয়ার দক্ষিণাংশে ছিল। এখনও সেখানে ৮।১০টী বড় পুষ্করিণী সহ প্রকাণ্ড বাড়ী বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। কেবল স্থানে স্থানে ছোট খাট ঘর, বাড়ী, বরজ ও অন্যান্য ফসল আছে।

এই প্রাচীন বাড়ীর চারিদিকে বিশাল গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। বাহিরবাড়ী হইতে প্রকাণ্ড একটী দরজা বরাবর পূর্ব্বদিকে গিয়াছিল এখনও তাহার সামান্য অংশ বিদ্যমান। বাড়ীর সম্মুখে গড় পার হইয়াই এই দরজার পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড ভরাট দীঘি আছে। ইহার নাম দিগম্বরী বা গভীরা এবং ইহার নামানুসারেই সম্মুখবর্ত্তী মাঠের নাম "দিগম্বরীর মাঠ।" মালপদিয়ার দিগম্বরী কালী এই দীঘি হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এবং ইহার তীরে চড়কপূজা হইত বলিয়া ইহার অন্য নাম গম্ভীরা হইতে গভীরা হইয়াছে। বিক্রমপুরের অন্যান্য পুরাতন জলাশয়ের ন্যায় ইহার সম্বন্ধেও নানারূপ কিংবদন্তি বর্ত্তমান আছে। এখনও লোকে দিগম্বরীকে মানত মানে ও বিষব সংক্রান্তিতে পূজা হইয়া থাকে এবং প্রতি

বৎসর ১লা বৈশাখ দিগম্বরীর প্রকাণ্ড গলইয়া মেলা মিলে। পূর্ব্বে ইহা দিগম্বরী দীঘির পারে বসিত এখন কিন্তু ইহা অনেকটা দক্ষিণে সরিয়া ধাইরপাড়ার কোনে মিলিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে মালপদিয়ার দিগম্বরী কালী এই পুষ্করিণী হইতে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল এবং দেবোত্তর সম্পত্তির জোরে এখন পর্য্যন্ত উত্তর মালপদিয়াতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এখন চৌধুরিরা ইহার সেবায়ত এবং দিগম্বরী মেলার উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই অতুল প্রতাপশালী জমিদারগণ ব্রহ্মোত্তর দিয়া চৌধুরী, মিশ্র প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ ও কুলীন মালপদিয়াতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এবং চৌধুরীদিগকে ব্রহ্মোত্তর ব্যতীত শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি যাগযজ্ঞে বিশেষ কতকগুলি দানের অধিকারী করিয়া সমাজপতি করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত তাহাদের বংশধরগণ সেই সব বিশেষদান ভোগ করিয়া সমাজপতি আছেন। পূর্ব্বে চৌধুরীগণ এইসব বিশেষ দানের বিনিময়ে যে কোন বারুইয়ের পিতৃমাতৃ দশায় সম্পূর্ণ অশৌচকাল পর্য্যন্ত অষ্ট প্রহরের জন্য একজন ব্রাহ্মণ দিত। এবং দশা ও শ্রাদ্ধাদি যে কোন কর্ম্মে যত ব্রাহ্মণের দরকার হইত যোগাড় করিয়া দিত। এখন আর গুরুদশার সময় অষ্ট প্রহরের জন্য ব্রাহ্মণ রাখার নিয়ম নাই। কিন্তু ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত তাহারাই যোগাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময় কিন্তু মালপদিয়াতে একজনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই। পূর্ব্বে যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন "পণ্ডিতের ছাড়া" নামক বাড়ীই তাহার প্রমাণ।

প্রাচীন মালপদিয়ার পশ্চিমে মধ্যপাড়া, করার বাগ, কুকির হাট খোলা, জৈনসার ও পশ্চিমপাড়া পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিমে বাহিরকুচি, মরাপাড়া ও কাউয়াসারের মাঠ ও কৈবর্ত্তসার পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে বাড়ইপাড়া, চৈয়া পাড়া নাটেশ্বর, বণিক্যসার, কাইচাইল, জহরপুরা, তেলীপাড়া শুবচনী,

মৃজানগর বা ঘাসভোগ বা ঘাস ভোগ পর্য্যন্ত। দক্ষিণে দিগম্বরীর মাঠ, ধাইয়াপাড়া ও পোড়াগঙ্গার খাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইরূপে দেখা যায় এই বিস্তীর্ণ মালপদিয়ার অন্তর্গত অনেকগুলি খণ্ডগ্রাম ছিল এবং সেগুলি অবস্থানানুযায়ী ও অধিবাসীর জাতী অনুসারে এবং ধর্ম্ম সম্পর্কে নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিম অংশে অবস্থিত বলিয়া **পশ্চিমপাড়া**, মধ্যস্থানে স্থিত বলিয়া **মধ্যপাড়া**; ইহা বৈদ্য প্রধান স্থান এবং বর্ত্তমান সময় খুব উন্নত। উত্তরাংশের নাম **উত্তর মালপদিয়া**। দক্ষিণাংশের নাম **দক্ষিণ মালপদিয়া** ইহা এখনও বাকই প্রধান। উত্তর পাড়ার বাহিরে যে অংশ তাহার নাম বাহিরকুচি। মধ্যপাড়ার কুক্ষিতে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটী অংশের নাম **কুক্ষিকর-হাটখোলা**। এখানে বোধহয় পূর্ব্বে হাট ছিল। ইহা ইছাপুরার অতি নিকটে। সে সময় বোধহয় ইছাপুরাতে বাজার ছিল না। **বণিক্যসার** বণিক্যগণের বাস স্থান ছিল। এখানে একটী পুরাতন দীঘি আছে। এবং ইহারনিকটেই সুবর্ণবণিক সেনদের বাড়ীতে বিক্রমপুরের বিখ্যাত মালপদিয়ার "মনসাবাড়ী।" এখানকার মনসার ধাতু পাথরের স্থায়ী মূর্ত্তি নাই। মনসা মূর্ত্তি মাটির এবং কয়েক বৎসর পর পর নূতন করিয়া তৈয়ার করা হয়। **মিশ্রিপাড়া** উত্তর মালপদিয়ার পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত এখানে মিশ্রদের বাড়ী ছিল। এখন তাহাদের বংশ লোপ হইয়াছে। এখানে একটী পুরাতন মঠে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই মিশ্রেরা চাচইরতলার মালিক ছিলেন। **বাড়ইপাড়া** নৌকা মিস্ত্রি বাড়ইদের বাসস্থান ছিল। ইহার সংলগ্ন **চৈঙ্গাপাড়াতে** বোধ হয় নৌকার ছৈ তৈয়ারকারী

অবস্থানানুযায়ী খণ্ড গ্রামের নাম ও বিবরণ

জাতি হিসাবে পাড়ার নাম ও তাহার বিবরণ

শিল্পিদের বাসস্থান ছিল; তাই ছৈয়ালপাড়া ক্রমে চৈয়াপাড়া হইয়াছে। অথবা এটা চাষিদের পাড়া ছিল। **কৈবর্ত্তসাহ্লে** একটী পুরাতন দীঘি আছে ইহা জেলে কৈবর্ত্তদের বাসস্থান ছিল এখন কিন্তু প্রায় সমুদয় কৈবর্ত্ত্য নাটেশ্বরে বসবাস করে। কাইচাইল ইহা মালপদিয়ার পূর্ব্বাংশে খালের পূর্ব্বপারে অবস্থিত। নীল পূজায় "কাচনাচা" বোধ হয় সকলেই জানেন যাহারা কাচ নাচে তাহাদিগকে "কাচি" বলে মালপদিয়ার চড়ক-পূজায় কাচিদের বাড়ী ছিল বলিয়া কাচি-আলয় হইতে এখনকার **কাই-চাইলয়া গ্রাম**। এ গ্রাম এখন ব্রাহ্মণ প্রধান ও খুব উন্নত। **জহরপুরা** এখানে জহুরীদের পাড়া ছিল। ইহা কাইচাইলের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ও ইহার সহিত লাগ তেলীপাড়ার অংশ নটিকান্দাতে নটীদের বাসস্থান ছিল। **তেলীপাড়া** ইহা দক্ষিণ মালপদিয়ার পূর্ব্বে ও তালতলা খালের পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এখানে তিলিদের বাসস্থান ছিল। এখন কিন্তু এখানে এক ঘর তিলিও নাই। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে আবদুল্লাপুরের দে আখ্যাপ্রাপ্ত তিলি মহাশয়গণ এই তেলীপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। তাহাদের বংশের সৃষ্টিধরদের কীর্ত্তি "দের দীঘি" এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।—মালপদিয়ার এ অংশও খুব উন্নত ছিল। এখন পতিত বাড়ী—মজুমদার ভিটা, ঢাকি বাড়ী, সোনার বাড়ী, সেনের গড়, ঢালি ভিটা, চিতাখোলা প্রভৃতি স্মৃতিগুলি ও পুরাতন ভরাট পাঁচ ছয়টী দীঘি পূর্ব্বতন উন্নতির নামমাত্র পরিচয় দেয়। এখানকার কায়স্থ বংশ সম্ভূত রাজগণের শিল্প চাতুর্য্য বিক্রমপুরের পুরাতন ও নূতন হর্ম্ম্যাদিতে বিরাজিত আছে। উত্তর বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় কবিরাজ রাধাচরণ দাস মহাশয় এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ সাত বৎসর যাবৎ তাঁহার অভাবে উত্তর বিক্রমপুরের অর্দ্ধেক অধিবাসী ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে হাহাকার করিতেছেন। বিক্রমপুরের তাহার

অপেক্ষা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান অনেক কবিরাজ ছিলেন ও আছেন এবং অনেক বিদেশে তাঁহার অপেক্ষা অনেক নাম করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহারা দেশের কিছুই করেন নাই। **ধাইর পাড়া** ইহা দক্ষিণ মালপদিয়ার দক্ষিণে। এখানে জমিদারগণের ধাই বা ধাত্রীর বাসস্থান ছিল। ইহা জমিদার বাড়ীর লাগ দক্ষিণে অবস্থিত।

ধাইপাড়া, মুজানগর মালপদিয়ার পূর্ব্বদক্ষিণ অংশ। ইহা মুসলমানি গ্রাম। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার অধিবাসিগণ মুসলমান এবং ইহারা সকলেই চটকী বা "কাষ্ঠ-শিল্পী"; এজন্য ইহার অন্য নাম চটকীপাড়া। ইহারা সাধারণ কাঠ কুঁদাইয়া কাকই (চিরুণী), কৌটা, লাটিম, খরমের বউলা, বারকোষ (Tray) প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া লাক্ষা ও রাঙ্গের দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে রঞ্জিত করে। হুকার নইচা তৈয়ার করিতেও ইহারা বিশেষ দক্ষ। ইহাদের প্রস্তুত জিনিষগুলি বিক্রমপুরের একটী বিশেষ বাণিজ্য-সম্পদ। ইহা ছাড়া হিন্দুর শ্রাদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য, ব্যবহারের অনুপযুক্ত পাদুকা (খরম) তৈয়ার করে।

ধর্ম্ম সম্পর্কিত নাম ও বিবরণ।

নাটেশ্বর—পাইকপাড়া নাটেশ্বরের ন্যায় এখানেও বোধ হয় নাটেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। এখন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এখানে একটী পুরাতন দীঘি আছে। বোধ হয় ইহার তীরেই মন্দির ছিল। এই দীঘির নাম—নাটেশ্বরের দীঘি।

সুবচনি—ইহা প্রসিদ্ধ তালতলা খালের পারে বিখ্যাত হাট। এখানে প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে সুবচনীর মেলা হয়। সেখানে কত শত লোক স্মরণাতীত কাল হইতে শনি মঙ্গলবার মা সুবচনীর পূজা দিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েক বৎসর হইল ঝড়ে প্রাচীন গাছটী উপড়াইয়া পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গুড়ির নিকট হইতে

একটী শাখাবৃক্ষ বাহির হইয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। এই বটগাছ ছাড়া এখানে আরো কয়েকটী অশ্বত্থ গাছ ও একটী পুরাতন বড় দীঘি আছে।

মরাপাড়া—বাহিরকুচির উত্তরে অবস্থিত, বোধ হয় কোন মড়কে লোকক্ষয় হেতু—অথবা মালপদিয়ার চিতাখোলা থাকার দরুণ হইয়াছিল। শেষোক্ত কারণে মরাপাড়া নাম হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহার নিকটে বহু পুরাতন কালী ও শিবমন্দির আছে তাই মরাপোড়া হইতে মরাপাড়া নাম হইয়াছে।

কলার বাগ বা করের বাগ—ইহা মধ্যপাড়ার দক্ষিণে অবস্থিত। মালপদিয়ার মধ্যে ও নিকটে এরূপ আরো কয়েকটী "বাগ" আছে—যেমন—রায়ের বাগ, কল্যাণের বাগ, তেলীপাড়ার অংশ বিশেষ "লালমণির বাগ"।

প্রাচীন মালপদিয়ার অন্তর্গত ছয়টী স্থান সরোবরের অপভ্রংশ "সার" অন্ত। ইহার মধ্যে কৈবর্ত্তসার ও বণিক্যসারের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কান্দাসার—তেলীপাড়া ও দক্ষিণ মালপদিয়ার মধ্যে মাঠে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এজন্য প্রাচীনগণ বলেন ইহা মগের আমলের। হিন্দুরা কখনও পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা দীঘি খনন করেনা। এই দীঘিটা এখন প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক বড় বড় হিজল গাছ জন্মিয়াছে। আজ কাল লোকে ঘাস লাগাইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে কান্দনীসার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ইহার সাধারণ নাম কান্দাসারই ঠিক। ইহার উত্তর পারের সমসূত্রে কয়েক নল পশ্চিমে একটী ছোট টিলার উপর **ত্রিনাথ ঠাকুরের** মন্দির আছে। এখানে একটী বাসুদেব মূর্ত্তি ছিল এখন তাহা দিগম্বরী কালীবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহা

ইছাপুর হইতে সুবচনীর মাঝ দিয়া যে রাস্তায় গিয়াছে তাহার পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া খুব বিখ্যাত। আমাদের ছোট বেলায় নকরীমণ্ডল নামক একজন বৃদ্ধ নমঃশূদ্র সেবাইত ছিল। বৃদ্ধ হইলেও তাহার ন্যায় অমিতবলশালী মাংসল দেহ বর্ত্তমান বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে বিরল। প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি তাঁহারাও নকরী মণ্ডলকে ঐরূপ চুল দাড়ি পাকা বৃদ্ধই দেখিয়াছেন। তাই তাহারা বয়স যে কত ছিল কেহই অনুমান করিতে পারিত না। অথচ তাহার নিকটও সদুত্তর পাওয়া যাইত না। পূর্ব্ব লিখিত রাস্তা ধরিয়া আরো ৫০।৬০ নল ইছাপুরার দিকে গেলে দ্বিতীয় সরোবর পত্নীসার। ইহা মধ্যপাড়া তারিণী সেনের ঘাটায় অবস্থিত। ইহার নামাকরণ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারে না। সেনেরা ইহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া ব্যবহার্য্য করিয়াছেন এবং এই পুষ্করিণীর নাম যে পত্নীসার তাহাও অবগত নহেন। কিন্তু সকলেই জানেন তারিণী সেনের বাড়ীর ঘাটার অনেকটী যায়গায় আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে জল ভাঙ্গিতে হয় বলিয়া ঐস্থান টুকুর নাম "পত্নীসারের ভাঙ্গা।"

পত্নীসারের ভাঙ্গা পার হইয়া আরো কতকটুকু পশ্চিম ও উত্তর দিকে আসিলে মধ্যপাড়া ও কাকালদি গ্রামের মধ্যে যে মাঠ তাহার নাম কাউয়া-সারের মাঠ। ইহার মধ্যস্থানে প্রায় ভরাট হিজল ও বৌনা বৃক্ষে আবৃত একটা জলাস্থান সরোবরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে ইহারই নাম কাউয়াসার।

পুরাতন মালপদিয়াতে অনেকগুলি সরকারী রাস্তা বা দরজা ছিল তাহার অনেকগুলি এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বর্ত্তমান আছে। তেলীপাড়া-মালপদিয়া ও পশ্চিমপাড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক লাঠিয়াল ও নমঃশূদ্রের বসবাস ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পশ্চিমপাড়া ও তেলীপাড়ায় লাঠিয়ালগণ লাঠি ও তরবারি খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

গ্রাম্য বিবরণ—ইছাপুরা।

ইছাপুরা উত্তর বিক্রমপুরের একটী সুপ্রসিদ্ধ খণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম ঈশাপুরা ছিল বলিয়া মনে হয়। নবাবী আমলে ইহা যে মুসলমান প্রধান স্থান ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। অধুনা এ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু। বিক্রমপুরের মধ্যে ইহা একটী ব্রাহ্মণ প্রধান পল্লী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন বিবরণ, সীমা ইত্যাদি ঃ—এই গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। অনুমান—এই স্থানটী কোন প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল; কালক্রমে ইহা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া বাঘ ভল্লুক প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়া উঠে। গ্রামের বৃদ্ধগণ এক স্থানকে অদ্যাপি "বাবাতলী" বলিয়া থাকেন। কালীপাড়া, বটেশ্বর, সাহবাজনগর প্রভৃতি স্থান কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইলে তথাকার অধিবাসিগণ এস্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন ইহার পূর্ব্বে পুরাতন ভট্টাচার্য্য, বণিক্য ও কয়েক ঘর মুসলমানের বসতি ছিল। পদ্মাতীরবাসিগণের আগমনেই ইছাপুরা জন কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। মুন্সীগঞ্জ হইতে যে "ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের" রাস্তাটী বিক্রমপুরের মধ্যে দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইছাপুরা তাহার উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহা কোন প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে। উত্তর-পশ্চিমে—চন্দনধূল, উত্তর-পূর্ব্বে—রাজদিয়া, পূর্ব্বে—শিয়ালদি দক্ষিণে—মধ্যপাড়ার মাঠ, পশ্চিমে—চম্পকদি ও চন্দতধূলের কিয়দংশ। গ্রামটী দৈর্ঘ্যে দুর মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল হইবে। ইহা বহুভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে রাধাকান্তপুর, চল্‌বল্ খাঁ, লোহার পুকুরপার, ডিংশাইপাড়া প্রভৃতিই প্রধান।

লোকসংখ্যা, সাধারণ অবস্থা ঃ—স্থানটি বহুজনাকীর্ণ। অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। বৈদ্যমাত্র দুইঘর; কায়স্থ, বারুই,

ভূঁইমালী, গোয়ালা, ধোপা নাপিতের বসতিও কম নহে। মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। গ্রামের পূর্ব্বদিকে কেবল দুই তিন ঘর মুসলমান বাস করে। চাকুরী এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের প্রধান অবলম্বন। কোন কোন ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য ও গুরুতা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। নীচ জাতির মধ্যে সকলেই স্ব স্ব ব্যবসায় করিয়া থাকে। বারুই-দের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিতে হইবে। এ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার হইবে।

স্বাস্থ্য ঃ—এ স্থানের জলবায়ু নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা ভাল। ছোট বড় অনেক পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে "কমলাসাগর দীঘি" ও "লোহার পুকুর" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু এই দুইটীরই জল পানের অযোগ্য। এ দুটী পুকুর সংস্কৃত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলে গ্রামের জলকষ্ট অনেক দূরীভূত হয়। প্রায় সকল বাড়ীতেই দুই একটী পুকুর আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের জলই পানের অযোগ্য।

রাস্তা ঘাট ইত্যাদি ঃ—ইছাপুরার দক্ষিণ দিক্ দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এস্থানে কাঠের সেতু ছিল; এবার নূতন লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাজার হইতে উত্তরাভিমুখে একটী "লোকেল বোর্ডের" রাস্তা গ্রামের মধ্যস্থলে পৌছিয়াই অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এ রাস্তাটী সিরাজদিখাঁ পর্য্যন্ত মিশিতে পারিলে সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হইবে।

একটী অনতি প্রশস্ত খাল পূর্ব্ব দিক দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া, একটী শাখা গ্রামকে বিভক্ত করতঃ চলনদুর, ঠাইরন বাড়ী, আবিরপাড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া ইচ্ছামতীতে মিশিয়াছে; অপর শাখা গ্রামের দক্ষি-পশ্চিম দিক দিয়া বাহির হইয়া পোড়াগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত খালটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। উভয় পার্শ্ব হইতেই বৃক্ষরাজি ইহার উপর পতিত

হওয়ায় ইহা এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে একখানি নৌকা চলাই কষ্টকর।

বাজার-পোষ্টাফিস ঃ—ইছাপুরার বাজারটী বৃহৎ। ইছাপুরার চামারদি, মধ্যপাড়া, বাহেরকুচি, চলনদূর, শিয়ালদি, পশ্চিমপাড়া, ইত্যাদি গ্রামের লোকেরা এই বাজারে আসিয়া ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। মৎস্য, তরিতরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি লোকের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য সমুদয় এস্থানে বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আটখানা মনোহারি, সাতখানি মুদি, তিন খানা দরজীর ও চারি খানা কাপুড়িয়া দোকান স্থায়ীভাবে এবাজারে আছে। একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বে এস্থানে একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। এগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তখন এস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ৺ আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ও ৺ রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহায্য ও চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয়। সোমভাগ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু রায় মহাশয় এস্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। অদ্যাপি তিনিই হেড্‌মাষ্টারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। ছাত্রসংখ্যা ৬০০ ছয় শতেরও অধিক।

বিবিধ ঃ—ইছাপুরা কুলীন প্রধান স্থান, এখানকার সমাজ প্রসিদ্ধ। চাঁচরপাশা ও বাঘিয়া সমাজ বিক্রমপুরের সুপরিচিত। অন্য কোথাও কোনপ্রকার সামাজিক গোলযোগ ঘটিলে তাহার মীমাংসার ভার এই সমাজের উপরই পড়িয়া থাকে। বিক্রমপুরের অন্যান্য স্থানে যেরূপ ব্রত নিয়মাদি প্রচলিত আছে, এস্থানে তাহার কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। লোক্যালবোর্ডের রাস্তার উপর একটা বটবৃক্ষ. দণ্ডায়মান আছে। লোকে ইহাকে "সিদ্ধেশ্বরী" বলে। হিন্দু রমণীগণ এই বৃক্ষে তেল-সিন্দুর অনুলেপন

করিয়া থাকেন। মানত দিবার জন্য ছাগ ইত্যাদি লইয়া অনেকে এস্থানে আসিয়া থাকে। পুরাতন ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে একটী **পঞ্চরত্ন মঠ** বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে মহাদেব বিগ্রহ স্থাপিত। এস্থানেও মানত দিবার জন্য বহুলোক উপস্থিত হয়। পুরাতন কালীবাড়ীর কালীমূর্ত্তি ৭।৮ পুরুষ যাবত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কথিত আছে, পঞ্চানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। দেবী বড় জাগ্রতা। শ্রীযুক্ত যশোদালাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে একটী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতা এই কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বালীয়াটীর বাবুদের যায়গায় স্থাপিত বলিয়া ইহা "বালিয়াটিশ্বরী" নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত দেবীদাস চূড়ামণির বাড়ীতেও একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের ভবনে মনসা স্থাপিত। মনোগত ফল লাভ করিলে পূজা দিবার জন্য বহুলোক এস্থানে সমবেত হইয়া থাকে। গ্রামের পশ্চিম উত্তর সীমায় বাসুদেব বাড়ী অবস্থিত। এস্থানে একটী অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কে, কেন যে ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় নাই। যৌবনাবস্থায় উপযুক্ত রক্ষক অভাবে মঠটী যখন জঙ্গলপরিবেষ্টিত হইয়া বার্দ্ধক্যের চিহ্ন ধারণ করিতেছিল, সেই সময়ে পুরাতন ভট্টাচার্য্য বাড়ীর কয়েকজন পড়ুয়া জঙ্গল মুক্ত করিয়া বিগ্রহটী পূজা করিতেন। জীর্ণ মঠটী দেহভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে। গ্রামবাসী কতিপয় যুবক স্থানটী খনন করিয়া মহাদেব মূর্ত্তির কিয়দংশ বাহির করিয়াছেন—মস্তক দ্বিখণ্ডিত। ঐ মঠ হইতেই উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী "মঠবাড়ী" নামে

অভিহিত। "চল্‌বল্‌খাঁর বেড়" ইছাপুরা গ্রামের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি। কথিত আছে, চল্‌বল্‌ খাঁ নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ঐ স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার বাসভবনের চারিদিক গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই লোকে ঐ স্থানকে "চল্‌বল্‌খাঁর বেড়" বলিয়া থাকে। চল্‌বল্‌ খাঁ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাবের বৃত্তিভুক্ বলিয়া তিনি খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চল্‌বল্‌ খাঁ মুসলমান ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কারণ আদিম মুসলমানগণের পুকুর পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ছিল, হিন্দুর পুকুর তাহার বিপরীত। চল্‌বল্‌ খাঁর যে গভীর জলপূর্ণ পুকুরটী আছে যাহার পারে ৺ চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বসত বাটী অবস্থিত,—তাহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। * এই গ্রামের প্রসিদ্ধ কালী বিক্রেতা নবকান্ত মুখোটির

---

* ইহা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। চল্‌বল্‌ খাঁ জাতিতে যাহাই হউন না কেন হিন্দু ব্যতীত অন্য কেহ যে উত্তর-দক্ষিণদিকের দৈর্ঘ্যে দীঘি করে না, ইহা ঠিক নহে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের খনিত দীঘিরই উত্তর দক্ষিণদিকে দৈর্ঘ্য দেখা যায়। অধুনা বিক্রমপুরেও বহু ধনী মুসলমানেরা যে সকল দীঘি পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন তাহাতেও ত ঐরূপ কোন বিশেষত্ব নাই। কাজেই উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতিরেকে তাঁহার জাতির বিষয় সপ্রমাণ হয় না; খাঁ উপাধিধারী বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কুশারিপাড়ার মাশ্চটক বংশের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীমন্তের খাঁ উপাধি ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ মৌলভি সৈয়দ এম্‌দাদআলি বলেন "ইছাপুরা" এই নাম হইতে বারভুঞার অন্যতম স্বদেশ-প্রাণ দেওয়ান ইসাখাঁ মসনদ আলির কথাই স্মরণ-পথে উদিত হয়। হয়ত তাঁহার কোন ভক্ত আত্মীয় বা কর্ম্মচারী গ্রামের এই নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই নামকরণ সম্বন্ধে খাঁটি ইতিহাস জানার কোন উপায় নাই। ইছাপুরা পূর্ব্বে মুসলমান ভদ্রলোক পূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। তবে পাঠান ভূস্বামী চল্‌বল্‌ খাঁর বিস্তীর্ণ পরিখাযুক্ত সুবৃহৎ বাড়ীর কথা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারাই লেখকের সহিত একমত হইবেন। * * * যাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সড়ক দিয়া কখনও ইছাপুরা অতিক্রম

জনৈক পুর্ব্ব পুরুষের নাম ও সদানন্দ খাঁ ছিল। তিনিও নবাবের বৃত্তিভুক্ ছিলেন। এ গ্রামে একটী দীর্ঘিকা আছে। অনুমান বহুকাল পূর্ব্বে কোন ধনবান ব্যক্তি ইহা খনন করাইয়াছিলেন। ইদানীং এই দীঘির পশ্চিম পার খননকালে একটী ইটের-ঘাটলা দেখা গিয়াছে। আজ কাল দীঘিটী "দলে" আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই "কমলাসাগর" দীঘি নামে অভিহিত। ইহার সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুনা যায় "লোকের পুকুর" নামে একটী বড় পুষ্করিণী গ্রামের মধ্যভাগে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে লোকনাথ নামে এক ব্যক্তি এই পুকুর খনন করিয়াছিল। তাহার নামানুসারেই "লোকের পুকুর" বলা হয়। আবার অনেকে বলেন যে ইহার নাম "লোহার পুকুর"। আবার কেহ কেহ বলেন যে লোহার ঠাকুর পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহাকে "লোহার পুকুর" বলে।

যাহা হউক, কারণদ্বয়ের কোনটিই ভিত্তিশূন্য বলিয়া বোধ হয়না। এপুকুর হইতে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার একটী ইছাপুরা গোস্বামী-বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত মাধব মূর্ত্তিও এ পুকুরে পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা শিয়ালদি গোস্বামী-বাড়ীতে স্থাপিত আছে। ইহা "চন্দ্রমাধব" নামে প্রসিদ্ধ। দোলের পর হুলির দিবস এস্থানে একটী শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া থাকে। বাজারের থালে মনসাপূজার পর দশহরা ও নৌকার "বাইচ" হইয়া থাকে। এ গ্রামে ৪০ খানারও অধিক দুর্গোৎসব হয়। পূর্ব্বে ইছাপুরার ক্রিকেট ও ফুটবল "ক্লাব" প্রসিদ্ধ ছিল।

করিয়াছেন তাঁহারাই চল্‌বল্ খাঁর বাড়ীর দক্ষিণ-পরিখা দৃষ্ট করিয়াছেন। বাজারের সন্নিকট উত্তরে যে গভীর দীর্ঘ জলাশয় দেখা যায় উহাই সেই পরিখার একাংশ। এইরূপ সুবৃহৎ বাড়ী উত্তর বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী ব্যতীত আর নাই।" আর একটা কথা এই যে নগদের খনিত পুষ্করিণীই পূর্ব্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য হয়—মুসলমানের নহে।

"বিক্রমপুর"—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৪৩ পৃষ্ঠা।

প্রতিবৎসর এস্থানে তিনটী করিয়া মেলা বসিয়া থাকে। তন্মধ্যে ৺ চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। একটী হরিসভা ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার লালবাড়ীতে সভা হইয়া থাকে। মুষ্টি ভিক্ষা-সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ করাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

কালীপাড়ার জমিদার ঃ—বিক্রমপুরে কালীপাড়ার জমিদারগণ বিশেষ বিখ্যাত। কীর্ত্তিনাশা ইহাদের প্রিয় বাসভবন উদরসাৎ করিলে পরে এই জমিদারগণের অবস্থা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাঁহারা নানাগ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের পশ্চিমের ও বড় হিস্তার বাবুগণ আসিয়া ইছাপুরা গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে সুরম্য বাড়ীটি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাই কালীপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী, সুরেশবাবু অমায়িক লোক। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র স্নানের সময় সুরেশবাবুর বাড়ীতে বহুযাত্রী সমবেত হয়। "কমলাসাগর" দীঘির উত্তর পার শ্রীযুক্ত বাবু নর্ম্মদাকান্ত ও যোগেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরীদ্বয়ের বাসভবন অবস্থিত।

তাহার নিকটেই সূর্য্যকান্তবাবুর বাড়ী। যদিও পদ্মার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ইঁহাদের বহুসম্পত্তি অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে, তথাপি বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ জমিদারের মধ্যে ইঁহারাই ধনে মানে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রামবাসী ৺চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বজন পরিচিত। ইনি ঢাকা নবাব বাহাদুরের ষ্টেটে সুচারুরূপে কার্য্য করিয়া, প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া, স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দুর্গোৎসবে প্রচুর ব্যয়, দানসাগর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার সৎকার্য্য করিয়া যশলাভ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে সহস্র সহস্র যাত্রী

সমবেত হইয়া থাকে। ধনজন সমৃদ্ধ এই গাঙ্গুলীপরিবারের এখন আর সেই পূর্ব্বাবস্থা নাই।

শিক্ষিতলোক ঃ—এই গ্রামস্থিত ভট্টাচার্য্য বাড়ী হইতে বহু বিজ্ঞ-লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই ভট্টাচার্য্যবংশের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। অতিথিসেবা ইহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীর সংখ্যা কম নহে। বি, এ উপাধিধারীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন হইবে। কতিপয় মৃত ও জীবিত ব্যক্তির নাম নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

স্বর্গীয় গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার, ইনি ন্যায়শাস্ত্রে বিক্রমপুরের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদীয় দেবোপম চরিত্র ও স্বার্থ-ত্যাগ দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইতেন।

৺গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ, ৺কমলাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, ৺রুক্মিণীকান্ত তর্ক-চূড়ামনি, কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, ৺হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন, ৺রজনীকুমার তর্করত্ন প্রভৃতি সকলেই ন্যায়শাস্ত্রে এক এক জন বড় পণ্ডিত ছিলেন। ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।

৺ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল—ইনি মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পবিত্র চরিত্র, দানশীলব্যক্তি ইছাপুরা গ্রামে খুব কমই ছিল।

রায় শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্, এ,—ইনি রাজ-সাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত আছেন।

বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি সিরাজগঞ্জের একমাত্র প্রতিভাশালী উকিল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,—মহাশয় সুখ্যাতির সহিত মুন্সেফের কার্য্য করিয়া আজকাল সবজজের পদ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ১০০০৲ টাকা বেতনে সবজজের কার্য্য করিয়া অল্পদিন হইল পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন।

ইছাপুরা স্কুলের ইতিহাস।

গত ১২৮৬ সনে পদ্মানদীর প্রবলবেগে কালীপাড়া বটেশ্বর সাহাবাজ-নগর প্রভৃতি স্থান ভাঙ্গিয়া নিলে তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী ইছাপুরা আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখানে আসিয়া স্থানীয় বালকগণের লেখাপড়ার কোনরূপ সুবিধা না থাকায় বালিয়াটী বাবুদের সরকারের স্থানীয় কর্ম্মচারী তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রামস্থ নূতন বাসিন্দা সকলের সমবেত পরামর্শে বর্ত্তমান স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা ইছাপুর বাজারের পুকুরের পূর্ব্বপারে উক্ত জমীদার বাবুদের জমিদারী কাচারী ঘরে ১৮৮১ সনে মাত্র ১৩টী বালক নিয়া একটী পাঠশালা খুলিয়া ছিলেন।

স্কুল স্থাপনের (পাঠশালা) কিছুকাল পরেই মুন্সীগঞ্জের সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ত্রৈলোক্যনাথ সেন মহাশয় সিংপাড়া গ্রামে কোন বিশেষ তদন্ত করিয়া মুন্সীগঞ্জ ফিরিয়া যাইবার পথে উক্ত করুণা বাবুকে এ কাচারী ঘরে কয়েকটীমাত্র ছাত্র পড়াইতে দেখিয়া নিতান্ত উৎসুক হইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠশালাটী পরিদর্শন করেন এবং পাঠশালার ফলাফল দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হন। উক্ত ত্রৈলোক্য বাবু ভিজিট্‌বুকে যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান হাইস্কুলের ভিজিট্‌বুকের প্রথমেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত ত্রৈলোক্য বাবু করুণা বাবুর উদ্যোগ দেখিয়া তাহাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং যাহাতে ঐ স্কুলের প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ

হইতে পারে এইরূপ চেষ্টা করিবেন বলিয়াও ভরসা দিয়া যান। ত্রৈলোক্য বাবুর উপস্থিতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নূতন বাসিন্দাগণ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া স্কুলের জন্য বর্ত্তমান স্থানটীই নির্ব্বাচন করেন। ক্রমে স্কুলে ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উক্ত কাচারী ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, যে পর্য্যন্ত স্থায়ী স্কুল গৃহে প্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত রাসমোহন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে বড় একখানা আটচালা ঘরে উক্ত পাঠশালা স্থানান্তরিত হইয়া চলিতে লাগিল, ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সহকারী শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা হয় এবং কালীদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করা হয়। এইরূপে তিনজন শিক্ষক দ্বারা একবৎসরের অধিককাল উক্ত গোস্বামী বাড়ীতেই স্কুল চলিতে থাকে।

গোস্বামী বাড়ীতে ও ছেলেদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে হাইস্কুল যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে উক্ত বালিয়াটী জমিদার বাবুদের ব্যয়ে এবং নূতন বাসিন্দাগণের সাহায্যে একটী খরের আটচালা ঘর উঠান হয়।

ক্রমে ছাত্রসংখ্যা আবার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে তৎসঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের একটু ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা হয় কিনা তদ্বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হয়। তদনুসারে করুণা মুখোপাধ্যায়ই ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করাইলেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবের দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, জজকোর্টের উকিল হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ও ব্রজকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, করুণা মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া তৎকালীন স্কুল ইনস্পেক্টর স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয়কে ধরিয়া এই স্কুলকে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়া গভর্মেণ্ট হইতে মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং স্কুলের

উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গভর্মেণ্টের সাহায্য পাইয়া হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় হেড্‌মাষ্টার, করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় সেকেণ্ডমাষ্টার, গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় থার্ডমাষ্টার, রাসবিহারী মুখোটী হেড্‌পণ্ডিত এবং কালীদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া উক্ত মাইনর স্কুল পরিচালিত হইতে থাকে।

ইহার পূর্ণ উন্নতির সময়ে ইছাপুরার নূতন বাসিন্দাগণ কালীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট মাইনর স্কুলটী এণ্ট্রেন্সস্কুলে পরিণত করার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া উক্ত স্কুলটী এণ্ট্রান্সে পরিণত করতঃ কতকদিন বাজারের পুকুরের পার ও পরে ক্রমশঃ ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে চামারদি গ্রামে দুর্গাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটী বৃহদাকার খরের ঘর প্রস্তুত করতঃ তাহাতে চালাইতে থাকেন। ক্রমশঃই স্কুলের উন্নতি বিশেষতঃ স্কুলটী সম্পূর্ণভাবে শ্যামাকান্ত বাবুর আয়ত্তাধীনে চলিতে থাকায় তদীয় সরিকবাবুগণ অন্য একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল ইছাপুরার কতিপয় নূতন বাসেন্দার যোগে চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে স্থাপন করেন। এরূপভাবে দুইটী স্কুল কিছুদিন চলিবার পর উভয়পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগে চামারদি গ্রামের স্কুল গৃহেই মিলিত স্কুল চলিতে থাকাবস্থায় একটি ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখন বাবু দিগেন্দ্রচন্দ্র হাজরা বি, এ, হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। উপরোক্ত এণ্ট্রেন্স স্কুলে অধিকাংশ ছাত্র ফ্রি পড়াইয়া ন্যূনাধিক তিন বৎসর কাল চালাইতে কালীপাড়ার বাবুগণের বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহাতে বালকগণের শিক্ষার উন্নতির পরিবর্ত্তে নানাবিধ অসুবিধা অর্থক্ষয় ও গ্রাম্যদলাদলির সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন লাভ নাই বিবেচনায় সর্ব্ববাদিসম্মত একটী স্কুল করা আবশ্যক বোধে উক্ত মাইনর স্কুলেরই উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হয়।

এদিকে মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় পদত্যাগ করিলে ইছাপুরা গ্রামবাসী রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লৌহজঙ্গ মাইনর স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদ পরিত্যাগ করতঃ নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের উন্নতিকল্পে এই মাইনর স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার কার্য্যগ্রহণের কিছুকাল পরেই কোন দুষ্ট বালক কর্ত্তৃক মাইনর স্কুল গৃহ ভস্মীভূত হয়। পরে স্কুলের স্থানের সুবিধা না হওয়ায় উক্ত রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাহার নিজ বাড়ীতে নিজ ব্যয়ে ঘর উঠাইয়া তন্মধ্যে স্কুল চালাইতে থাকেন।

এই সময়ে মাইনর ক্লাসের উপরে কয়েকটী অতিরিক্ত ক্লাসে ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ছেলেদের পড়ার সুবিধা করিয়া দেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা ঐসব অতিরিক্ত ইংরেজী ক্লাস পড়ান হয়। এই বিষয় গভর্মেণ্টের গোচর হইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়। তখন এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় ও রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, করুণা মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের অদম্য চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্কুলটী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। তৎপর দিন দিনই স্কুলের অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইতঃপূর্ব্বে স্কুলের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অবৈতনিকভাবে এবং অন্যান্য শিক্ষক ও পণ্ডিতগণ নামমাত্র স্কুলের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইছাপুরের নূতন বাসিন্দাগণ পুনরায় স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৮০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিলে পর আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুরার পুরাতন বাসিন্দা) মহাশয় হাইস্কুলের বর্ত্তমান উত্তরের ভিটীর টিনের আটচালা ঘরখানা নির্ম্মাণ করার সমস্ত ব্যয় নিজে সম্পূর্ণ বহন করিবেন প্রস্তাব করিয়া নূতন বাসিন্দাগণের সহিত যোগদান করার মত প্রকাশ করেন। এবং ১২০০৲ শত টাকা

দিতে তিনি প্রস্তুত হন। নূতন বাসিন্দাগণ উক্ত টাকা গ্রহণ করতঃ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ এবং কতক টাকায় স্কুলের আসবাব খরিদ করেন। নূতন বাসিন্দাগণ হইতে গৃহীত ৭০০৲ টাকা তৎসময়ের জন্য সকলকে ফেরত দেওয়া হয়। বর্ত্তমান হাইস্কুল নিজ আয়ে দাঁড়াইবার মত না হওয়া পর্য্যন্ত মাইনর স্কুল স্থাপন হইতে নূতন বাসিন্দাগণ সময় সময় এককালীন যথেষ্ট সাহায্য এবং মাসিক চাঁদা দিয়া ও স্কুলের বিদেশীয় ছাত্র ও মাষ্টারগণকে অনেকে স্বীয় স্বীয় পরিবারের মধ্যে আহার ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হাইস্কুলের সেক্রেটারী পদে উপরোক্ত ঢাকার নবাবের দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং জজকোর্টের উকিল হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিযুক্ত থাকা সময়ে তাহাদের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় এবং হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু রায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সুচারুশিক্ষা প্রণালীতে স্কুল ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া শীর্ষস্থানীয় হইয়া প্রায় ৮৫০০৲ টাকা স্কুলফণ্ডে জমিয়াছিল, যাহা দ্বারা বর্ত্তমান স্কুলের জন্য মাঠে জমি লইয়া এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য স্বচ্ছলরূপে হইতেছে। এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা নূতন বাসিন্দাগণ মধ্যে প্রায় সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্কুলের কল্যাণকামী চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, ব্রজকান্ত ও ব্রজবাসী গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত গোবিন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৬।৭ বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্কুলের কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ও যোগ্যতার সহিত স্কুলের কার্য্য পরিচালনা করেন। তৎপর অস্থায়ীরূপে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গুপ্ত মহাশয় প্রায় দুই বৎসর কাল স্কুলের

সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে বিগত ১৯১১ সনে কালীপাড়ার খ্যাতনামা জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

ইছাপুরা গ্রামের পঞ্চরত্ন মঠ।

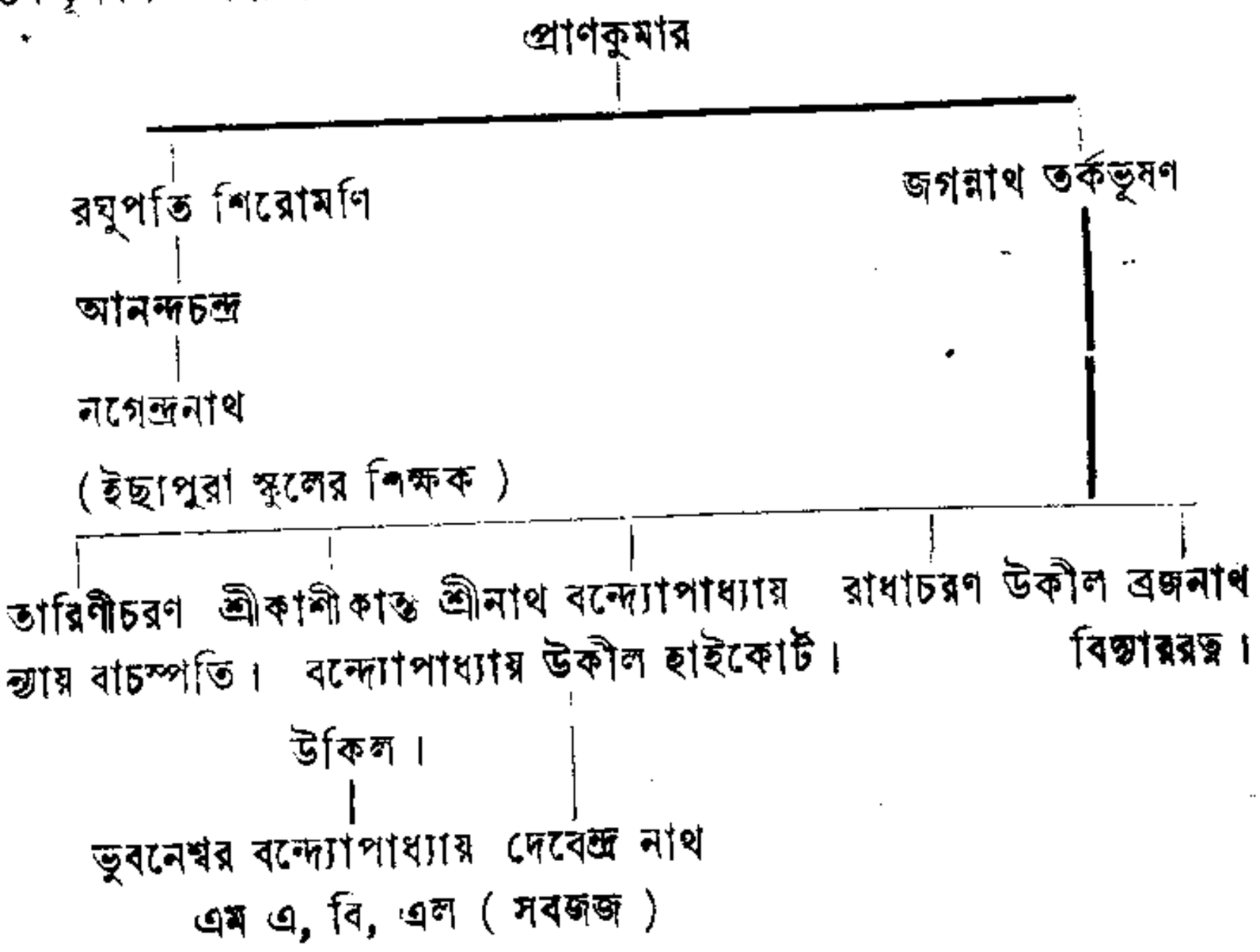
এ গ্রামে একটী পঞ্চরত্ন মঠ আছে। মঠটী একশত একষট্টি বৎসরের প্রাচীন। বঙ্গাব্দ ১১৬৫ সনে প্রতিষ্ঠাপিত। এই মঠটি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় **গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার** কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বংশ প্রায় দুইশত বৎসর যাবত ইছাপুরা গ্রামে বাস করিতেছেন। গঙ্গাধর তর্কালঙ্কারের পিতা স্বর্গীয় মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইছাপুরা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ইঁহাদের আদি নিবাস কালীপাড়ায় ছিল। এ বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করায় ভট্টাচার্য্য এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎকালে ন্যায়শাস্ত্রে বিক্রমপুরের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। **মহারাজা রাজবল্লভের** তখন অখণ্ড প্রতাপ, সর্ব্বোপরি তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। দেশের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, বহু পণ্ডিতই তাঁহার অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং ধনে জনে সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভ পণ্ডিত মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার বাস্তবাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বহু জমি এবং প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা নাল জমি ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর দান করেন। পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকেও একটী চতুষ্পাঠি বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত দশ খানা বাড়ী ও পাঁচখানা নাল জমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি মহারাজ রাজবল্লভের এইরূপ শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে তিনি তাঁহার প্রতি

সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালীন মাসিক ৩০০৲ তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় মহারাজের এই দানের কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি এইরূপ দান গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণের জন্য ধন সম্পত্তি রাখিয়া যাই তাহা হইলে তাহারা ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মনোযোগী হইবে না।' অপর একজন প্রখ্যাতনামা ধনীও পণ্ডিতমহাশয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বাটীতে একখানা দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত ব্যক্তির রাজসিক ঐশ্বর্য্যের কোনও প্রয়োজন নাই, পর্ণকুটীরই উপযুক্ত স্থান। আপনি দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন বটে কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যখন বংশধরগণের মধ্যে উহা লইয়া বিষম কলহ বাঁধিবে তখন সে গোলযোগ কে নিষ্পত্তি করিবে? ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন বড় ভয়ঙ্কর; আপনার এ মহত্ত্বের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্রাহ্মণপণ্ডিতরূপে থাকাই ভাল।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় এক দিকে যেমন মহাসাধু পণ্ডিত ছিলেন, তদ্রূপ চরিত্রগুণেও অতিশয় আদর্শ পুরুষ ছিলেন। একবার তাঁহার বাড়ী ডাকাইতে আক্রমণ করে, সে সময়ে তিনি পঞ্চরত্ন মঠটি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ডাকাতদল কোনরূপেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, যে দিকে যায় সেই দিকেই কণ্টকময় বদ্ধ পথ। পরদিন রাত্রি প্রভাত হইলে ডাকাতগণ চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "তোদের দেবতাসাধন আছে, তাই আজ রক্ষা পাইলি, চাল, ডাল দান করিস্।" ঐ সময় হইতেই তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বোপার্জ্জিত "নাগর ডাল", "বাইর গাঁও" প্রভৃতি মহাল বার্ষিক অতিথিসেবা ও দেবদেবীর পূজার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া যান।

গঙ্গাধরের পুত্র গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ও তৎপুত্র কমলাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও রুক্মিণীকান্ত তর্কচূড়ামণি ও কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। কাশীকান্তের পুত্র হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন ও কাশীকান্তের অপর ভ্রাতা গোপীকান্তের পুত্র রজনীকুমার তর্করত্ন ন্যায়শাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। উক্ত রজনীকুমার তর্করত্ন মহাশয়ের ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মাদারীপুরের উকীল ছিলেন। তৎপুত্র রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বাহাদুর রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। আর হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ পুত্র সূর্য্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার।

৺ গঙ্গাধরের ভ্রাতা রামশঙ্করের এক পুত্র রামদাস বিদ্যালঙ্কার ও অপর পুত্র প্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রঘুপতি শিরোমণি; জগন্নাথ তর্কভূষণ। ইঁহাদের বংশাবলী এইরূপ।



এখন মঠটির কথা বলা যাউক। এই মঠটির চারিদিকে চারিটি চূড়া ও মধ্য স্থানে একটি উচ্চ চূড়া বর্ত্তমান আছে বলিয়াই ইহা পঞ্চরত্ন মঠ নামে অভিহিত। ইহা হিন্দু স্থাপত্যানুকরণে গঠিত। মন্দিরগাত্রে একটী খোদিত লিপি আছে, তাহাতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখ উল্লিখিত আছে।

গ্রাম্য বিবরণ—পানিয়া।

চতুঃসীমা:—পানিয়া বিক্রমপুরের একটী সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রধান পল্লী। ইহা বিক্রমপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ব্রাহ্মণখোলা; পূর্ব্বে খিলগাঁও; দক্ষিনে উত্তরগাঁও ও পুরারবাগ এবং পশ্চিমে কাননীসার, চৌধরিয়া ও সোন্ধারদিয়া গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তর প্রান্ত ব্রাহ্মণখোলা হইতে দক্ষিণ-প্রান্ত পুরারবাগ পর্য্যন্ত প্রায় ২½ মাইল এবং পশ্চিম-প্রান্ত কাননীসার হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত খিলগাঁও পর্য্যন্ত প্রায় ১½ মাইল স্থান বিস্তৃত। বিগত আদমসুমারী মতে এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় সার্দ্ধত্রিসহস্র।

গ্রাম্য-বিবরণ—পানিয়া গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য জনপ্রবাদ বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই গ্রামের একটী পাড়ার নাম গুজিরবাগ, জনপ্রবাদ এইরূপ যে, কোন গুজা [অর্থাৎ কুব্জা] স্ত্রীলোক এই স্থানে বাস করিত এই জন্য এই পাড়ার নাম গুজিরবাগ হইয়াছে।

এই গ্রামে কায়স্থ, বারুই, যোগী, ক্ষৌরকার, রজক, ভূঁইমালী, নমঃশূদ্র, বেলদার ও মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল জাতিই বসবাস করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব কম, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রামে বাড়ী করিয়াছেন।

কায়স্থগণ মধ্যে মাঝিগণই বিশেষ প্রতাপান্বিত। ঘোষ, বসু ও হোড় মহাশয়েরা ইঁহাদের স্থাপিত। 'মাঝি' ইহাদের পদবী নয়, দে ইঁহাদের বংশগত পদবী। বংশ-পরম্পরা-বিশ্রুত জনপ্রবাদ এইরূপ যে কোনও যুদ্ধোপলক্ষে ইঁহারা রাজাকে রণতরী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এই 'মাঝি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারী সূত্রে ইঁহারা 'ভূঞা' সম্মান সূচক উপাধিতে সুপরিচিত।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত অপর সকল জাতিই প্রায় নিরক্ষর। তবে বারুইগণের মধ্যেও লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন দেখা যাইতেছে। নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা খুব খারাপ, বারুইগণ কৃষিকার্য্য করিয়া স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে। জনকয়েক ডাক্তার, কবিরাজ ও তালুকদার ব্যতীত গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রসন্তানই চাকুরীজীবি।

শিল্প—যুগিগণ বস্ত্রবয়ন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বস্ত্রবয়নই ইহাদিগের জাতিগত ব্যবসায়। ইহারা ধুতি, সাড়ি ও গামছা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

এখানে বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র মিস্ত্রীর বসতি; ইহারা কাষ্ঠের নানাদ্রব্য ও নৌকা প্রস্তুত করিতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত। স্বর্ণ রৌপ্যাদির দুই একজন সূক্ষ্মশিল্পীও এখানে আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য—বাণিজ্যে এস্থান উন্নত নয়; পাটও মধু এই স্থানের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। গ্রামে হাট বাজার নাই, সন্নিকটবর্ত্তী তন্তর ও সিংপাড়ার বাজারে গ্রামবাসিগণ দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। এই গ্রামে উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়। কয়েকঘর মুসলমান মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করে; মৌচাক ভাঙ্গিতে ইহারা বিশেষ দক্ষ।

রাস্তাঘাট—গ্রামে উল্লেখযোগ্য বড় রাস্তা নাই। পুরাতন রাস্তাসমূহ ও কৃষকগণ কোদালীর আঘাতে নিজ নিজ ক্ষেত্র সামিল করিয়া

নিতেছে এবং ক্ষেত্র সুরক্ষিত করিবার জন্য তাহাতে নানাবিধ কাঁটাগাছের বেড়া দিয়া চলাচলের বড়ই অসুবিধাজনক করিয়া রাখে।

শিক্ষা—পানিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী বেলতলী গ্রামে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নাই। এই গ্রামে একটী উচ্চ প্রাইমারী পাঠশালা ছিল, বৎসরাধিক কাল যাবৎ সেইটী স্থানান্তরিত হইয়া সন্নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণখোলা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুবকগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই গ্রামে আর একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে; উহার অবস্থা ভালই চলিতেছে।

পুস্তকাগার—উদ্যোগী যুবকগণের চেষ্টায় দুই তিন বৎসর হইল গ্রামে পানিয়া লাইব্রেরী নামে একটী সাধারণের পাঠাগার প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ছাত্রগণের ও গ্রামবাসী ভদ্রমহোদয়গণের প্রদত্ত চাঁদায়ই পুস্তকাগারের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহ হইতেছে।

চিকিৎসা—গ্রামে তিন জন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং ফকিরী মতে তিন জন কবিরাজ আছেন। ফকিরদের মধ্যে একজন বাক্সইজাতীয় স্ত্রীলোক। সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ইনি বেশ যশঃ ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত একটী দেবালয় আছে।

জল-বায়ু-স্বাস্থ্য—গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নয়। তবে ঋতুভেদে জ্বর, হাম প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; কলেরার প্রকোপ এখানে খুব কম।

বিগত ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এই গ্রামে যেরূপ ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। উক্ত মহামারীতে এই গ্রামের অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য বশতঃ মৃতদেহ দাহ বা সমাহিত করিবারও লোক মিলিত না।

মুন্সীগঞ্জের তদানীন্তন মহকুমা হাকিম কতিপয় অধস্তন রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যহারে হস্তিপৃষ্ঠে এই গ্রামে আগমন করিয়া বহুগৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। প্রবাদ এরূপ যে কলিকাতা হইতে প্রেরিত চাউলের বস্তার মধ্যে মহামারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত একটী ইঁদুর গ্রামে আসিয়া এই মহামারীর সৃষ্টি করিয়াছিল; তদবধি এই গ্রাম "প্লেগোল্ল পানিস্যা" বলিয়া প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

দীঘি-পুষ্করিণী—এই গ্রামের মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০টী হইবে; কিন্তু গ্রামের তুলনায় তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। সংস্কারাভাবে উহাদের ২।৪টী ব্যতীত গ্রীষ্মকালে প্রায় সকল পুষ্করিণীর জলই অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। সেই সময়ে গ্রামবাসী জনসাধারণকে জলকষ্টে বড়ই বিব্রত হইতে হয়।

এই গ্রামে "পুরাতন দীঘি" নামে এক বৃহৎ দীঘি আছে। এই দীঘিটার সহিত গ্রাম্য বিবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত রহিয়াছে প্রবাদ এইরূপ যে, এই দীঘিতে "সোনার নৌকা পবনের বৈঠা" ও বহু সংখ্যক ধাতুর বাসনকোষণ আছে!

বিখ্যাত নিম্ববৃক্ষ—এই গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটী বৃহদাকার নিম্ববৃক্ষ দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে বিস্ময়োদ্রেক করে। নিম্ব জাতীয় বৃক্ষ কোথাও এত বড় হইতে দেখা যায় না। ইহার গোড়ের ব্যাস ২১ কি ২২ ফিট। গ্রামের বৃদ্ধদিগের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা শৈশবাবধি এই বৃক্ষটীকে একই রকম দেখিয়া আসিতেছেন। রথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই বৃক্ষটীর ৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দাম হইয়াছে। এই বৃক্ষটীকে মহিলাগণ দেবতাজ্ঞানে তেল সিন্দুর বিলেপন করিয়া থাকেন।

প্রাচীন কীর্ত্তি—গ্রামের উত্তর প্রান্তে স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ীতে তদীয় মাতৃশ্মশানোপরি বিনির্ম্মিত একটী অতি প্রাচীন মঠ আছে।

মঠটী অতিশয় সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট স্থাপত্যানুদর্শে গঠিত। মঠটী উচ্চতায় ১৫০ শত ফিটের ন্যূন হইবে না।

বাস্তুভিটা—এই গ্রামে বাস্তুদেবের পূজা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। পানিয়া গ্রামের ভূম্যধিকারী ও তালুকদারগণ একত্রিত হইয়া প্রতি বৎসর একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই পূজা দিয়া থাকেন, এজন্য সে স্থানটীকে "বাস্তুভিটা" বলে। প্রতি বৎসর পূজোপলক্ষে বাস্তুদেবের নিকট ১১ এগারটী মেষ (মেড়া) বলি হইয়া থাকে। মেষ বলি দেখিবার জন্য সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু লোকের সমাগম হয়।

মেলা, গলইয়া—পূর্ব্বে এই গ্রামে একটী বৃহৎ মেলার অধিবেশন হইত। তাহাতে ঢাকার জন্মাষ্টমীর বড় চৌকির ন্যায় কাগজের বড় বড় চৌকি প্রস্তুত করা হইত; কিন্তু এখন সে মেলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এখানে গলইয়া মিলে; গলইয়া হইতে গ্রামবাসিগণ এক বৎসরোপযোগী 'ময় মসল্লা' ক্রয় করিয়া রাখেন। গলই-য়ায় নানা প্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ দে মহাশয়ের /১। সোয়া সের বারুদোদ্গীরণকারী একটী কামান ছিল, পূজার সময় নির্দ্দেশের জন্য উহা দ্বারা তোপধ্বনি করিতেন।

খ্যাতনামা ব্যক্তি—এই গ্রামে ভরসারাম দে নামক একজন অসীম সাহসী, শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; গ্রামে ব্যাঘ্রের উৎপাত হইলে তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে তাহা বধ করিতে ধাবিত হইতেন; এবং মুষ্টির আঘাতে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিতেন, এইরূপে বহু বার ব্যাঘ্র বধ ও বিতাড়িত করিয়া একবার স্বয়ং ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হন; তদবধি গ্রামে এইরূপ একটী প্রবাদ বাক্য চলিয়া আসিয়াছে—

"ভরসারামকে খাইল বাঘে
আর মানুষ কিসে লাগে।"

এই গ্রামের চন্দ্রমাধব ভূঁইমালী বিক্রমপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কবির সরকার ছিল। তাহার স্বরচিত বহু গান এখনও এতদাঞ্চলে গীত হইয়া থাকে।

গ্রাম্যবিবরণ—গাওদিয়া।

অবস্থান—গাওদিয়া উত্তর বিক্রমপুরের একটি বিখ্যাত গ্রাম। ইহা গৌহজঙ্গ হইতে উত্তরপূর্ব্ব কোণে অনুমান দুই মাইল দূরবর্ত্তী। গ্রামটির উত্তরে পানগাঁও, দক্ষিণে গাউপাড়া ও পাটনী গ্রাম, পূর্ব্বদিকে রাণাদিয়া পাথীদিয়া, হাড়ীদিয়া ও সামুরবাড়ী এবং পশ্চিমে বেজগাঁও, সংগ্রামবিল, দুয়াল্লী, ঋষি ও রাণাদিয়া গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দেড় বর্গ মাইল।

জনবিবরণ—গ্রামের জনসংখ্যা অনুমান চারি হাজার। ইহার অধিকাংশই হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, মালী, গোপ কুম্ভকার, নাপিত, যুগী, ভূঁইমালী, কৈবর্ত্ত; ধোপা ও নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতি এবং মুসলমানগণ সাধারণতঃ সাধারণ মুসলমান ও বাইদা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভদ্রলোকদের মধ্যে কয়েকজন উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ ও তালুকদার ব্যতীত প্রায় সকলের জীবিকাই সাধারণতঃ চাকুরীর উপর নির্ভর করে। নমঃশূদ্রদের মধ্যে সূত্রধরের কর্ম্ম করিয়া কেহ কেহ বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট নমঃশূদ্র ও মুসলমানগণ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনধারণ করে।

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে নীলের চাষ প্রচলিত ছিল। গাওদিয়ার নিকটবর্ত্তী ধাইদিয়া গ্রামে এখনও একটি নীলকুঠীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামের দুইটি স্থান ক্রমে বড় ও ছোট "মহিষখোলার ক্ষেত" বলিয়া পরিচিত।

গ্রাম্য হাট সপ্তাহে দুই দিন বসিয়া থাকে এবং তথায় প্রধানতঃ ধান্য, চাউল ও খৈল আমদানী এবং এই হাট হইতে পাট রপ্তানী হয়। ধাইলার সুস্বাদু ফুটি (ফুটি) বিক্রমপুরে সুপরিচিত এবং গাওদিয়ার হাটই ইহার প্রধান আমদানী স্থান বলিয়াও হাটটি বিখ্যাত।

শিল্প—শিল্পবিদ্যায় গাওদিয়া সমগ্র বিক্রমপুরে বিশেষ উচ্চস্থানে অবস্থিত। সুন্দর প্রতিমা তৈয়ার করিতে পারে বলিয়া এখানকার কুম্ভকারগণ পূর্ব্ববঙ্গে বিখ্যাত। এমন কি কলিকাতায়ও কোন কোন পরিবারে প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া ইহারা বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে। এখানকার সোলা ও রঙের কাজও উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। সোলার কাজে ৺ব্রজবাসী মালাকার ও রাঙ্গের কাজে মধু মালাকার সুপরিচিত। নমঃশূদ্রবংশীয় আমরি মিস্ত্রী সেতার, এসরাজ প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া গ্রামে কাপড়, গামছা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যময় অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিক্ষা—গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে। বালিকাবিদ্যালয়টি কয়েকবৎসর হয় উঠিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের শিক্ষার উপযোগী মক্তবও গ্রামে আছে। স্বর্গগত উৎসাহী যুবক দীনতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ স্থাপিত "দীনতারণ লাইব্রেরী' নামে গ্রাম্য পাঠাগারটির অবস্থা শোচনীয়।

সাহিত্য—রংপুর জেলাস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত গাওদিয়া নিবাসী ৺কামিনী সরস্বতী মহাশয়ের 'কুলকল্পলতিকা' খ্যাতনামা কুলগ্রন্থ। ইহাছাড়া নগরা গোপ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং নন্দ মালাকার নানা বিষয়ে ছড়া রচনা করিয়া বেশ নাম করিয়াছে।

আমোদপ্রমোদ—গ্রামে একটি থিয়েটারপার্টী আছে। নকরী-বয়াতীর দলও প্রসিদ্ধ। গ্রাম্য হুলিগানের দল (এক সময়ে বিখ্যাত ছিল)

এবং হরচন্দ্র পালের যাত্রার দল এখন আর নাই। গাওদিয়ার ঢাকী বিক্রমপুরে বিখ্যাত।

ইতিহাস ও খ্যাতনামা ব্যক্তি—প্রবাদ অনুসারে রায়বংশই গাওদিয়ার প্রথম অধিবাসী। ইহারা নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া "নিষ্কর জীবিকা" স্বরূপ গাওদিয়া গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই বংশীয় চাঁদ রায় কোনও কারণে কয়েকখানা নৌকাসহ বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী নদীবক্ষে ধৃত হইয়া রাজাদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ব্রাহ্মণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া ধর্ম্মপ্রাণা রাজমাতা বন্দীর সহিত দেখা করিয়া তাহার আত্মনাম গোপন করতঃ গন্ধর্ব্বেরমত সুন্দর পুরুষ বন্দী চাঁদকে গন্ধর্ব্ব রায় বলিয়া পরিচয় দিতে পরামর্শ দেন। পরে রাজামাতার অনুরোধে বন্দীর নাম সম্বন্ধে আবার অনুসন্ধান করেন কিন্তু রাজমাতার প্ররোচনায় তাহার নাম গন্ধর্ব্ব রায় বলিয়াই সকলে বলিল। বন্দী গন্ধর্ব্ব রায় নামে পরিচয় দিয়া কারামুক্ত হইলে রাজা চাঁদ রায় ব্রাহ্মণকে বিনা অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে বার খানা গ্রাম দান করেন। চাঁদরায় অতঃপর কখনও আর ঐ নামে আত্ম-পরিচয় দিতেন না এবং সেই হইতে তিনি গন্ধর্ব্ব রায় বলিয়াই পরিচিত হন।

এস্থলে এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে চাঁদ ও কেদার রায়ের শাসন সময়ে চাঁদ রায় ও রঘু রায় নামধেয় দুইজন ডাকাত বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। বেভেরিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিলে রঘুরায়ের বাসস্থান এক রকম চিনিয়া লওয়া চলে কিন্তু রঘুর বন্ধু চাঁদ রায় সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

এতগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব রায় বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। গন্ধর্ব্ব রায়ের যাত্রাবাড়ী, হাতী বান্ধাবাড়ী ও তৎখনিত পদ্মপুকুর ও প্রদীপ পুকুর এখনও তাহার স্মৃতি জাগরিত রাখিয়াছে। গন্ধর্ব্ব রায়ের তিন পুত্রের মধ্যে শিব রায় ও কৃষ্ণবল্লভ রায়ের দীর্ঘিকাও আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

স্বর্গীয় রজনীনাথ রায় (Assistant accountant general of India) এবং তৎকন্যা বিদুষী অমিয়া বানার্জ্জী (স্বর্গীয় W. C. Banerjeeর পুত্রবধূ) এই পরিবারকে সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরবস্থল করিয়া তুলিয়াছে। * গ্রাম সম্পর্কে এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে গ্রাম্য পোষ্টাফিসটি রজনীনাথ রায়ের চেষ্টায় স্থাপিত এবং গ্রাম্য ছাত্রবৃত্তি স্কুলটিকে মধ্যইংরেজী স্কুলে পরিণত করা এই বংশীয় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই কালীপ্রসন্ন নিজ জ্ঞাতি গৌরমোহন কর্ত্তৃক খুন হওয়ায়ই সমগ্র বিক্রমপুরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় রজনীনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র ৺রজতনাথ রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। ইঁদি একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন।

রায় বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে চাটাতি বংশের উত্থান সংঘটিত হয়। এই চাটাতীগণ গন্ধর্ব্ব রায়ের কন্যা কমলমণির বংশধর। গন্ধর্ব্ব রায় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে কন্যা দান করিয়া সেই গ্রাম জীবিকাস্বরূপ প্রদান করেন তাহাই এখনও হাড়ীদিয়া (হাড়ী—অন্নপাত্র অর্থাৎ জীবিকানির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত) নামে পরিচিত। ইহার বংশধরগণ পরবর্ত্তী সময়ে গাওদিয়ার বাটী নির্ম্মাণ করিলেও হাড়ীদিয়ায় তাহাদের বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও "চাটাতী বাড়ী" বলিয়া পরিচিত।

---

* 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

মহারাজ রাজবল্লভের নিকট হইতে কতকগুলি ভূমিপ্রাপ্ত হইয়া এই বংশীয়গণ ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের এক পরিবারে বাঁশের খুইয়ে লিখিত একখানা দানপত্র বর্ত্তমান আছে। যখন গাওদিয়ার সকল চাটাতী মহারাজের প্রসাদে ভূমি লাভ করেন, তখন মনিরাম চাটাতী অনুপস্থিত ছিলেন। পরে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া মহারাজের ঢাকার পথে বিখ্যাত মনাই ফকিরের দরগার নিকটবর্ত্তী বড় মোকামের বটবৃক্ষে অপেক্ষা করিতে থাকেন। রাজবল্লভের বজ্‌রা তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি সাঁতার কাটিয়া তাহার উপর উঠেন এবং নিজ অভাব জ্ঞাপন করেন। নৌকায় কাগজের অভাবেই নাকি তখন মহারাজ বাঁশের খুইয়ে এই দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার বলে মনিরামের বংশধরগণ এখনও কয়েক খণ্ড ভূমি ভোগ করিতেছেন।

এই চাটাতী বংশে গোপাল নামে একব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। বোধহয় গাওদিয়ার 'গোপালদীঘি' ইহারই খনিত। স্বর্গীয় ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইহার প্রস্তুত অট্টালিকা একটি দেখিবার বস্তু। উনত্রিশটি গ্রাম লইয়া গঠিত গাওদিয়া সমাজের তিনিই সমাজপতি ছিলেন। তিনি সমাজ-পতিরূপে অনেকগুলি কুল গ্রন্থ ও বিক্রমপুরের খ্যাতনামা প্রাচীন অনেক ব্যক্তির জীবনী সংগ্রহ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে অনাদরে গ্রন্থগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তিনি তুলাপঞ্চমী নামে বৃহৎ ব্রত এবং তৎসহিত ছয়মাস মহাভারত পাঠ ও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিয়াও নিজ সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেন। এই বংশীয় রাজকৃষ্ণ চাটাতীর স্ত্রী যেই স্থানে সহমরণ যান তাহার সন্নিকটে গাওদিয়ার শিবমন্দির স্থাপন ইঁহারই কীর্ত্তি।

তিনি অতিথিসেবার খুবই সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ আছে। গাওদিয়ার প্রথম হাট ইঁহারই স্থাপিত।

এই বংশীয় অন্যান্যের মধ্যে স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (Deputy inspector of schools) মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ও রায় বংশীয় বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার অত্যল্পকাল পরেই বি, এ পাশ করেন।

চাটাতী বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বারুয্যা বংশের উত্থান সংঘটিত হয়। ইঁহারা আবার চাটাতীদের দৌহিত্র সন্তান। গাওদিয়ার বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই চাটাতীদের স্থাপিত। বারুয্যা বংশে খ্যাতনাম্া স্বর্গীয় ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। তিনি পিরোজপুরের (বাখরগঞ্জ জিলায়) সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন এবং মৃত্যুকালে অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া যান। প্রবাদ আছে তিনি বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষেরই বর্ণনা ও দরখাস্ত এমনি ভাবে লিখিয়া দিতেন যে তাহাতে পরস্পর পক্ষের ক্ষতির পরিবর্ত্তে উভয় পক্ষেই লাভবান হইত। তাহার পরে মুন্সাবিদায় তৎসমকক্ষ স্থান এ পর্য্যন্ত আর কেহ অলঙ্কৃত করিতে পারে নাই বলিয়াই বাখরগঞ্জ জেলাবাসীর বিশ্বাস। বিক্রমপুরের গৌরব জনক অনুষ্ঠান সমূহের বর্ণনা করিয়া ভাটগণ যেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে, তাহাতে মাতৃভক্ত ভোলানাথের মাতৃশ্রাদ্ধের বিশেষ উল্লেখ আছে। এই শ্রাদ্ধে বঙ্গদেশীয় সমস্ত ঘটক, পণ্ডিত ও খ্যাতনাম্া পুরোহিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় এবং ঊনত্রিশ গ্রাম লইয়া গঠিত গাওদিয়া সমাজের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে দুইটাকা করিয়া দক্ষিণা দান করিয়াও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধেও নাকি উক্ত সমাজের সমস্ত ব্রাহ্মণ ঘটক পণ্ডিত ও পুরোহিতদিগকে এক টাকা করিয়া দান করিয়াছিলেন। সময়ে চাটাতীদের স্থাপিত অতিথিশালা উঠিয়া

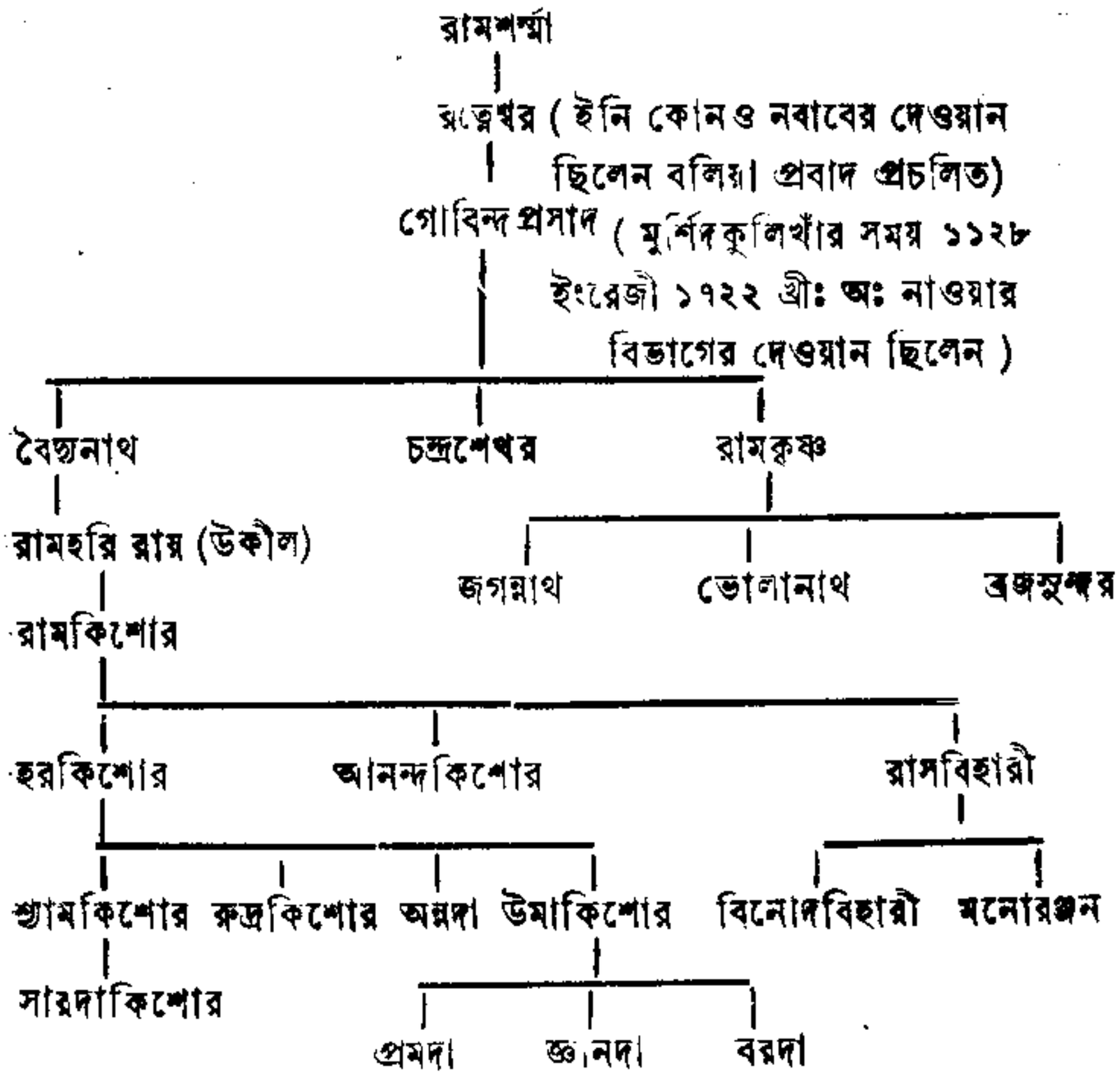
গেলে ভোলানাথ নিজ বাটীতে গ্রামে আগত সমস্ত অতিথিদের স্থান ও ভোজনের সুব্যবস্থা করেন এবং তাহার বংশধরগণ উহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আজও তাহার আতিথেয়তার চিহ্ন জাগাইয়া রাখিয়াছে। গাওদিয়ার বর্ত্তমান হাটটি ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরই স্থাপিত।

এই বংশীয় অন্যান্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি গ্রাম্য স্কুলের সেক্রেটারী, স্থানীয় পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্ট এবং গ্রাম্য হিতকর সমুদয় কর্ম্মে অগ্রগণ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তি।

মুসলমানদের মধ্যে মুন্সি আবদুললতিফ গত ব্যালকান মহাসমরের সময় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন।

গ্রাম্যবিবরণ—মাইজপাড়া।

মাইজপাড়া বিক্রমপুরের একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। শ্রীনগর থানার অন্তঃর্গত। শ্যামসিদ্ধি, কুশারীপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহ ইহার নিকটবর্ত্তী। উত্তর সীমা—মাঠাগাঁও, পূর্ব্বে পরাণীমণ্ডল, পশ্চিম সীমা—রাড়িখাল ও দক্ষিণ সীমা দাম্‌লা। এই গ্রামের রায় পরিবার বিশেষ খ্যাতিমান। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র শর্ম্মা আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ক্ষিতীশ হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ। রামচন্দ্র শর্ম্মা সুলতান সুজার সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে অত্যাচারের ভয়ে এই গ্রামে আগমন করেন। থানা-বাড়ী সংশ্লিষ্ট রামচন্দ্র শর্ম্মা নামের তালুক অদ্যাপি সুপ্রচলিত। এখানে এই পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশলতা প্রদত্ত হইল।



স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

এই বংশের ভাগিনেয় স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ৺ কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কথা আলোচনা করিতে হয়। মাইজপাড়ার প্রাচীন রায় উপাধিধারী জমিদারবর্গের নাম বহুকাল হইতেই বিখ্যাত। রায় জমিদারগণ নানা স্থান হইতে কুলীন আনয়ন পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিতেন। জমিদার ৺ রামকানাই রায় মহাশয় ফুলমেলের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান ৺ কমলাকান্ত

মুখোপাধ্যায় নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের নিকট স্বীয় কন্যা ৺ তিলোত্তমা দেবীকে সম্প্রদান করেন। এই তিলোত্তমা দেবীর গর্ভে মাতুলালয়ে মাইজপাড়া গ্রামে ৺কাশীকান্ত আনুমানিক ১৮৩৯—৪০ খ্রীঃ অঃ ভূমিষ্ট হ'ন। জন্মের মাত্র ছয়মাস পরে ইহার মাতার মৃত্যু হয়—বৃদ্ধা মাতামহী দয়াময়ী দেবী ইহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন।

সে সময়ে দেশে বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুযোগও সুবিধা ছিল না—বিশেষ কুলীন সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতাই বা কি? বহু বিবাহ তখন অতি উত্তম অর্থ সংগ্রহের পথ ছিল। তারপর মাতামহ রামকানাই রায় জামাতাকে যে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহার আয়ও সামান্য ছিলনা, ক্ষুদ্র সংসার সুন্দর রূপেই চলিতে পারিত। কিন্তু শিশু কাশীকান্ত গ্রাম্যবিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষা সমাপন করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মনের কথা মাতামহীকে বলিলেন। দয়াময়ী দেবী কিশোর কাশীকান্তের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাইয়া বিনাওজরে সম্মতি দিলেন এবং সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। ঢাকা ও কালীপাড়া ব্যতীত অন্যত্র তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। কাশীকান্ত ঢাকা হইতে ১৮৫৬—৫৭ খ্রীঃ অঃ সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়া উহা দুই বৎসর কাল ভোগ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া ইনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ও বঙ্গ ভাষার জন্য এক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

ছাত্র-জীবনে নিজ অধ্যবসায়ের গুণে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—কর্ম্ম-জীবনেও তিনি স্বীয় দেশপ্রীতি এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্যে দেশের ও দশের নিকট অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা প্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ ঢাকা পোগোজ স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।



স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

তাঁহার শিক্ষাদান কৌশলে এই বিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি হয়। সে সময়ে ঢাকার অন্যকোন বিদ্যালয়েই পোগোজ স্কুলের ন্যায় খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার কার্য্যগ্রহণের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ অক্টোবর মাসে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আসামের অন্তঃর্গত শিবসাগর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন—তখন যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল, সর্ব্বোপরি তাঁহার মাতৃস্থানীয়া মাতামহীর মত না হওয়ায় কাশীকান্ত গভর্ণমেণ্টের এই সাদর প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় (পি, কে, রায়,) এবং ঢাকা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ইঁহারই শিক্ষকতায় উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। গুণের আদর চিরদিনই হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট কাশীকান্তের গুণের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ তাঁহাকে ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। পোগোজ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার বিদায় গ্রহণ কালে পুরস্কার স্বরূপ সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেইন ও সুবর্ণপদক প্রদান করেন।

গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের নানাস্থানের বিদ্যালয়াদি পরিদর্শানন্তর দেশের প্রকৃত অভাব কোথায় তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে যে দেশ দিন দিন অবনত হইতেছে একথা তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলেন; দেশের সর্ব্বত্র স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কাশীকান্তের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টার মার্টিন সাহেব ইঁহাকে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারগণের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নতি করেন। এইবার

তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ঢাকার সর্ব্বত্র স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন—স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব একথা শিক্ষিতসমাজকে বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কথাও কাজ একসঙ্গে হইলে জনসাধারণ আপনা হইতেই সেইরূপ কর্ম্মীপুরুষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে, কাশীকান্ত এদিকে যেমন জনসাধারণকে স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইতেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল এবং বিক্রমপুরে ও ঢাকা জেলার নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সে সকলের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ ইনি রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, ঢাকা পরিত্যাগ করিবার সময় উক্ত ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষকগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ এখানে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

বহুমান্যাস্পদ

শ্রীযুক্তবাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়

ঢাকা জিলার ডেপুটিইন্‌স্পেক্টর

মহাশয় সদন্তঃকরণেষু।

মহাশয়!

আপনি এদেশীয় জনসাধারণের যেরূপ বান্ধব, আপনার স্থানান্তর গমন সংবাদ ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত দুঃখকর হইয়াছে। কেবল উন্নত পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন ইহাই নিতান্ত আহ্লাদের বিষয়। আপনি কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এদেশীয় লোকদিগের হিতসাধন কল্পে যেরূপ চেষ্টিত ছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কাহার না অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে পরিপূরিত হয়। আপনার যত্নেই এ অঞ্চলের পল্লীগ্রামে বালিকা-

বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয়, এবং আপনার যত্নেই এইক্ষণ স্ত্রী-শিক্ষার প্রথা বাহুল্য রূপে প্রচলিত হইতেছে। আমাদের এই বিদ্যালয়ও যে আপনার হস্তের এক প্রধান চিহ্ন তাহা বলা বাহুল্য। আমরা আপনার যত্নের প্রসাদেই একত্র সম্মিলিত হইয়া নিরাপদে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছি। আপনার এই কার্য্যটি স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিসাধক তাহা বলিয়া উঠা দুষ্কর। আপনি সময়ে এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে নানাপ্রকার নীতি ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশে আমাদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া আমরা কি করিব। কেবল স্মরণার্থ মনের আহ্লাদে, এই অভিনন্দন পত্রখানি আপনার হস্তে প্রদান করিয়া বিনীতভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, হে জগদীশ্বর! তুমি এই দেশহিতৈষী মহানুভব মহোদয়কে নিরাপদে রাখিয়া দীর্ঘজীবি কর। অপর ফটোগ্রাফ দ্বারা আপনার একটী প্রতিমূর্ত্তি আমাদের স্কুল গৃহে রাখার একান্ত বাসনা। ইহার ব্যয় আমরা চাঁদা দ্বারা উঠাইয়াছি। ভরসা করি স্নেহবশতঃ এবিষয় আপনি অনুমোদন করিবেন।

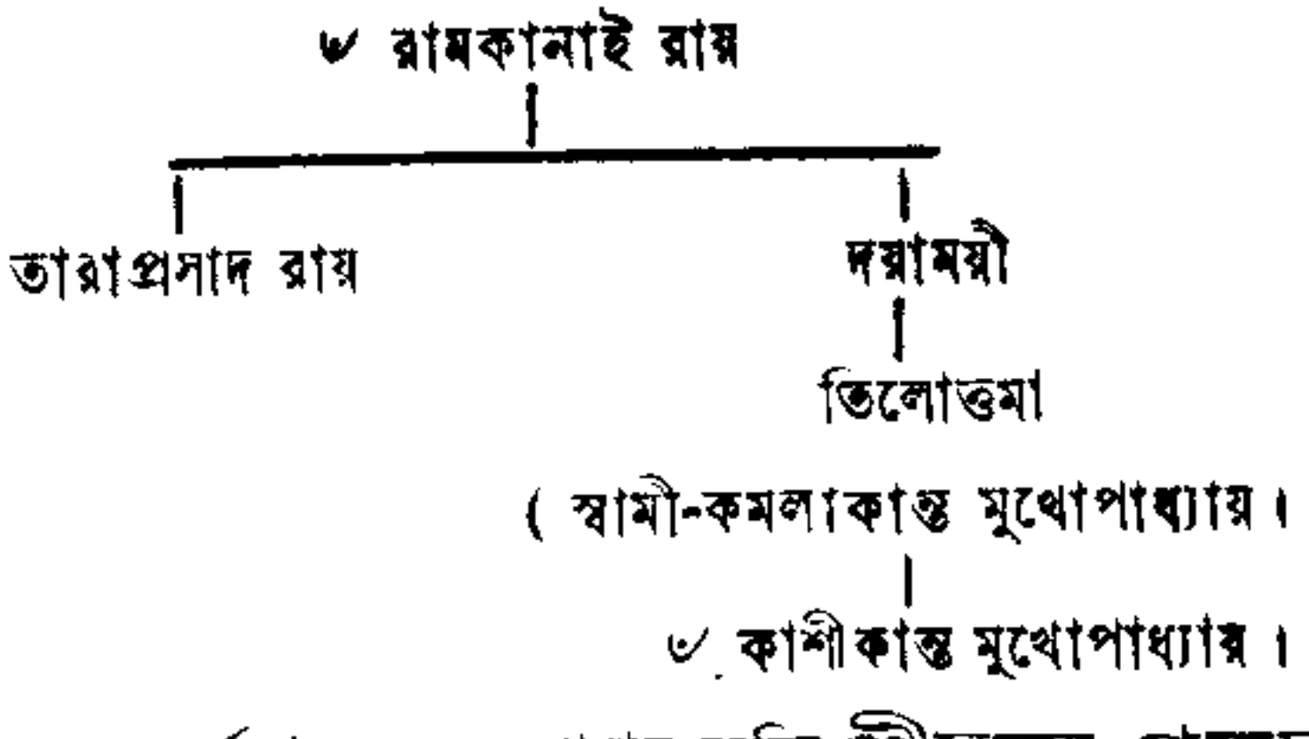
সন ১৮৬৫ ইং ২১শে আগষ্ট
ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল।

শ্রীমতী সরস্বতী প্রথম শ্রেণী—
শ্রীমতী বিদ্যামণি "
শ্রীমতী রাধারাণী দেবী "
শ্রীমতী হরিপ্রিয়া "
শ্রীমতী পরাণমণি "
শ্রীমতী সুমিত্রা দ্বিতীয় শ্রেণী—

শ্রীমতী কেলি খ্রীষ্টীরাণীও ও ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীগণ।

শ্রীমহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক—ঢাকা ফিমেল নর্ম্মাল বিদ্যালয়।

রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া সেখানেও স্বীয় প্রতিভা বলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জনসাধারণের মনোরঞ্জন করেন এবং রামপুরবোয়ালিয়ার চন্দ্রনাথ ফিমেল স্কুল, কাশীনাথ ফিমেল স্কল, তুষভাণ্ডার ফিমেল স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করেন। এইরূপে সর্ব্বত্র তাঁহার জ্ঞান বিস্তার চেষ্টা বিশেষরূপে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। সরকার বাহাদুর তাঁহার কার্য্যগুলি দৃষ্টে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া বিজনীরাজার অধীনস্থ স্থান সমূহে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে তাহা উন্নত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য আদেশ করেন। কাশীকান্তের একার্য্যে সরকার বাহাদুর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেশীয় রাজ্য কুচবিহার বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ অর্থাৎ ডিরেক্টার নিযুক্ত করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ এই পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অঃ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। কুচবিহারের কার্য্যের সময় তিনি স্বর্গীয় কুচবিহারের অধিপতি মহারাজাধিরাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, এস্, আইর অভিভাবক ও গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। কাশীকান্ত তেজস্বী সুবক্তা অথচ অত্যন্ত বিনীত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বর্ত্তমান কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির মূলে কাশীকান্তের অসামান্য প্রতিভা কৌশল কতখানি নিয়োজিত ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। কাশীকান্ত বিক্রমপুরের অতীতযুগের এক মনীষি পুরুষ, দেশের প্রকৃত অলঙ্কার। বিক্রমপুরের শিক্ষার উন্নতিকল্পে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন তাহা চিরদিন দেশবাসী শিক্ষিত নর-নারীর হৃদয়ে জাগরুক থাকিয়া তাঁহার গৌরব-স্মৃতি সঞ্চারিত রাখিবে। কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের মাতামহের বংশলতা এইরূপ।



রায় পরিবারের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের প্রধান ব্যক্তি **শ্রীযুক্ত প্রমদা-কিশোর রায়** এম্ এ, বি, এল। ইনি বর্ত্তমান সময় আসামের অন্তঃর্গত জোরহাটের গভর্ণমেণ্টের উকীল। প্রমদা বাবু দেশহিতৈষী, সদাশয় এবং শিক্ষা বিষয়ে মুক্ত হস্ত। আসামে তাঁহার ন্যায় অতিথিবৎসল ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। জোরহাটে তাঁহার বাসায় থাকিয়া বহু দরিদ্র শিক্ষালাভ করে।

মাইজপাড়া গ্রামে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দির ইত্যাদি অতি সুন্দর।

গ্রাম্য বিবরণ—রাজনগর-কুঠিবাড়ী।

রাজানগর কুঠিবাড়ী বিক্রমপুরের অন্তঃর্গত ইছামতী নদী তীরবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বমান একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কুঠিবাড়ী, রাজানগর মির্জ্জাকান্দা, নাগহাটি ও বইস্‌নাহাটি প্রভৃতি সমলগ্নবর্ত্তী অংশগুলিকে স্থূলতঃ রাজানগর নামে অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অংশগুলির প্রত্যেকটিকে আবার ছোট ছোট গ্রামরূপে বর্ণনা করা যায়। রাজানগর নাম হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বে ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহার উত্তরে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী ইছামতী, দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ শ্যামল শস্য

ক্ষেত্ররাজি, পূর্ব্বে নাগহাটি ও তৎপূর্ব্বে মোহনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম, পশ্চিমে তেঘরিয়া নামক গ্রামের অংশ বিশেষ।

নামের ইতিহাস—'কুঠিবাড়ী' নামের ইতিহাস এইরূপ,—পূর্ব্বে যখন এদেশে নীলের চাষ হইত, তখন রাজানগরেও নীলকর সাহেবদিগের কুঠি (Factory)ছিল। নীল ভিজাইবার সেই পুরাতন পাকা 'হাউজ' ও পাকা চুল্লীর ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। নীলকর সাহেবগণ যেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন উহাই মূল কুঠিবাড়ী নামে অভিহিত হয়। সেই সমস্ত পুরাতন অট্টালিকার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল বাড়ীটা বিদ্যমান্ আছে। নীলের চাষ উঠিয়া গেলে পর নীলকুঠির সাহেবগণ তাঁহাদের অধিকৃত চারিদিকের ভূমি ও কুঠিবাড়ী ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া যান।

এদিকে পদ্মার তীরবর্ত্তী ভাটার নামক স্থানে প্রতাপান্বিত বসুগণ বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন প্রতাপ ও কার্য্যকলাপের কাহিনী আজও তদ্দেশীয় লোকমুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কীর্ত্তিনাশা শত শত ব্যক্তির কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে সেই সর্ব্বগ্রাসিনী পদ্মা বসুদিগের বাড়ী ঘর ও প্রভূত ধনসম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে বসুগণ ক্রমে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহাদের কয়েক ঘর ঢাকার নিকটবর্ত্তী কতুল্লার নিকট বাস করিতেছেন; আর সকলেই এই রাজানগর কুঠিবাড়ীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। এই বসু পরিবারের স্বর্গীয় প্যারীমোহন বসু ও স্বর্গীয় মদনমোহন বসু মহাশয়দ্বয় কুঠিবাড়ী ক্রয় করিয়া অন্যান্যজ্ঞাতিগণসহ বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে এখানে দুই তিন ঘর ঘোষ ও মিত্র প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মূলকুঠিবাড়ীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বসুপাড়া কুঠিবাড়ী নামেই বিখ্যাত।

গ্রামের বিশেষত্ব ও পুষ্করিণী—এই কুঠিবাড়ীর বাড়ীগুলিতে প্রাকৃতিক কৃত্রিমতার মিশ্রণে যেবিশেষত্ব টুকু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই যে, ইহা চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বালান কোঠা, বহির্ভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পুষ্পোদ্যানে শোভিত। এখানে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে; তন্মধ্যে চারি পাঁচটী ভাল; অবশিষ্ট প্রায় সবগুলিই সংস্কারোপযোগী। সম্প্রতি সর্ব্বসাধারণের হিতকল্পে পানীয় জলের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণার্থ অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয়ের ব্যয়ে কুঠিবাড়ীতে ২০০ হাত দীর্ঘ ও ১৫০ হাত প্রস্থে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য—এই সকল কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রীতিপ্রদ। দৃশ্য মনোহর, এবং সাধারণ বর্ষাসমাগমে বিক্রমপুরের অধিকাংশ পল্লীগ্রামের মত ইহা একেবারে জলে ডুবিয়া যায় না।

অধিবাসী—পূর্ব্বোল্লিখিত ঘোষ বসু ও মিত্র প্রভৃতি কুলীন কায়স্থগণ সকলেই একপাড়ায় (কুঠিবাড়ীতে) বাস করেন। এতদব্যতীত এইগ্রামে ৭।৮ ঘর কুম্ভকার, একদল ব্যবসায়ী জাতি, ২।১ ঘর শূদ্র, ধোপা, কয়েক ঘর জেলে ও মুসলমানের বাস। ইহারা প্রায় অনেকেই গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। ব্যবসায়ীগণ সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন; ধান চাউল, কালাই, মরিচ অন্যান্য দ্রব্যসমূহ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া থাকে; এতদ্‌ভিন্ন ইহাদের প্রায় সকলেরই বড় বড় দোকানপশার আছে। স্থানীয় মুসলমানদের প্রকাশ্য নাম দফাদার; উহারা প্রতি বৎসর দলে দলে ভাটিয়াল পরগণায় গমন করে এবং সে স্থান হইতে নল কাটিয়া আনে। উহা দ্বারা 'চাঁচ', 'ডোল' প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা; ইহাছাড়া ইহাদের মধ্যে কোন কোন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ কৃষিকর্ম্ম করে; কেহ বা লোকের বাড়ীতে চাকুরী করে, আবার কেহ কেহ নৌকা

চালাইয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিয়া থাকে। মোট লোকসংখ্যা প্রায় দেড় সহস্র।

গ্রাম্য দেবালয়ের মধ্যে কুঠিবাড়ীতে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার গাছ আছে। এখানে কোন মন্দির নাই; গাছের গোড়ায় হিন্দুরমণীগণ তৈল সিন্দুর লেপন করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সেখানে পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। কথিত আছে যে নীলকর সাহেবগণ এখানে কুঠি স্থাপন করিলে একজন সাহেব রাত্রিকালে স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে ৺কালী কুঠির নিকটবর্ত্তী একটি প্রকাণ্ড নিম্বৃক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। সেই অবধি এই বৃক্ষ পূজিত হইয়া আসিতেছে। নীলকর সাহেবগণ ও নাকি নীল 'জাঁক' কিংবা 'জাল' দেওয়ার পূর্ব্বে এই গাছের গোড়ায় ভক্তিভরে পূজা দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কয়েক বৎসর যাবৎ সেই প্রকাণ্ড নিম্বৃক্ষের ভিতর হইতে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মিতে থাকে; কালক্রমে উহা আপন দেহ বিস্তার করিয়া যখন চতুর্দ্দিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইল তখন সেই প্রাচীন নিম্বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে নিম্বৃক্ষের চিহ্নস্বরূপ অশ্বত্থের শিকরাচ্ছাদিত নিমের গুঁড়ি এবং শিকড়ের দিক হইতে উত্থিত, একটি মাত্র সজীব নিমের শাখা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই অশ্বত্থবৃক্ষই প্রাচীন নিমের স্থান অধিকার করিয়াছে।

শিক্ষা।—এই গ্রামে কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নাই, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে এখানে বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বি এ, বি এল মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতে "শান্তিবালা শিশুবিদ্যালয়" নামক একটি পাঠশালা স্থাপিত আছে। এইস্থানে বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের বাস। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বসু বি, এ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (অবসরপ্রাপ্ত) ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু বিএ বি এল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু

বি, এ বি চট্টগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক ; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার বসু ব্যারিষ্টার কলিকাতা, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু এম বি, ইনি সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ইঞ্জিনিয়ার। কয়েক বৎসর হইল বসুবংশীয়া দুইটি মেয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পণ্ডিতা ৺ কুমুদিনী বসু 'অমরেন্দ্র', 'লহরী' ও 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

চিকিৎসা—গ্রামে দুই একজন কবিরাজ ব্যতীত ভাল ডাক্তার নাই।

বাজার ও পোষ্টাফিস—প্রতি শনি মঙ্গলবার বৈকালে 'হাট'মিলে এবং প্রতিদিন ভোরে বাজার বসে ; সেখানে দুধ মাছ ও তরিতরকারী প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য বিক্রীত হয়। এতদ্ভিন্ন বড় বড় দোকান ঘর আছে, সেখানে কাপড়, টীন, কাঠ, ধান, চাউল, তৈল, লবণ, ডাইল, গুড়, চিনি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মনোহারী দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে একটী ব্র্যাঞ্চ পোষ্টাফিস্ আছে।

স্মৃতিস্তম্ভ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া শান্তি-বালার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ ইছামতী নদীতীরে একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাস্তা ঘাট, সেতু—এই গ্রামে রাস্তাঘাটের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। কুঠিবাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বদিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা বরাবর সেরাজদিঘার দিকে এবং আরেক দিকে প্রায় একশত হস্ত দীর্ঘ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুর নিকট হইতে ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী সৈয়দপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তিন চারিবৎসর পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ইছামতী নদী দিয়া হাসাড়া ও শেখরনগরের দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য গমন করেন ;—ইহার কিছুকাল পরেই

ইছামতী নদীর উপরে প্রায় দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে ঐ সেতু নির্ম্মিত হয়;—এইজন্য ইহার নাম 'কারমাইকেল পুল'। রাস্তাগুলি প্রতি বৎসর ইউনিয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে সংস্কার করা হয়, প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে কাষ্ঠের সাকো নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষার জল যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইউনিয়ন কমিটি ও গভর্ণর—মুন্সীগঞ্জ সব-ডিভিসনের মধ্যে যত-গুলি ইউনিয়ন কমিটি আছে। তন্মধ্যে রাজনগর ইউনিয়ন কমিটির কর্ম্মকুশলতায় সর্ব্ব প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। এই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত লালমোহন বসু।

গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে বঙ্গদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ডরোণাল্ডসে বাহাদুর 'ইউনিয়ন্‌কমিটির' কার্য্য পরিদর্শনার্থ রাজানগরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইনি এই গ্রাম ও 'ইউনিয়ন্ কমিটি' সম্বন্ধে খুব সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

গ্রাম্য বিবরণ—শেখরনগর।

শেখরনগর স্বাভাবিক-পরিখা-বেষ্টিত,—ইহার পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম সীমা ইচ্ছামতী (ইছামতী) নদী, দক্ষিণ সীমা বৃহৎ আইরল বিল। এই গ্রাম ঢাকা নগরী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পদ্মা হইতে আট মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। পদ্মাতীরস্থ ভাগ্যকূল ষ্টীমার ঘাট। থানা সেরাজদি খাঁ, পরগণা প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশ মুকুন্দাপুর, জেলা জাহাঙ্গীরনগর, বর্ত্তমান ঢাকা। গ্রামে পোষ্ট-অফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। গ্রামের স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল ছিল, কিন্তু নদী শুষ্কপ্রায় হওয়াতে ইদানীং তাহার অবনতি ঘটিয়াছে। এই বৃহৎ গ্রামে নানা-জাতীয় বহুসংখ্যক লোকের বাস। শেখরনগরে প্রাচীনকালের গ্রামের

গ্রাম্য-বিবরণ।

আদর্শ আজও প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। গ্রামের উত্তরভাগে ভূম্যধিকারী চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ী। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা ও প্রাচীরের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। বাড়ীর সম্মুখে একটী প্রাচীন বৃহৎ তোরণ কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। সেই পরিখা-বেষ্টিত পুরাতন বাড়ী বংশবৃদ্ধিসহকারে সাতটী পৃথক্ বাড়ীতে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিকে বহু শিকদার (নফর) এবং দক্ষিণে পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তিলি, জোলা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির পৃথক্ পৃথক পরস্পরসন্নিহিত বসতি এখনও প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে। চৌধুরী মহাশয়-দের আত্মীয় ঘোষ, বসু ও গুহ-বংশীয় কুলীন এবং তদ্ব্যতীত পৈত, দেব, সেন, নাহা ও দত্ত-বংশীয় অনেক কায়স্থ ক্রমে এই গ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত একটী মুসলমান ও এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন নাই।

চতুঃশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে লোকনাথ পাল নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিনাজপুর হইতে বিক্রমপুরে আসিয়া ইচ্ছামতীতীরে, বর্ত্তমান শেখরনগরের —উত্তরে, ফৈনপুর-নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। চিরাগত প্রবাদ এই যে, লোকনাথ বরেন্দ্র-ভূমের পালরাজগণের বংশসম্ভূত এবং কোন কারণে বিপন্ন হইয়া দিনাজপুর হইতে বিক্রমপুরে আগমন করেন। ফৈনপুরে বসতিস্থাপনের অল্পকাল পরেই সুবে বাঙ্গলার এক উচ্চ পাঠান কর্ম্মচারী ইচ্ছামতী নদী দিয়া গমনকালে লোকনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তদীয় বংশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুবাদারকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করেন। তাহার ফলেই লোকনাথের পুত্র চন্দ্রশেখর দিল্লীর সম্রাট্ হইতে জমিদারী নুরুল্লাপুরের সনদ লাভ করেন এবং বাঙ্গলার সুবাদার তাঁহাকে রায়চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। প্রাচীন দলিল পত্রে তাঁহার বংশধরগণ কোথাও রায়চৌধুরী, কোথাও পালচৌধুরী,

কোথাও বা কেবল চৌধুরী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর জমিদারী লাভ করিয়া ফৈনপুরের দক্ষিণে ইচ্ছামতীর ত্রিধারার মধ্যে নিজ নামানুসারে **শেখরনগর** নামক বৃহৎ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্ব ইতিহাস।

সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে চন্দ্রশেখরের পৌত্র রাজারাম পালচৌধুরী বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার, সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সাহসুজার অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজারাম সুবাদার সাহসুজা হইতে শেখরনগরের অনতিদূরে (৪ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে) কিস্‌মত হাসাড়া ও কিস্‌মত আমীরাবাদের অন্তর্গত "চৌঘুরা" (পরিখা-বেষ্টিত) একটী বৃহৎ বাটী শ্রীধরনারায়ণ বিগ্রহের সেবা ও পূজার জন্য নিষ্কর দেবোত্তররূপে প্রাপ্ত হন এবং তদবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম রায়ের সহিত শেখরনগর হইতে হাসাড়া যাইয়া বাস করিতে থাকেন। সাহসুজা হইতে তিনি এই দেবোত্তর ভূমির যে সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সনদ কোন মোকদ্দমায় জেলা জাহাঙ্গীরনগরের (বর্ত্তমান ঢাকা জেলার) জজ আদালতে দাখিল হইয়াছিল। এস্থানে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

সুবাদার শাহ সুজা-প্রদত্ত সনদের বঙ্গানুবাদ।

শাহ সুজা

বাদসা গাজি

সরকার জাহাঙ্গীরনগরের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনসবদার' কাননগো ও পাটওয়ারিগণ জানিবে, যেহেতু সরকার জাহাঙ্গীরনগরের অধীন নরুল্লাপুর, মহাল সাবন্দর, মৌজা শেখর-নগরের অধিবাসী বহুমানাহ রাজারাম পাল চৌধুরী দীর্ঘকাল যাবৎ মহিমান্বিত সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং দক্ষতার সহিত সন্তোষজনকরূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন,

অতএব তাঁহার প্রশংসনীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সদর জাহাঙ্গীরনগরের অধীন, কিসমত হাসাড়া, তপ্পা হাওলি এবং তপ্পা কিসমত আমিরাবাদের মধ্যে, যাহা পূর্ব্বে মহম্মদ খানের বসতবাড়ী ছিল সেই চৌঘুরা ভূমি, ন্যূনাধিক একদ্রোণ জমি, শ্রীধরনারায়ণ বিগ্রহের সেবা ও পূজার জন্য দেবোত্তররূপে ও নানকার স্বরূপে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি মালিকি স্বত্ব এবং অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি দান, বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাবিহীন থাকিয়া—উক্ত প্রদত্ত ভূমি দখল করিবে এবং উক্ত ভূমির উপস্বত্ব হইতে যোগ্যতার সহিত উক্ত দেবতার সেবা ও পূজা করিবে এবং অন্যের বিনা আপত্তিতে সরকার প্রদত্ত ঐ ভূমি বরাবর দখল করিতে থাকিবে। তোমরা সরকারের ন্যায্য খাজানার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে কোনরূপ তাড়না করিবেনা এবং তাঁহাকে কোনরূপ বারবরদারী দিতে বাধ্য করিবে না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি হইতে কোনরূপ বাধা ব্যতিরেকে দখলকার থাকিবে ও পূজা নির্ব্বাহ করিবে, এবং এইরূপে প্রতিপালিত হইয়া নিয়ত সরকারের মঙ্গলপ্রার্থনায় নিযুক্ত থাকিবে। আদেশ অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া জানিবে। ১০০৫ পরগণাতি, রাজত্বের ২য় বর্ষ, ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

এই দলিল হইতে জানা যায় যে রাজারাম দীর্ঘকাল রাজকার্য্য করিয়া এই সনদ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সনদ প্রাপ্তির সময়ে তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক ৬০ বৎসর হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অতএব রাজারামের জন্ম ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হইয়াছিল তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রপিতামহ লোকনাথের বিক্রমপুরে আগমন ইহার অন্যূন ১০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। সুতরাং ১৪৭০ হইতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে লোকনাথ বিক্রমপুরে আগমন করেন। শেখরনগরের পৈতবংশীয়দিগের ঘরে যে পুরাতন কাগজপত্র আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, তাঁহারা ৩৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে লোকনাথের পৌত্র শিবরামের সময়ে শেখরনগরে বসতি স্থাপন করেন। এই হিসাবেও লোকনাথের আগমন ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

উক্ত সনদ হইতে আর একটী কথা জানা যায় যে, তাঁহারা পৈতি

সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব বলিয়া নবাব সরকারে পরিচিত ছিলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বরের তনয় তাঁহাকে বহুমানার্হ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সামান্য মর্য্যাদার পরিচায়ক নহে। ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে, পালসাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত রাজবংশধরগণ বরেন্দ্রভূমে ও উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছেন। শেখরনগর-পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা লোকনাথকেও বারেন্দ্র পালবংশের ঐরূপ কোন শাখাসমুদ্ভব বলিয়া অনুমান করিবার বিশিষ্ট হেতু রহিয়াছে। গ্রামের পৈতবংশীয় ও দেববংশীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ আজও তাঁহাদিগকে "পালরাজার বংশ" বলিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন। লোকনাথের দিনাজপুর হইতে আগমনের প্রবাদও এই অনুমানেরই সমর্থন করে। বৃদ্ধগণের মুখে আর একটী কথা শুনা যাইত;— ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুরের ভৌমিক চাঁদরায় নাকি বলিতেন, "বিক্রপুরে আর এক বংশ আছে—শেখরনগরের পালবংশ"। অর্থাৎ তিনি বিক্রমপুরে কেবল শেখরনগরের পালবংশকেই স্বীয় বংশের ন্যায় সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। এই পালবংশের উচ্চ বংশগৌরব সম্বন্ধে আর একটী সামাজিক বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। চন্দ্রশেখরের প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র বসুরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা রামদেব বসুরায়ের কন্যা মহামায়া দেবীকে বিবাহ করেন।(১) মহামায়া শেখরনগরের যে দালানে বাস করিতেন তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও রাজকন্যার দালান বলিয়া খ্যাত আছে। শেখরনগরের একখানা প্রাচীন দলিলে সাক্ষিস্থলে মহামায়া দেবীর ভ্রাতা রামনারায়ণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। চন্দ্রদ্বীপের বসুরাজবংশ কুলীন, তাহাতে আবার চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতি। বঙ্গসমাজে কন্যাগত কুলপ্রথা তাঁহারাই স্থাপন করেন। এরূপ অবস্থায় এই কুলসম্পদগর্ব্বিত গৌরবান্বিত রাজবংশের কন্যা রামকৃষ্ণ রায়কে দান

বংশমর্য্যাদা

করাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে শেখরনগরের চৌধুরীবংশ চন্দ্রদ্বীপাধিপতির নিকটেও অতি উচ্চবংশ বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ সম্ভ্রান্ত মৌলিক কায়স্থগণের সহিতও চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের আদানপ্রদান ছিল না। ইহা খুব সম্ভব যে, পূর্ব্বতন রাজ-বংশসম্ভূত বলিয়াই চন্দ্রদ্বীপাধিপতি তাঁহাদিগকে অন্যান্য মৌলিক কায়স্থ-বংশ হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, শেখরনগরের চৌধুরীবংশ সম্বন্ধে "পালরাজার বংশ" বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা সমূলক মনে করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, বংশের পূর্ব্ববৃত্তান্তসম্বলিত কোন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে না। বঙ্গসমাজের কুলাচার্য্যগ্রন্থেও কুলীন ব্যতীত অন্য কায়স্থের বংশবিবরণ বিশেষ রক্ষিত হয় নাই, বরং ঘটকগণ যে কায়স্থের গৃহে আশানুরূপ অর্থ লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাকেই হেয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেখরনগর হইতে যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে,—জানকী পালের বংশে রামগোপাল পাল, তৎপুত্র কবিরাম, তৎপুত্র লোকনাথ; লোকনাথ বিক্রম-পুরে আসেন। আর হাসাড়ার শ্রীযুক্ত মথুরানাথ রায় বর্ম্ম মহাশয়ের নিকট হইতে যে বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার শিরোদেশে লিখিত আছে,—"মহীপতি পালের সন্তান, জানকী পালের ধারা"। ইহার অর্থ এই যে, মহীপতির পুত্রগণমধ্যে জানকী পাল একজন, ইহারা তাঁহারই সন্ততি। পালবংশে মহীপাল নামে দুইজন রাজা হইয়াছিলেন। প্রথম মহীপালের দিনাজপুরে খনিত মহীপালদীঘি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথায় তাঁহার কোন বংশধর বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ তদ্বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান নামকরণের রীতানুকরণে বংশপরিচয়পত্রে 'মহীপাল' নামটী 'মহীপতি পাল'রূপে লিখিত

চন্দ্রশেখরের পৌত্র রূপরাম শেখরনগরের দুই মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতীর পারে পিতার নামানুসারে শিবরামপুর নামক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র দেবীপ্রসাদ শিবরামপুর ত্যাগ করিয়া তৎসংলগ্ন শালেপুর গ্রামে বসতবাটী নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র অমরসিংহ রায় শালেপুর ত্যাগ করিয়া পুনরায় শেখরনগরে আসেন। এখনও শালেপুরে "অমরসিংহের ছাড়াভিটা" ও "অমরসিংহের দীঘি" তাহার পরিত্যক্ত বাসস্থানের পরিচয় দিতেছে। অমরসিংহ রায়চৌধুরী জমিদারী জাহানাবাদের সনদ প্রাপ্ত হন। এই পরগণার অধিকাংশ পদ্মার গর্ভে পতিত হইয়া এখন গভর্ণমেণ্টের খাসমহালে পরিণত হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ এখনও চৌধুরীবংশের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত আছে। চন্দ্রশেখর যখন মুরুল্লাপুরের জমিদারী প্রাপ্ত হন তখন জমিদারীর খাজানা বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী মুরশিদাবাদে পাঠাইতে হইত। কিন্তু এই রাজস্ব প্রেরণ অতিশয় বিপজ্জনক ছিল,—পথিমধ্যে প্রায়ই লুটপাট হইয়া যাইত, এবং নিয়মিত সময়ে খাজানা পাঠাইতে না পারিলে জমিদারগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। এই কারণে চন্দ্রশেখরের পরবর্ত্তিগণ তপে হাওলি, সাহাবন্দর, মিরকপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জমিদারী ও কতকগুলি তালুক সৃষ্টি করিয়া মুরুল্লাপুরের বৃহৎ জমিদারী ছাড়িয়া দেন। কালক্রমে বংশবৃদ্ধিসহকারে সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে এবং কর্ম্মচারিগণের প্রবঞ্চনায় সম্পত্তির কিয়দংশ হস্তচ্যুত হইয়াছে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেটেলমেণ্টে দেখা গিয়াছে যে, হাসাড়া, ষোলঘর, কেয়টখালী, রাজানগর, তেঘরিয়া, বারৈখালী, চুরাইন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামের অধিকাংশভাগেই মূল মালিক চৌধুরীবংশ, নামমাত্র জমায় বহু সিকিমি তালুক বাহির হইয়া গিয়াছে। ঢাকা নগরীর প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান চান্নিঘাট ও মাদারজাণ্ডা এবং উয়ারি এক সময়ে চৌধুরীবংশের সম্পত্তি ছিল। চান্নিঘাট ও মাদারজাণ্ডা বাকী

ভূসম্পত্তি।

খাজানায় বিক্রীত হয় এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে উয়ারি ইস্তাফা দেওয়াতে উহা গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল হইয়াছে। বর্ত্তমানে চৌধুরা-বংশের শেখরনগরে আট বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীতে দালান কোঠা আছে। রাজারাম হাসাড়াতে যে "চৌঘুরা" বাড়ী করেন তাহাও ক্রমে চারিটী বাড়ীতে বিভক্ত হইয়াছে। এখানেও প্রত্যেক বাড়ীতেই ইষ্টকালয় আছে। রাজারাম ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নূতন কোন জমীদারীর সনদ লইতে পারিতেন। কিন্তু জমিদারী কি ঝকমারী তাহা তিনি জানিতেন,—রাজস্ব-দায়গ্রস্ত কত জমিদারের অকথ্য দুর্দ্দশা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কাজেই নূতন জমীদারী গ্রহণের সাধ আর তাঁহার ছিল না। দীর্ঘকাল নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা শান্তিতে ভোগ করিবার জন্য এবং শেষকাল ভগবদর্চ্চনায় নির্ব্বিঘ্নে কাটাইবার অভিপ্রায়ে পৈত্রিক বাসস্থান শেখরনগরের অনতিদূরে নিষ্কর দেবোত্তর স্বরূপ একখানা বসতবাটী মাত্র তিনি চাহিয়াছিলেন এবং সুবাদারও অবিলম্বে তাঁহাকে প্রার্থনার অনুরূপ সনদ প্রদান করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের জমিদারী-তেও হাওলির মধ্যস্থলে মহম্মদ খাঁর চৌঘুরা বাটী বেবন্দোবস্তি বা খাস থাকায় তাহাই রাজারামকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকালে শেখরনগরের ভিতর দিয়া পল্টনের যাতায়াতের রাস্তা ছিল, এবং তৎকালীন নিয়মানুসারে জমিদারদিগকেই পথিমধ্যে পল্টনের রসদ যোগাইতে হইত। কিন্তু সিপাহীরা রসদ পাইয়াই তুষ্ট হইত না, কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দাবি করিত। ক্রমে তাহাদের উৎপাত এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পল্টন আসিতেছে সংবাদ পাইয়াই চৌধুরী মহাশয়গণ বাড়ীর সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা নিরস্ত হইত না, তাহারা প্রাচীরমূলস্থ পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়া বা অন্য যে কোন রন্ধ্রপথে বন্দুক চালাইয়া ভয় প্রদর্শন করিত যাবৎ না কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইত। প্রধানতঃ এই অশান্তি হইতে

অব্যাহতিলাভের জন্যই রাজারাম হাসাড়ায় বাড়ী করেন। লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা নগরীতে যে দরবার করেন তাহাতে প্রাচীন জমিদারগণ মধ্যে রাজারামের বংশধর রামানন্দ রায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রামানন্দ রায়ের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। বর্ত্তমানে শেখনগরের শ্রীনাথ রায় মহাশয়ই কুলদীপক। পৈতৃক সমুদয় জমিদারী ও তালুকের অংশই তাঁহার বর্ত্তমান আছে, হস্তান্তরিত সম্পত্তিরও অনেকটা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। এখন তাঁহার বাড়ী ও অট্টালিকাদিই সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল। সেটেলমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ চৌধুরীবংশের কুর্শীনামা ও ভূসম্পত্তির পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া নিয়াছেন।

শেখরনগরের প্রাচীন বৃহৎ তোরণ বিক্রমপুরের একটি দর্শনীয় বস্তু। ইহা চন্দ্রশেখর রায়ের সময়ে কিংবা তাঁহার পুত্র শিবরামের সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। ইহা যে ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের তৎকালীন হর্ম্মশিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ এই প্রকাণ্ড কারুকার্য্যখচিত তোরণ অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া চৌধুরীবংশের পূর্ব্ব বিভবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। উপরিভাগে বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষ জন্মিয়া ইহাকে ক্রমে ধ্বংসমুখে লইয়া যাইতেছে। রাজারাম চৌধুরী আইরলবিল হইতে ইচ্ছামতী পর্য্যন্ত এক খাল খনন করেন। হাসাড়াতে চৌধুরীবংশের খনিত বাইশ বিঘা ব্যাপী একটী দীর্ঘিকা আছে। তাহার পারে পীর আলম গাজি নামে এক মুসলমান সাধু দরগা স্থাপন করেন। তদবধি ইহা আলম গাজির দীঘী নামে অভিহিত হইতেছে। দরগা এখনও বর্ত্তমান আছে। শেখরনগরেও কালীকিঙ্কর রায় খনিত ১০ বিঘা ব্যাপী একটী দীঘী আছে। পূর্ব্বে শেখরনগরের দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে; এবং লক্ষ্মীনারায়ণ

পূর্ব্বকীর্ত্তি, শিক্ষা ও ধর্ম্মশীলতা।

ও সিদ্ধেশ্বরী ব্যতীত অন্য সকল দেববিগ্রহ ধবলেশ্বরীর পবিত্র জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে) রামকৃষ্ণ রায়ের পৌত্র শ্যামল রায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার পিতা গোলোকচন্দ্র রায় ও জ্যেষ্ঠতাত তিলকচন্দ্র রায় তাহার প্রাণরক্ষার জন্য গৃহদেবতাদের অশেষ প্রকারে অর্চ্চনা করেন এবং বহু মানস করেন, কিন্তু কিছুতেই শ্যামলের প্রাণরক্ষা হইল না। অতঃপর পুত্রশোকাতুর গোলোকচন্দ্র একদা নিষ্ঠুর দেবতাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী ধলেশ্বরী নদীতে লইয়া যান এবং ধলেশ্বরীর খরস্রোতে তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। কেবল লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ ও পাষাণময়ী সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার বিরাগ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজ পর্য্যন্তও শেখরনগর পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে শেখরনগরে এই দুই বিগ্রহের এবং হাসাড়ার শ্রীধরনারায়ণ ঠাকুরের সেবা পূজা চলিতেছে। তদ্ব্যতীত লক্ষ্মীগোবিন্দ ঠাকুর বৎসরে ছয় মাস শেখরনগরে ও ছয় মাস হাসাড়ায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

শেখরনগরে দুইবার দুর্গোৎসবের যজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম বার ইন্দ্র-নারায়ণ রায় মহাশয়ের সময়ে, দ্বিতীয় বার ১৮৮০ খৃঃ অব্দে শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে। আহুতি দিয়া দুর্গাপূজায় যজ্ঞ আরম্ভ হয়। তৎপর প্রতিবৎসর আটটী ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র বাড়াইতে হয়। এইরূপে ১০৮টী বিল্বপত্র আহুতি দিয়া মহাড়ম্বরে যজ্ঞ পূর্ণ হয়। শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের পিতা পূর্ণচন্দ্র মহাসমারোহে দ্বিতীয়বারের যজ্ঞ পূর্ণ করেন। তাঁহার ইষ্টক-নির্ম্মিত যজ্ঞকুণ্ড এখনও বর্ত্তমান আছে। এই যজ্ঞকালে শ্রীনাথের পিতামহ অভয়ানন্দ জীবিত ছিলেন। তখন তাঁহার ১০৪ বৎসর বয়স। ১০৫ বৎসর বয়সে ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। লোকনাথ ও চন্দ্রশেখর রায়ের সময়ে যে যজ্ঞ আরম্ভ হয়, ১৮০

ইন্দ্রনারায়ণ যে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, ইন্দ্রনারায়ণের পৌত্র অভয়ানন্দ তাহা পূর্ণ হইতে দেখিলেন! সেকালের লোক কিরূপ দীর্ঘায়ু ছিল, ইহা তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। দীর্ঘজীবিতা এবং অধিক বয়সে বিবাহ এই দুই কারণে তখন অনেক বংশের দুই পুরুষেই প্রায় শত বৎসর অতীত হইত। এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, ইন্দ্রনারায়ণ শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র, বিজয়কৃষ্ণ ইন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অভয়ানন্দও বিজয়ের কনিষ্ঠ সন্তান। প্রথম যজ্ঞারম্ভ হইতে দ্বিতীয় বারের যজ্ঞ পূর্ণ হইতে, ১৮৮০ খৃঃ অব্দে, ৩৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে। তদবধি এখন ৩৫ বৎসর। সুতরাং ৩৯৫ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর জমিদারী পাইয়া প্রথম দুর্গোৎসব করেন। লোকনাথ যে চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে ইহাও একটী প্রমাণ। দ্বিতীয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ণচন্দ্র কালের গতি লক্ষ্য করিয়া—১৮০ বৎসর পরে ভবিষ্য বংশধরগণ কর্ত্তৃক তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া—নিয়ম করিলেন যে, অতঃপর প্রতি বৎসরর যজ্ঞ পূর্ণ করিতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ হইতে প্রতি বৎসরই অষ্টাধিক সহস্র আহুতি দ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। হাসাড়াতে রামানন্দ রায়ের গৃহেও একবার যজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে।

পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই আরবি ও পারশি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অনেকে নবাব সরকারে চাকরি করিতেন, কেহ কেহ আলা-সদর আমিনের (বর্ত্তমান সবজজ আদালতের) উকীল ছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও এই বংশে বি-এ, এম্-এ, উকীল, ব্যারিষ্টার, সবজজ, ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। চন্দ্রশেখরের পৌত্র গঙ্গানারায়ণ রায় অকৃতদার তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি কুম্ভক করিয়া ইচ্ছামতীর স্রোতের উপর পদ্মাসনে বসিয় থাকিতেন। তিনি যে

ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটলায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন তাহা কালক্রমে মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি সেই স্থান গঙ্গানারায়ণ রায়ের ঘাটলা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার অনেক তান্ত্রিক শিষ্য ছিল। তিনি নিজেই শক্তিপূজা করিতেন। কোন কোন শিষ্যবংশধর তৎপ্রবর্ত্তিত পূজা অদ্যাপি করিয়া থাকে। এই বংশের গুরুচরণ রায় মহাশয়ও অতিশয় ধার্ম্মিক তাপস ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ময়মনসিংহের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ৺মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ও পরে তৎপুত্র রাজা শশিকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের জমিদারীর সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের পিতা **পরলোকগত পুণ্যচন্দ্র রায় মহাশয়** নিষ্কাম কর্ম্মযোগী মহাত্মা ছিলেন। তিনি তদীয় পিতা আলা-সদর আমিনের উকীল অভয়ানন্দের নিকট বাল্যকালে পারশি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ২২ বৎসর বয়সে নারায়ণগঞ্জে ওকালতি আরম্ভ করিয়া প্রথম বৎসরেই তথাকার শ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। পরে মুন্সেফি মুন্সীগঞ্জে উঠিয়া গেলে তিনি সেখানেই শেষকাল পর্য্যন্ত ওকালতি করিয়াছেন। তিনি ৫২ বৎসর ওকালতি করিয়াছেন এবং মুন্সীগঞ্জে সুখ্যাতির সহিত অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে কখনও কাহারও অপকার করিয়াছেন, কখনও একটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এমন কেহ বলিতে পারে না। শত কর্ম্মের মধ্যে তিনি সতত বৈরাগ্যযুক্ত ও ত্যাগশীল ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি অনুক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে নিবদ্ধ ছিল। তিনি ধনী দরিদ্র সকলের বন্ধু ছিলেন এবং আব্রাহ্মণ সকলে তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞানে ভক্তি প্রদর্শন করিত। ময়মনসিংহে পুত্রের আবাসস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালীন ঘটনাপরম্পরা অতি বিস্ময়কর ও শিক্ষাপ্রদ। আমরা বাহুল্যভয়ে এখানে তাহার উল্লেখে নিরস্ত হইলাম।

মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বি. এল।

শ্রীনাথ রায় মহাশয় বিক্রমপুরের একজন কর্ম্মী ও কৃতী সন্তান। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় এবং মেট্রপলিটেন ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ অব্দে ঢাকা বারে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার সাধারণের হিতকর কার্য্য এবং সকল সদনুষ্ঠানে অসামান্য উৎসাহ ছিল। ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি তাঁহারই ন্যায় উৎসাহী দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর আর একজন ছাত্রের সহিত মিলিত হইয়া "ভারত-হিতৈষিণী" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপকগণের তিরস্কারে তাঁহাকে এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর কলিকাতায় বি, এ, পড়িবার কালে তিনি "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" একজন প্রধান সভ্য হইয়াছিলেন। বি, এ, পাশ করার পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মেম্বর হন। ময়মনসিংহ বারে যোগদানের অত্যল্প-কাল পরেই তিনি ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক এবং মিউ-নিসিপালিটীর কমিশনর ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ মনোনীত হন। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সততা মহারাজা সূর্য্যকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মহারাজা তাঁহাকে তাঁহার এষ্টেটের একজন উকিল নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়দ্দিন অস্থায়িভাবে মুন্সেফের কার্য্য করেন। পরে স্থায়ী মুন্সেফী প্রাপ্ত হইলে মহারাজা তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বারণ করেন এবং তাঁহার জমিদারীর লিগেল এড্‌ভাইজর পদে নিযুক্ত করেন। কিয়দ্দিন পরে



মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বি, এল, বাহাদুর।

বার্-এট্ ল মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে হাইকোর্ট বারে যোগদানের জন্য কলিকাতা যাইতে মনস্থ করেন তখনও মহারাজা তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করেন এবং তাঁহার ষ্টেটের চিফ্ ম্যানেজার পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। যাহা হউক, এইবার তিনি তাঁহার শক্তির অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন।

রায় মহাশয় ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন এবং ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে মহারাজের চিফ্ ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। এই ছয় বৎসর মধ্যে তিনি ময়মনসিংহের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress এর) এলাহাবাদ অধিবেশনে দুইবার, মাদ্রাজ অধিবেশনে একবার এবং কলিকাতা অধিবেশনে একবার যোগদান করেন; তদ্ব্যতীত জুরি নোটিফিকেশন সম্বন্ধে এবং মিউনিসিপাল আইনের প্রস্তাবিত এমেণ্ডমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রতিবাদের জন্য তৎকালে কলিকাতা টাউনহলে যে দুই বিরাট সভা হয় তাহাতেও তিনি যোগদান করেন।

তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ময়মনসিংহের সদর বেঞ্চে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের মেম্বর, ময়মনসিংহ জেলের পরিদর্শক, জমিদারগণ কর্ত্তৃক মনোনীত আনন্দমোহন কলেজ কমিটীর সদস্য, সিটিকলেজিয়েট স্কুল কমিটীর ও মুক্তাগাছা রামকিশোর হাইস্কুল কমিটীর সদস্য, ইষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড্ হোল্ডার্স্ এসোসিয়েসনের মেম্বর, ময়মনসিংহ লোন আফিসের ডিরেক্টর এবং ময়মনসিংহ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ারম্যান প্রভৃতি পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি চরিত্রবলে ও কার্য্যদক্ষতায় জনসাধারণের এবং রাজকর্ম্মচারিগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের বিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রজাগণ তাঁহাকেই মা-বাপ বলিয়া

জানিত। প্রজাগণের অভাব অভিযোগ তিনি এমন সহৃদয়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করিতেন যে তাহারা তাঁহার "মাটির ম্যানেজার" নাম রাখিয়াছিল।

বহুদিন যাবৎ তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ব্যয়ে পরিচালিত একটী বালিকা-বিদ্যালয় রহিয়াছে। তিনি নিজ বাড়ীতে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। রায় মহাশয় লোকশিক্ষার সৌকর্য্যার্থে শেখরনগরে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন শেখরনগর গ্রামে উত্তম-পানীয় জলের অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ১৩১৯ সনে নিজ বাড়ীর সম্মুখে একটী জলাশয় খনন করেন। পরবৎসর উহা রিজার্ভ করিয়া জল ব্যবহারার্থে সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সমাজসংস্কারকার্য্যেও তাঁহার একান্ত উৎসাহ দৃষ্ট হয়। বিদেশপ্রত্যাগত যুবকগণ যাহাতে সমাজে গৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ সর্ব্বদা যত্নবান্। পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থসমাজের সংস্কারকার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তন্মধ্যে রায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৺পূজাবকাশে নিজ শেখরনগর গ্রামে প্রায় সমুদয় জ্ঞাতি ও অন্য কায়স্থগণসহ আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন; এবং অতঃপর তাঁহার চেষ্টায় ময়মনসিংহ নগরে ঢাকা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলার অনেক কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। * "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভা" ও "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার" কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব অনুসারে তিনি "বঙ্গদেশীয় কয়স্থসভার" গত বার্ষিক অধিবেশনে ১৩২৪ সনের জন্য ঐ সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয় একজন প্রকৃত দেশ হিতৈষী ব্যক্তি। অর্থ অনেকেই উপার্জ্জন করেন, বিক্রমপুরে বড়লোক ও সঙ্গতি শালী ব্যক্তির ও অভাব নাই, কিন্তু কয়জনের প্রাণ দরিদ্র পল্লীবাসীর ব্যথায়

১৯১৮ খ্রীঃ অঃ জুন মাসে ইনি ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

কাঁদিয়া উঠে? কয়জনে জন্মভূমির কল্যাণকামনায় উদ্বুদ্ধ হন? কয়জনে আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের মঙ্গল-মন্দিরে স্বার্থকে বলি দিতে পারেন? শ্রীনাথ বাবু নিজ গ্রামে বহু অর্থব্যয়ে তদীয় পিতৃদেবের নামে "পূর্ণচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়" নামক একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া শতশত গরীব দুঃখীর রোগক্লেশ মোচনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের অক্ষয় আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

১৩২২ সনের শ্রাবণ মাসে ইংরেজী ১৯১৩ খ্রীঃ অঃ ৬ই আগষ্ট শুক্রবার স্বর্গীয় পূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর শেখরনগর গ্রামে যাইয়া এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ বাবু সদাশয়, বিনয়ী এবং প্রকৃত দেশ-প্রাণ মহাত্মা—তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরের ও দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় **ললিতমোহন রায়** মহাশয়ও এই গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এখানে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইল।

স্বর্গীয় ললিতমোহন রায়।

বংশ ও জন্ম—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১০ই শ্রাবণ রবিবার দিবা ভাগে শেখরনগর গ্রামের বিখ্যাত "পালচৌধুরী বংশে" (বর্ত্তমানে "রায় চৌধুরী" নামে খ্যাত) ললিতমোহন জন্মগ্রহণ করেন।

৺ ললিত বাবু ভূমিষ্ট হইবামাত্রই তদীয় মাতা নয়নতারাদেবী অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং কর্ণমূল রোগে আক্রান্ত হন। বহুচিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করা হয়।

পাঠ্যাবস্থা—শেখরনগর পাল চৌধুরী বংশে ৺ ললিত বাবুই প্রথম ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার মাতার খুল্লতাত ভ্রাতা ৺ আনন্দকিশোর নাগ মহাশয়ের ঢাকার বাসাতে থাকিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করেন।

ললিত বাবু ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৬০ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। দুই বৎসর কাল ঢাকা কলেজে



৺ ললিতমোহন রায়।

অধ্যয়ন করার পর সাংসারিক গণ্ডগোলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এলে, পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। যদিও তিনি এলে, এ পরীক্ষা পাশ না করিয়া থাকেন তবুও তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়।

কর্ম্মজীবন—৺ ললিত বাবু তাঁহার পিতার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করার পর হইতে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। ললিত বাবু তাঁহার ছোট ভাই ও এক ভগ্নী পূর্ব্বপুরুষের বাড়ী হইতে বঞ্চিত হইলেন। এমতা বস্থায় ললিত বাবু প্রথম ইনকামটেক্স আফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। সেই চাকুরীতে বেশীদিন থাকেন নাই। তৎপর তিনি তেষক্ষীয়ার এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রথম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তেষক্ষীয়া নিবাসী ৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ডিপুটী, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দ্বারকানাথ বসু ও রায়সাহেব বিধুভূষণ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ নিবারণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ললিত বাবুর ছাত্র ছিলেন। তথায় প্রায় দুই বৎসর কাল থাকার পর ঢাকা ডিভিশনের স্কুলবিভাগের ইন্‌সপেক্টর Late Mr. C. B. clerk এর অনুগ্রহে মুক্তাগাছা স্কুলের প্রথম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৪ খৃঃ নৌকাযোগে সাত দিনে তথায় যান। সেই সময়ে মুক্তাগাছার অবস্থা এখনকার সঙ্গে পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবেন যে মুক্তাগাছার উন্নতি ললিতবাবু দ্বারা অনেকাংশে সাধিত হইয়াছে। যখন ৺ ললিতবাবু মুক্তাগাছা যান তখন মুক্তাগাছা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এমন কি বর্ত্তমান থানার পিছনে বাঘ বিচরণ করিত। এখনকার মত মিউনিসিপালিটী, দাতব্যচিকিৎসালয়, ফুলের বাগান, পরিষ্কার রাস্তাঘাট ও দালান প্রভৃতি ছিল না। ৺ ললিতবাবু ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এমন কি ঐ ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব রাখার

জন্য নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম "সত্যমোহন" রাখেন। তিনি উদার মতাবলম্বী এর লোক হওয়াতে এবং ইংরেজী বলিতে কহিতে অত্যন্ত পটু থাকাতে অনেক সাহেব সুবার সঙ্গে মুক্তাগাছা থাকার কালীন পরিচয় হয়। পক্ষান্তরে তিনি অদ্বিতীয় শিকারী ছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ তিনি স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ললিতবাবুর চরিত্রের সদ্‌গুণাদি মহারাজার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মহারাজা ললিত বাবুর নিকট হইতে ভালরূপে শিকার শিক্ষা করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ললিত বাবু শৈশবকালে বারদীতে প্রতিপালিত হইতেন এবং তথায় তিনি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে শিকার শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর শিকারের পদ্ধতি বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন ছিল। শিকারি বলিতে গেলে শ্যামাচরণ বাবুকেই শিকারি বলা যায়।

কতককাল গৃহশিক্ষকের কাজ করার পর ৺ ললিতবাবু মহারাজার প্রাইভেটসেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ৺ ললিতবাবু ও মহারাজার মধ্যে অত্যন্ত সখ্যতা ছিল। মহারাজ ৺ ললিতবাবুকে কি প্রকার বিশ্বাস করিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। মহারাজার নিজ তহবিল ৺ ললিত বাবুর অধীন ছিল। কোন এক সময়ে প্রহরী বেষ্টিত লোহার সিন্দুক হইতে আঠার হাজার টাকা চুরি যায়। এই চুরি লইয়া মুক্তাগাছায় আন্দোলন চলিয়াছিল; এবং কোন ব্যক্তি মহারাজকে আভাষ দিয়াছিল যে, এই টাকার জন্য ৺ ললিত বাবুই দায়ী। বিশ্বস্তমূলে অবগত হওয়া গেল যে, মহারাজা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "যদি ললিত দায়ী হয় তবে আমিও দায়ী কারণ একটী তালার চাবি আমার নিকটে ছিল।" মহারাজা জ্ঞাত ছিলেন কে চোর এবং কাহার দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইয়াছে। মহারাজা ও ললিত বাবুর মধ্যে যে সব চিঠিপত্র আদান প্রদান হইয়াছিল তাহার সারাংশ মহারাজার জীবনী লিখার জন্য

ললিত বাবুর ছেলেদের নিকট হইতে ১৯০৯ খৃঃ সংগ্রহ করা হইয়াছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ময়মনসিংহ জিলার ঘোষবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত প্রণীত মহারাজা সূর্য্যকান্তের জীবনীতে ঐ সকল সারাংশ প্রকাশ হয় নাই। প্রকাশ হইলে বিক্রমপুরবাসিগণ দেখিতেন যে ৺ ললিত বাবু কত উচ্চদরের লোক ছিলেন।

কতককাল প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিবার পর দেওয়ান গোবিন্দ বাগচীর মৃত্যুর পর ৺ ললিত বাবু মহারাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ১৩০১ সনের প্রথমভাগে মুক্তাগাছা পরিত্যাগ করিয়া দুই বৎসর কাল মহারাজার সঙ্গে কলিকাতাতে থাকেন এবং ১৩০২ সনে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ৪০৲ টাকা পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ী আসেন। তিনি মুক্তাগাছার রাজবাড়ীতে ২৮ বৎসর কাজ করেন এবং তথায় প্রায় ৩১ বৎসর ছিলেন।

৺ ললিত বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থাদি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বিবৃত হইল।

প্রকাশিত গ্রন্থ—(১) তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়াই "মেয়েলী" নামক একখানা পুস্তক মুদ্রিত করেন। এই "মেয়েলী"ই বঙ্গের মেয়েদের ছড়াতে পরিপূর্ণ ছিল। আজকাল এই সব ছড়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা বঙ্গে বিশেষ ভাবে দেখা যায় কিন্তু ৺ ললিতবাবু ৫৫ বৎসর পূর্ব্বেই এই সব ছড়া সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন।

(২) ৺মহারাজার "শিকার-কাহিনীর" বহুপূর্ব্বে মহারাজার আর্থিক সাহায্যে "মৃগ ও মৃগয়া" নামক একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই "মৃগ ও মৃগয়া" তে ৺মহারাজার ও ৺ললিত বাবুর গৌড়ের জঙ্গলের ও মধুপুর গড়ের শিকারের বিবরণ আছে। রূপগীর সন্ন্যাসীর ভগ্ন অট্টালিকার

পরিদর্শন এই "মৃগ ও মৃগয়া" তে বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। "মৃগ ও মৃগয়া"র অনেক বিবরণ ৺মহারাজা নিজ "শিকারকাহিনী"তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

(৩) "**Degradation of Bengal Zamindars**" :—এই গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের জমিদারের পতনের কারণ বিশদভাবে লিখা আছে। এই বহি বাঙ্গালা দেশের সমস্ত জমিদারগণকে উপহার দিয়াছিলেন।

(৪) "নৈতিক সূত্র" ঃ—এই পুস্তক মুদ্রন ব্যাপারে রাজা জগতকিশোর অনেক সাহায্য করেন। ইহা বাঙ্গলাতে লিখিত।

অপ্রকাশিত গ্রন্থ ঃ—পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মুক্তাগাছা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺ললিতবাবু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও রচনাতেই জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছোট বড় অনেক পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

(১) "বুদ্ধদেবচরিত" ঃ—ইহা ১৩১০ সনে বঙ্গভাষায় লিখিত। বুদ্ধের ধর্ম্মজীবনের সুন্দর ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

(২) "বুদ্ধতত্ত্বসার" ঃ—ইহাতে বুদ্ধধর্ম্মের সারাংশ সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ১৭ ইআশ্বিন ১৩১০ সনে সমাপ্ত।

(৩) "কুলধর্ম্মদীপিকা" ঃ—ইহা হিন্দি ও বঙ্গভাষাতে ১৩০০ সনে লিখিত। ইহাতে অনেক তত্ত্ব ও সদুপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে।

নমুনাস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

"নির্গুণ নির্গুণ কহত সবাহি নির্গুণ কো'হ ন জানে।
কুপমেঁ ঠারি আসমানকা বাত কয় না কোন প্রমাণে॥"

অর্থাৎ ঈশ্বর নির্গুণ ইহা সকলেই বলে বটে কিন্তু তাঁহার বিষয় কি উহা কেহই জানে না ; যেমন কোন ব্যক্তি কূপের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কি প্রমাণ দ্বারা আকাশের কথা বলিতে পারিবে ?

এখানে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

"যুগযুগান্তর জপতো মালা
ফুল পাতাতো দেওয়ে।
ঘণ্টা কি টন টন খালি ঠন্ ঠন্,
আগর তো ভাব না হোওয়ে॥"

অর্থাৎ—যদি তুমি যুগযুগান্তরকালও মালা জপকর ও ফুল পত্রদ্বারা অর্চ্চনা করতঃ টন টন শব্দে ঘণ্টা বাজাও কিন্তু ভাবোদয় না হইলে সমস্তই বৃথা কেবল ঘণ্টার ঠন ঠনিই সার।

(৪) **জাতকতত্ত্বামৃতসার** :—এই পুস্তকে ভগবান্ বুদ্ধদেব স্বীয় বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত প্রসঙ্গে "জাতক নামক" গ্রন্থে যে সকল নীতিগর্ভ ও ধর্ম্মগর্ভ আখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আছে। ইহা সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় লিখিত।

(৫) **"দাউদগীতা বা ভজনসঙ্গীত"** :—প্রাচীন মহারাজ্যের অধিপতি ঈশ্বরপরায়ণ মহাসিদ্ধপুরুষ দাউদ আত্মনিবেদন বিষয়ে যে সমস্ত ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার মূলানুরূপ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ এই পুস্তকে আছে।

(৬) **"গীতার হিন্দি ও বঙ্গানুবাদ** :—ইহাতে মূল সংস্কৃত শ্লোক বঙ্গানুবাদ ও হিন্দিতে দোহা আছে।

(৭) **"ভগবত ঈশা তত্ত্বাখ্যান বা Life and Light of Jesus"** :—এই পুস্তক ঢাকার Baptist Mission Societyর জন্য ১৯০৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লিখিত হয়। ললিতবাবু ইংরেজীতে

এই পুস্তকের নিজেই এক ভূমিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে ১৩১টী দোহা আছে।

(৮) "**শ্রীরামচরিত মঙ্গলম্**"—ইহাতে সংস্কৃতে লিখা। ১৩১১ সনের কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

(৯) "**সাঙ্কেতিক জ্যোতিষ ব্যবহার**"—এই পুস্তকদ্বারা একজন অনায়াসে জ্যোতিষ গণনা করিতে পারে। ৺ ললিত বাবুর নিকট যদিও জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু পুস্তক ছিল তথাপি তিনি সর্ব্বদা এই পুস্তক ব্যবহার করিতেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে "**বুদ্ধদেবচরিত**", "**গণেশের ও দুর্গার স্তোত্র**", "**শ্রীরামানুশাসন**" "**মোক্ষতত্ত্বসার**" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি ছয়টী সুযোগ্য পুত্রসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যমোহন রায়, রাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের নায়েব ও মহারাজা সূর্য্যকান্তই তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া যান। আজ ২৩ বৎসর যাবৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত তিনি সুচারুরূপে নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি পালন করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রমোহন রায় প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত, শেখরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান্ ও হাসপাতালের সেক্রেটারী। তিনি অতি ধীর চরিত্রবান্ ও কর্ম্মঠ। তিনি বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। দেশের উন্নতিকল্পে তিনি প্রাণপণ করিয়া খাটেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রমোহন রায় বি, এ, রেঙ্গুনে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসের চিফ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। তিনি অত্যন্ত সুনামের সহিত রেঙ্গুনে চাকুরী করিতেছেন। ব্রহ্মদেশস্থ প্রবাসী বাঙ্গালীগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তাঁহার চেষ্টায় বিক্রমপুরের বহুলোক রেঙ্গুনে চাকুরী পাইয়াছে। তিনি একজন নীরব

কর্ম্মী। হেমেন্দ্র বাবুর উৎসাহী, কর্ম্মঠ এবং স্বদেশহিতৈষী লোক। চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রমোহন রায় বর্ম্মাতে চকুরী করিতেছেন। পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায় বর্ম্মারেলওয়েতে চাকুরী করেন। ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমদামোহন রায় রেঙ্গুনে Port Commisoner আফিসের জরিপের কর্ম্মকর্ত্তা। তিনি ১৯১৬ সনের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধের সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া মেসপটেমিয়াতে চলিয়া যান। ১বৎসর ৬ মাস পর কার্য্যশেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ৺ললিত বাবুর পুত্রগণ শেখরনগর গ্রামে ধীর ভাবে অত্যন্ত যশের সহিত বসবাস করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামের সাহিত্যসেবীরূপে **শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলি** বি. এ. মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। কুমুদিনীবাবু বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষার একজন প্রসিদ্ধ লেখক। ইনি ইংরেজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। তৎপ্রণীত 'ইষ্টলীনের' বঙ্গানুবাদ, 'সিন্ধুগৌরব,' সিদ্ধিতত্ত্ব, Self-culture ইত্যাদি গ্রন্থগুলি স্বদেশের ও বিদেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। "বিশ্বকোষ" নামক বিখ্যাত আভিধান গ্রন্থে কুমুদিনীবাবুর বহুরচনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। উপস্থিত ইনি নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন।

গ্রাম্যবিবরণ—শ্রীনগর।

সীমা—উত্তরে পশ্চিমে দেউলভোগ, পূর্ব্বে ছোটবেজগাঁও, দক্ষিণে মণ্ডরগাঁও, পশ্চিমে শ্যামসিদ্ধি।

নামোৎপত্তির ইতিহাস—শ্রীনগরের পূর্ব্বের নাম রাইসবর। এখান কার বসুবংশীয় জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ **লালা কীর্ত্তিনারায়ণ** এই স্থানের নাম শ্রীনগর রাখেন। বসুবংশীয়গণের ইতিহাসের সহিত উহা বিবৃত হইল।*

শ্রীনগরের জমিদার বংশের ইতিহাস—এইবংশের উর্দ্ধতম অষ্টম পুরুষ কৃষ্ণজীবন বসু স্বীয় আবাসভূমি ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়া স্বপুরোহিত বিক্রমপুরস্থ বেজগ্রামে আসিয়া বাস করেন। যেস্থানে ৺কৃষ্ণজীবন বসুর ভদ্রাসন ছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও বসুবাড়ী বলিয়া খ্যাত। কি কারণে ৺কৃষ্ণজীবন বসু ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে

---

* এবিষয় একটী কৌতূহলোদ্দীপক গল্প প্রচলিত আছে, এখানে তাহা উল্লিখিত হইল। "অনেকে বলেন লালা কীর্ত্তিনারায়ণ কর্ম্মোপলক্ষে আপনার এক ভৃত্যকে রাজনগরের রাজবাটীতে প্রেরণ করেন। ভৃত্য উপস্থিত হইলে নৃপকুঞ্জররাজবল্লভ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে তুমি কোথা হইতে আসিলে? ভৃত্য বলিলেন "মহারাজ শ্রীনগর হইতে এ দাসের আগমন।" রাজা কহিলেন, কি শ্রীনগর নামত কখনও শুনি নাই। ভাল রাইষবর আর শ্রীনগর কতদূর অন্তর? ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। সে বলিল মহাশয় বলিতে ভয় হইতেছে। যেমন বিলদাওনিয়া রাজনগর সেইরূপ রাইষবর—শ্রীনগর। ভৃত্যের তাদৃশ বাক্যবিন্যাসে সম্মুখস্থ জনগণ মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রোধপরবশ হইবেন। কিন্তু মহানুভব রাজবল্লভ তচ্ছ বণে বিষণ্ণচিত্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া ভৃত্যকে বহুমূল্য একজোরা শাল খেলাত দিলেন। এদিকে ভৃত্য গৃহে সমাগত হইলে লালাবাবু ও তাহাকে এক সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন। ইহাতে অনুমিত হইতেছিল যে, রাজনগরের উন্নতি সময়ে শ্রীনগরের অনেক প্রতিপত্তি ছিল।

বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ জ্ঞাতি গোষ্টির সহিত মনোমালিন্যের নিমিত্তই তিনি স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। উক্ত বসু মহাশয় চন্দ্রদ্বীপ কুলীনসমাজের অন্তর্গত বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ ছিলেন।

কুলভ্রষ্ট গ্রামে বসবাস হেতু এবং তৎকালীন সমাজকর্ত্তা ঘটকদের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ৺কৃষ্ণজীবন বসুকে কুলীন হইতে কুলজে নামিতে হয়। বসু মহাশয়ের পুত্র ৺কংশনারায়ণ রায়েসবর (বর্ত্তমান শ্রীনগর) নিবাসী ৺রামচন্দ্র গুহ মুস্তৌফির খঞ্জ মেয়ে বিবাহ করেন, আর্থিক অবস্থা হীন থাকায়ই তাহার এবিবাহ করিতে হয়। কংশনারায়ণ এই বিবাহ করিয়া শ্বশুরের প্রদত্ত কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রায়েসবরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার তিনটী পুত্রও তিনটী কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র বিখ্যাত লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, দ্বিতীয় রামচন্দ্র, তৃতীয় শিবনারায়ণ ও হরিপ্রিয়া, বিষ্ণু-প্রিয়া, রামপ্রিয়া, নামে তিন কন্যা। লালা কীর্ত্তিনারায়ণ হইতেই শ্রীনগর—শ্রীনগর রূপে খ্যাতি লাভ করিতে থাকে। কীর্ত্তিনারায়ণের জীবন-কথা উপাখ্যানের মত মনোহর। কংশনারায়ণ শ্বশুর প্রদত্ত সামান্য ভূসম্পত্তি হইতে অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন। সন্তানদিগকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দিবার অবস্থা তাহার ছিল না; তৎকালীন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা হইতে পারে ছেলেদের ততদুর শিক্ষা হইলে তাহারাও বাড়ীতেই বসিয়া রহিল। এদিকে সংসারে দারুণ অভাব। বসিয়া খাইলে আর কয় দিন চলে? অথচ ছেলেদের এমন বিদ্যা নাই যে বিদেশে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। কীর্ত্তিনারায়ণ অলসের মত শুধু বসিয়া না রহিয়া নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে কিছু কিছু উর্দ্দু ও পার্সী

শিখিয়াছিলেন আর কংসনারায়ণের পুত্রদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ও মেধাবী ছিলেন। সংসারের অভাবে নানারূপ অশান্তিতে কংসনারায়ণ একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি একদিন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ উহাদের ভাতের বদলে ছাই খাইতে দিও।" পত্নীও স্বামীর উপদেশানুযায়ী একদিন সত্য সত্যই ছাই বাড়িয়া দিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ ছাই দেখিয়া সমুদয়ই বুঝিলেন— বুঝিলেন নিশ্চেষ্ট ভাবে বাড়ীতে বসিয়া থাকার জন্যই পিতামাতা এই ব্যবহার করিয়াছেন। সেই দিনই দিবা দ্বিপ্রহরে কিশোর কীর্ত্তিনারায়ণ তৎকালীন রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের উদ্দেশে রওনা হইলেন। ঢাকায় মহারাজা রাজবল্লভের তখন অসীম প্রতাপ, কীর্ত্তিনারায়ণ মহারাজার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহার সেরেস্তায় তাহাকে অতি সামান্য বেতনে একটী মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে নিজ বুদ্ধিগুণে ও পারদর্শিতায় মহারাজার সাহায্যে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সামান্য পদ হইতে কীর্ত্তিনারায়ণ অতি উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি লালা উপাধি লাভ করেন। সে সময়ে মন্ত্রণাসভার সদস্য ব্যতীত অপর কাহাকেও লালা উপাধি দেওয়া হইত না। এ সময় হইতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট ভাবে এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ অদ্যাপিও লালার বাড়ী, লালাবাবু, লালার বংশ বলিয়া তাহার বংশধরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সময়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি করিবার সাধ যায় এবং ত্রয়োদশ চাকলার অন্তর্গত পঁচিশজন জমিদারের অন্যতম জমিদার জালালপুর দিগরও তৎকালীন জমিদার মতিউল্লা ও লালউল্লার নিকট হইতে ৬৪৮৵১৷৷ পাই দিয়া জালালপুরদিগর বদরাসন বরহানগঞ্জ' নামক দুই চাকলার জিরাশপট্টা

এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। উহাতে কোনও জমার উল্লেখ না থাকায় তিনি কাহাকেও কোন খাজনা দেন নাই। এইরূপে কীর্ত্তিনারায়ণের ভূসম্পত্তি সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হইল। তিনি অনন্তদেবকে তাহার কুল দেবতারূপে স্থাপন করিয়া সুযোগ মতে নানা সম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই একজন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারীর পদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে যে এক সময়ে মহারাজা রাজবল্লভের কোনও কার্য্যের প্রতি নবাব দরবার হইতে সন্দেহের উৎপত্তি হয় এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব হয় এই ব্যাপারে কীর্ত্তিনারায়ণ মহারাজকে যথোচিত সাহায্য করিয়া বিপমুক্ত করায় তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ কতক ভূসম্পত্তি দান করেন। রাজা রাজবল্লভের পরিবারস্থ কতিপয় আত্মীয়স্বজনের বসতবাড়ী ঐ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ায় তাহারা ইহাতে বিশেষ আপত্তি উথাপন করেন।

কীর্ত্তিনারায়ণ এই সামান্য ঘটনা লইয়া রাজপরিবারের সহিত কোনরূপ বিবাদের সৃষ্টি করা অসঙ্গত বোধে তাঁহাদের বসত বাটী ও তৎপার্শ্বস্থিত কতক সম্পত্তি বাঙ্গালা ১১৮০ সনের ইং ১৭৭৩ ১লা পৌষ তারিখে ৩৫০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে স্বাধীন জমিদার হইবেন, এই সর্ত্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপে তাহার সম্পত্তি হইতে দুই আনা অংশ বাহির হইয়া যায়। এইরূপে (বৈকুণ্ঠপুর পরগণার নামোৎপত্তি) হস্তান্তরিত হইয়া ভিন্ন জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আর বক্রী চৌদ্দ আনা অংশই বৈকুণ্ঠপুর পরগণার ষোলআনা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কীর্ত্তিনারায়ণ এই চৌদ্দআনা অংশও ৺অনন্তদেবের ক্রীত সমুদয় সম্পত্তি মিলাইয়া পরগণার সৃষ্টি করেন।

৺অনন্তদেবের নামে ক্রীত সমুদয় সম্পত্তি মিলাইয়া এক

৺অনন্তদেবের বাসস্থানে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া তাহার সৃষ্ট পরগণারও নাম হইল বৈকুণ্ঠপুর পরগণা, তদবধি আজ পর্য্যন্তও শ্রীনগরের জমিদারগণ বৈকুণ্ঠপুর পরগণার জমিদার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সময়ে লালা কীর্ত্তিনারায়ণ স্বীয় গ্রাম রায়েসবরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম শ্রীনগর রাখিলেন (কীর্ত্তিনারায়ণের কীর্ত্তি)। শ্রীসম্পন্ন নগর বা স্থান বলিয়াই ইহার নাম হইল শ্রীনগর। প্রকৃত পক্ষেও এস্থানেই কীর্ত্তিনারায়ণের সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছিল। প্রাচীন রায়সবর গ্রামে কীর্ত্তিনারায়ণের সময় হইতেই শ্রীনগর নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লালা কীর্ত্তিনারায়ণ স্বীয় গ্রামের নামাকরণ করিয়াই ইহার উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিলেন। গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনিত হইল এবং জনসাধারণের চলাচলের জন্য পথঘাট প্রস্তুত হইল। দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে একটী দ্বাদশশিবের ও অন্য একটী কুলদেবতা ৺অনন্তদেবের নামে উৎসর্গ করেন। সেই পুষ্করিণী দুইটী অদ্য পর্য্যন্তও শিববাড়ীর পুকুর ও অনন্তদেবের পুকুর নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এসকল পথ ঘাট প্রস্তুত ও পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করিবার পর নিজ বাটীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহার একটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫৮ + ৪১ হাত ও উচ্চে ২০ হস্ত ছিল। ইহার ভিতরের দেওয়ালে ও ছাতে নানাবিধ সুদৃশ্য কারুকার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত রঙ্‌মহাল কমলাসন ইত্যাদি নামেও সুদৃশ্য অট্টালিকা সমূহ বিরাজিত ছিল। বিগত ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পে সে সকলের নিদর্শন স্বরূপ যাহা কিছু সমুদয়ই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণেও যে সামান্য অংশ অবশিষ্ট আছে। তাহার কারুকার্য্য ও গাঁথুনীর দৃঢ়তা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে কালে চোর ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী ছিল, সে সকলের

হস্ত হইতে গ্রামবাসিগণকে নিরাপদ করিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দিকে চারিটি বুরুজ নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক বুরুজে চারিজন করিয়া সশস্ত্র সিপাহী দিবারাত্রি পাহারা দিত। বুরুজ চারিটির মধ্যে মাত্র একটী বিদ্যমান আছে। এই বুরুজটি গোলাকৃতি, পঁচিশফিট উচ্চ, ইহার ভিতরের ব্যাস ৭ ফিট। লালা কীর্ত্তিনারায়ণের অপর কীর্ত্তি দ্বাদশ শিবের মন্দির। এক এক শ্রেণীতে ছয়টী করিয়া দুই শ্রেণীতে দ্বাদশটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিব স্থাপন করেন।

এই দুই মন্দির শ্রেণীর মধ্যভাগে উত্তর দিকে আর একটী বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আদ্যাশক্তি মহামায়া, দশভুজা অষ্টধাতুনির্ম্মিতা শ্রীশ্রীকাত্যায়নী মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার এক পার্শ্বে বুড়া শিব নামে একটী নাতি বৃহৎ শিব স্থাপনা করেন। এ সকল বিগ্রহাদি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের থাকিবারও সেবার সুবোন্দবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আর সে মন্দির নাই-সে শিল্প কলাও নাই-মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতাও গঙ্গা গর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছেন। শুধু দেবী কাত্যায়নী অনন্তদেবের শ্রীমন্দিরের একপার্শ্বে আশ্রয় পাইয়াছেন।

কীর্ত্তিনারায়ণ ধার্ম্মিক, দাতা, পিতৃভক্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নানারূপে দান ধ্যান তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে ছিল। বিক্রমপুরে বোধ হয় এরূপ গ্রাম অতি অল্পই আছে যে গ্রামে তাঁহার ব্রহ্মোত্তর নাই। তিনি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বহু যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। পিতা কংসনারায়ণের প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। পিতৃনাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কীর্ত্তিনারায়ণ কতকগুলি তালুকের সৃষ্টি করেন, সে সমুদয় অদ্যাপিও তালুক কংসনারায়ণ বসু বলিয়া খ্যাত। নানারূপে কীর্ত্তিদ্বারা যশস্বী হইয়া ইং ১৭৯০—৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে

বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। লালা কীর্ত্তিনারায়ণের কীর্ত্তি সমূহ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীনগর বসু বংশের যাহা কিছু গৌরব তাহার মূলে কীর্ত্তিনারায়ণের কীর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কীর্ত্তিনারায়ণের বংশে আরও দুই চারিজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু স্থাপত্যের দিক্‌দিয়া স্বীয় বাসভূমির উন্নতিকল্পে কাহারও কোন লক্ষ্য ছিল না। কীর্ত্তিনারায়ণের কীর্ত্তির সামান্যতঃ যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও আর কিছুদিন পরে চিরদিনের জন্য কাল সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে।

এই বংশের বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বসু ভ্রাতৃদ্বয়।

গ্রাম্যবিবরণ—ফুরশাইল।

সীমানা—উত্তরে ও পূর্ব্বে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ফেগুণাসার, পশ্চিমে রায়েরবাগ ও চিকনিসার গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটির প্রাচীন প্রচলিত নাম ফুরশাইল ৺রামকানাই রায়ের সঙ্গে উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ফুল্লশালী করিয়া গিয়াছেন। জনসংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার।

সাধারণ বিবরণ—এই গ্রামে বৈদ্যবংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ জমিদার মৃত মহাত্মা রামকানাই রায়ের আবাস পল্লী। ইনি প্রচুর ধন সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ইনি বহু সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার খনিত বহু দীঘি পুষ্করিণী অদ্যাপি বিক্রমপুরের বহুগ্রামে বিদ্যমান আছে। ফুরসাইল গ্রামের সুন্দর বড় দীঘিটি নয়ন তৃপ্তিকর। বর্ষার সময় ইহাতে বেশ জল বৃদ্ধি পায় কিন্তু খরারদিনে

শ্রীনগর সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" বিবৃত হইয়াছে।

উহা প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। লোকের হিতার্থ ইষ্টকনির্ম্মিত শ্মশান, শিব মন্দির, পুল ইত্যাদি ও ইনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামটি দিনদিনই ধলেশ্বরী গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে—ইহার অস্তিত্ব আর বেশী দিন থাকিবে কিনা সন্দেহ। এ গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র ইত্যাদি নানাজাতির বাস। বৈদ্যদের মধ্যে রায় পরিবার ও মান্যবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বি, এল, মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত ৺অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়ের পণ্ডিত অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই গ্রামে বাস ছিল। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত স্বর্গীয় কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয়ের পর পণ্ডিত অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্নের ন্যায় বিক্রমপুরে অপর কোন পণ্ডিতই সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৭৪৯ শকের ২৩শে চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ফুরসাইল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় হাতে খড়ি হইবার পর ইনি পয়সাগাঁ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ৺পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ এবং বিখ্যাত স্মার্ত্ত পুরাপাড়া (কুরাপাড়া) নিবাসী দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ৺রামনারায়ণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ৺গুরুপ্রসাদ রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে ইনি হুগলী জেলায় বলাকারের প্রাচীন পণ্ডিত ৺জগদানন্দ গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হ'ন।

বাসগ্রামে আসিয়া বিদ্যাদানের জন্য এক চতুষ্পাঠি স্থাপন করিলে পর

ন্যায়রত্ন মহাশয় বিদেশী ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। উত্তরকালে সেই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকেই সংসারে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখানে ঐ সকল পণ্ডিতগণের কাহারো কাহারো নাম উল্লেখ করা গেল। বিক্রমপুরের প্রধানতম স্মার্ত্ত ৺কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেশ্বরদির জগচ্চন্দ্র স্মৃতিভূষণ, ময়মনসিংহের রামগোপালপুরের রাজপণ্ডিত মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ন, কালীপুরের সভাপণ্ডিত বরদাকান্ত ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি শত শত কৃতি ছাত্রগণ দেশবিদেশে তাঁহার যশোগান করিতেছেন।

পণ্ডিতা রমাবাই ও মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, প্রভৃতি অনেক মহাত্মা ন্যায়রত্নমহাশয়ের বাটীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি সুদীর্ঘকাল পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বতসমাজের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত রুগ্নাবস্থায় ইনি গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত উপাধি ও মধ্য পরীক্ষার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ "বিবুধজননী সভায়" উপাধি পরীক্ষায় তথায় উপস্থিত থাকিতেন।

ইনি উদারচেতা সরলমতি ও ধর্ম্মবীর ছিলেন। ভাগ্যকুলের ভাগ্যবান্ ভূম্যধিকারিগণ ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

১৮২৯ শকের ৪ঠা পৌষ তারিখে ৮০ আশীবৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন। বিক্রমপুরের মৃত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নামের সহিত ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বি, এল বাহাদুর।

যে সকল বিক্রমপুরবাসী বিদেশে নিজ নিজ কৃতিত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন, তন্মধ্যে মান্যবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন

মহাশয় একজন। নিজ চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগে ইনি বিদেশে যশস্বী হইয়াছেন। ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ফুরসাইল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ



শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন।

করেন। ইঁহার পিতা ৺গোলোকচন্দ্র সেন মহাশয় বিক্রমপুরের স্বনামধন্য ৺রামকানাই রায় ও ৺ গোপালকৃষ্ণ রায় কবীন্দ্রবল্লভের পিসতুত ভ্রাতা ছিলেন। ৺গোলোকচন্দ্র সেকালের রীত্যানুযায়ী পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সময়ে শরচ্চন্দ্রের বয়স প্রায় তিন

বৎসর ছিল। সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না এবং বাল্যকালে অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। মালখানগর গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ মক্তব বা পাঠশালা ছিল এবং ঐ পাঠশালার গুরু মহাশয়ের নিকট (রমানাথ সরকার) চারি বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবৈতনিক ছাত্র স্বরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কিছু দিন মাতৃস্বসার আশ্রয়ে মাণিকগঞ্জের অন্তঃর্গত নবগ্রাম বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠ করেন। তথা হইতে শারীরিক অসুস্থতার জন্য পুনরায় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া শিয়ালদি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হয়েন। দূর সম্পর্কীয় মাতুল স্বনামধন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ও ভগ্নীপতি তেলিরবাগ গ্রাম নিবাসী উদারচেতা, দানশীল ৺আনন্দমোহন দাশ মহাশয়ের আনুকূল্যে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর তারকচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহায্যে বিশেষ কষ্টে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৮১ খ্রীঃ অঃ এণ্ট্রেন্স, ১৮৮৩ সালে এফ, এ ও এবং ১৮৮৬ সালে বেনারস কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ সালে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান। পাঠ্যাবস্থায় শরচ্চন্দ্র কখনও একাধিক্রমে দুইমাস কাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। প্রায় সর্ব্বদাই পীড়িত থাকিতেন তবে অধ্যয়নে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ ছিল। পাঁচ বৎসর কাল বহরমপুরে ওকালতী করিবার পর Watson কোম্পানীর তৎকালীন General manager, সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার অনুরোধেও বিশেষ আগ্রহে পুরুলিয়াতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী ব্যবসায়ে, ইনি যেরূপ যশ ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, প্রায় সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হয় না, ১৯১২ সনে বিহারও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে, শরচ্চন্দ্র ছোটনাগপুর জেলাবোর্ড হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি উহাতে বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি

মানভূম জেলাবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যানের পদে ক্রমান্বয়ে তিনবার নির্ব্বাচিত হন। জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের কার্য্য করিতে থাকাকালীন পুরুলিয়ার মিউনিসিপালিটির বেসরকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি উভয় কার্য্যই করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শরৎ বাবু সদাশয়, প্রফুল্লচিত্ত ও সাংসারিক হিসাবে সুখী। ইনি সমাজ-সংস্কারক এবং পুত্রকন্যাগণের উচ্চশিক্ষাদানে মুক্ত হস্ত। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। দ্বিতীয় পুত্র এডিন্‌বরা সহরে ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছেন। শরৎ বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।

শরৎ বাবু মাঝে মাঝে দেশে আসেন—মুন্সীগঞ্জ "বিক্রমপুর মহাসম্মিলনে" যোগদান ও বৈদ্য জাতিয়সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি রূপে আগমন করিয়া সার্ব্বজনীন ভাবে দেশ-সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীর উপকার করিতে ইনি সর্ব্বদা তৎপর। দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যয়নির্ব্বাহে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় নিয়ত দেশে আসিবার সুযোগও সুবিধা না থাকিলেও তিনি দেশের সহিত ঘনিষ্ট সংযোগ রাখিতে সতত যত্নবান্। গোপনে তিনি বহু লোককে অর্থ সাহায্য দ্বারা পরিপোষণ করিয়া আসিতেছেন। দেশের কার্য্যে কিংবা রাজকার্য্যে সকলের ভিতরই তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শরৎ বাবু আমাদের দেশের যে একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ব্যক্তি তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিদেশে—বিহার অঞ্চলে তিনি বিক্রমপুরের—পূর্ব্ববঙ্গের—সর্ব্বোপরি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল

প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা, শরৎবাবুও সে দেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতায় বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন।

সাধারণ বিবরণ—পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম ছিল 'ফুরাইল' বা ফুরসাইল। স্বর্গীয় জমিদার রামকানাই রায় মহাশয় উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ফুল্লশালী রাখেন। আমরা এইরূপ নাম পরিবর্ত্তনের বিরোধী। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রাম এক বৃহৎ বনভূমি ছিল, তখন শূকর, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি হিংস্র বন্যজন্তুর লীলাস্থল ছিল। এখন উহা বহু বসতিপূর্ণ সুন্দর গ্রাম।

অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ মধ্যে পণ্ডিত ৺জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম, অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাটীতে একটী টোল ছিল, সেখানে বহু ছাত্র আহারও বাসস্থান পাইয়া অধ্যয়ন করিত। তাঁহার মৃত্যুর পর মালখাঁনগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ টোল রক্ষা করিতেছেন। ৺রামকানাই রায়ের বংশধর জমিদার শ্রীযুক্ত দেবীচরণ রায় বি. এল মহাশয়ের বাটীতে উক্ত টোল অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত ৺কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার, ৺গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (হেড্‌মাষ্টার) ৺শশীকুমার চক্রবর্ত্তী উকীল প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিলাত প্রত্যাগত সিভিলসার্জ্জন এই গ্রামের অধিবাসী। গ্রামটি ছোট হইলেও উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা নেহাৎ কম নহে।

হাট বাজার—গ্রামে হাটবাজার না থাকিলেও নিকটেই তালতলার সুপ্রসিদ্ধ বাজার, হাট ও ষ্টীমার ষ্টেসন, কাজেই যাতায়াতের কোনরূপ অসুবিধা নাই।

দীঘি পুষ্করিণী—স্বর্গীয় রামকানাই রায় মহাশয় বরিশালে ওকালতি

করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবশেষে জমিদারী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়াছিলেন। ইঁহার দেশপ্রীতি উল্লেখযোগ্য। নিজ গ্রামে ইনি দুইটী দীঘি খনন করিয়াছিলেন—বড়টির নাম 'বড় কাট্‌রা,' ছোটটির নাম 'ছোটকাট্‌রা'। তাঁহার নির্ম্মিত দুইটী ভগ্ন ও জীর্ণ শিবমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহার একটীর মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। প্রত্যহ যথারীতি পূজা হয় এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে বহুলোক সমবেত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য—গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল, আর নদীতীরবর্ত্তী বলিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মনোরম।

গ্রাম্য বিবরণ—বজ্রযোগিনী।

বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরের একটী সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার আয়তন প্রায় চারিবর্গ মাইল। এই গ্রাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সমীপবর্ত্তী। বঙ্গদেশের গৌরবস্থল সেনরাজগণের রাজধানী রামপাল ইহার সংলগ্ন গ্রাম। ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টগেজেটিয়ারে এই গ্রাম সম্বন্ধে লিখিত আছে যে "Large village in the Munshiganj Subdivision situated in 23·32 N. and 90'29 E. which is best known as being the home of a very large number of Government servants. (Dacca District Gazetteer P. 170) এই গ্রাম পূর্ব্বে নিম্নলিখিত সাতাইশটি পাড়ায় বিভক্তছিল। (১) আটপাড়া (২) পানহাট্টা (৩) আচার্য্যপাড়া, (৫) বরলিয়া (৬) ধামদ (৭) মামাসার (৮) আজিমপুরা (৯) ধামারণ (১০) কল্যাণসিংহ (১১) ডেকুরা

সাধারণ বিবরণ।

(১৬) পুকুরপাড়া (১৭) গুহপাড়া (১৮) পুরোহিতপাড়া (১৯) বসুপাড়া (২০) শঙ্কর বাঁদ (২১) সুখবাসপুর (২২) সরস্বতী (২৩) রামসিং (রামসিং) (২৪) মহাকালী (২৫) দেওসার (২৬) রঘুরামপুর (২৭) ধলপুর। এই গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। এ গ্রামবাসী 'হেলেনা কাব্য' প্রণেতা যশস্বী লেখক স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় তৎপ্রণীত "রাজকুমারী" নামক উপন্যাসে ইহার নাম 'বরদাযোগিনী' উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাল্পনিক যুক্তি এই যে "পালবংশীয় বরদা নাম্নী কোন রাজকন্যা যোগিনী বেশে এই গ্রামে বাস করিতেন বলিয়াই ইহা 'বরদাযোগিনী' বা বজ্রযোগিনী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যোগিনী মুন্সীরগঞ্জের পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনানদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছেন বলিয়াই ঐ ঘাট "যোগিনীঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিবৎসর অষ্টমি স্নানোপলক্ষে এই ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তানুযায়ী এই কিংবদন্তী সত্য নহে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্করঅতিষশ্রীজ্ঞান এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দেবী বজ্রযোগিনীর উপাসক ছিলেন। বজ্রযোগিনী দেবীর অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়াই ইহা 'বজ্রযোগিনী' নামে খ্যাত।

"ভারত-গৌরব জগৎপূজ্য দীপঙ্করঅতিষশ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বৌদ্ধদের একটী প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ ছিল। বিক্রমপুরে অর্থাৎ শ্রীবিক্রমপুর নামক সুবৃহৎ রাজধানীর সমীপবর্ত্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে অতিষ শ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা যখন আমি মৎপ্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" লিখিয়াছিলাম তখন অনেকেই উহা সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, এমন কি আমার গ্রন্থের ভূমিকালেখক পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন "বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষি তখন ভারতবর্ষেও তিব্বতে ছিল না। তিনি ৯৮০ খ্রীঃ অঃ গৌড়ীয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। * * * *

ছিলেন হইতে সম্ভব সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকের। কিন্তু বিক্রমপুরের কোন্ স্থানটি তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন। সম্প্রতি * * * যোগেন্দ্র বাবু বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এ বিষয়ে যাথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।" এই বিষয়টি লইয়া এবং আমার লিখিত "বাঙ্গালার নটরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া একটু আন্দোলনের পর দীপঙ্করঅতিষশ্রীজ্ঞানকে আমি কোন্ কোন্ প্রমাণবলে বজ্রযোগিনীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষ মহানুভব পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং পরে বিক্রমপুরের অন্যান্য গ্রাম হইতে আরও কয়েকটি নটরাজ মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়া সে বিষয় এবং দীপঙ্করঅতিষশ্রীজ্ঞানের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন এখানে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

Mydear Jogendra Babu,

I am glad to hear that you have discovered two images of Nataraja from Eastern Bengal, your discovery confirms my theory that the worship of Nataraja was very common in early times but has almost disappeared from Bengal at the present day.

As regards Dipankara, I long ago gave out my view that he was a native of *Vajrajogini* in Vikrampur.

He flourished during the reign of the Pal-kings and belonged to the vajra sect of the *Mahajan Buddhist*. That sect still exists in Tibet. Their Tantrik practice called Mahasiddhi requires the Company of women called yoginis * * * Three Lamas from Tibet came to invite Dipankar at Vikrampur where they resided for two years. There was a Buddhist University at Vikrampur."

---

* বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিব মূর্ত্তি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ভারতবর্ষ' ১ম বর্ষ

কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগিনীগণের ও তান্ত্রিকগণের বাসহেতু তাঁহাদের উপাস্যাদেবী বজ্রযোগিনীর নামানুযায়ী যে এ গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী হইয়াছে ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য।

বজ্রযোগিনীর বর্ত্তমান সীমানা এইরূপ—পূর্ব্বভাগে রামপাল, চাঁপাতলী, মহাকালী, দক্ষিণ ভাগে নয়ারপুকুর পাড়, আলদি, ধামারণ, মামাসার, মরিয়াল, পশ্চিম ভাগে করলিয়া, সোণারঙ্গ, নাটেশ্বর, ওজোয়ারদেউল। উত্তর ভাগে জোয়ারদেউল ও খন্‌কা। সেটেলমেণ্ট সার্ভেতে প্রাচীন বজ্রযোগিনী গ্রামটি সমস্ত পাড়াসহ নিম্নলিখিত আটটী মৌজায় পরিমাপ হইয়াছে। (১) সুখবাসপুর (২) আটপাড়া (৩) সুয়াপাড়া (৪) বজ্রযোগিনী (৫) ধামদ (৬) নাহাপাড়া (৭) রামসিং (৮) চুড়াইন।

গ্রামের অবস্থান।

এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় পনর হাজার। বজ্রযোগিনী বহু ভদ্রলোকের বাসস্থান। তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। এখানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশও আছেন। মোটের উপর ইহাকে ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। বৈদ্যবংশের সংখ্যা অতি অল্প।

জনসংখ্যা।

বজ্রযোগিনীর বর্ত্তমান গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সোমপাড়ার সোমগণ নাহাপাড়ার নাহাগণ আর দত্ত বাইরগণই প্রাচীন অধিবাসী। মুসলমান অধিবাসী এ গ্রামে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। স্বল্প কয়েক ঘর যুগীর বাসও এ গ্রামে আছে। ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণের মধ্যে বজ্রযোগিনীর পুশিলালগণই সর্ব্ব আদিমবাসী বটেন। কুলীনবংশীয় মুখুর্য্যা, বারর্য্যা, চাটৈর্য্যা, গাঙ্গুলিও কয়েক ঘর আছেন। এই কুলীন ব্রাহ্মণগণ পুশিলাল দ্বারা স্থাপিত। শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে আটপাড়ার চক্রবর্ত্তী বংশীয়েরা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন অধিবাসী।

কায়স্থ অধিবাসিগণের মধ্যে পুকুরপাড়ার গুহ ও তাহাদের জ্ঞাতিগণ, গুহপাড়ার রায়ের বাড়ীর ইদিলপুরের চৌধুরীগণ, সোমপাড়ার চান্দসীর গুহ, ঘোষপাড়ার ও শঙ্করবন্দের ঘোষেরা ও সোমপাড়ার সোমেরা ও নাহাপাড়ার নাহাদের নামই উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত এই গ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী একঘর সরকার বংশও বাস করিতেন।

বজ্রযোগিনী বহু প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের অন্যান্য স্থান হইতে আগত গ্রামের প্রাচীন বহু ভদ্রবংশ পুরুষানুক্রমে তথায় বাস করিতেছেন।

ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার পাল ও সেনরাজগণের সময়ে তাহাদের রাজধানী রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া যে অবস্থিত ছিল বজ্রযোগিনী প্রভৃতির নিকটস্থ অনেক গ্রামই তাহা প্রমাণ করিতেছে। কারণ তাহাতে বহু প্রাচীন অট্টালিকা, প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি পুষ্করিণী কি দীর্ঘিকা খনন সময়ে উত্থিত হইয়াছে। রাজা বল্লালসেনের রাজধানী যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। রামপালের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ বিশেষরূপে পরিদর্শন করিলে উহার প্রাচীন কালের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির কতক অনুমান করা যায় বটে। রামপালের পাঁচ, সাত, দশ মাইল পরিধির মধ্যে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি, ভগ্ন রাজপথ, দেউল,অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাচীনত্বের চিহ্ন দেখাইয়া দেয়। বজ্রযোগিনী রামপালের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম, রাজধানী বল্লালবাড়ী ইহার অতি সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে রামপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেন অনেক প্রাচীন অট্টালিকা, মৃত্তিকা হইতে উত্থিত হইয়াছে ও উহা যে বল্লালী আমলের তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ১২৬৬ সনে এই গ্রামে গুহপাড়ার ৺ভগবানচন্দ্র রায়ের জীবিতকালে তাঁহার বাড়ীতে পুষ্করিণী খনন সময়ে একটী প্রকাণ্ড দেউল বা ইষ্টকালয় প্রাপ্ত হন। ৺ভগবানচন্দ্র রায় ও

করিয়া গিয়াছেন। অল্পদিনের কথা—উক্ত ভদ্রাসনের কোন স্থান হইতে বহু ইষ্টকরাশি উত্থিত হইয়াছিল এবং উক্ত ইষ্টকরাশি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিবার জন্য যে দুইজন বেতনভোগী ভৃত্য উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারই একজন ইষ্টক তুলিতে তুলিতে হঠাৎ উপরিস্থিত মৃত্তিকার চাপে পড়িয়া ভূগর্ভে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তদবধি উক্ত স্থান হইতে ইষ্টক তোলা রহিত হইয়াছে।

কিছুদিন হইল এই গ্রামস্থ চুড়াইনে এইরূপ ভগ্ন ইষ্টকালয়ের কক্ষ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ দাস বি, এ, মহাশয়ের বাড়ীতেও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত দুই একটী অতি প্রাচীন দীর্ঘিকা ও দেবালয় বজ্রযোগিনীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করাইতেছে।

কথিত আছে পুকুরপাড়নিবাসী স্মৃতির প্রাচীন পণ্ডিত ৺ ভৈরবানন্দ তর্কপঞ্চাননের বাড়ীর ভূগর্ভ হইতে ইতিপূর্ব্বে বহু পরিমাণ ইষ্টক রাশি উত্থিত হইয়াছিল এবং তৎসমুদয় ইষ্টক ক্রয় দ্বারা ওহদিগের বর্ত্তমান পাকা এমারতের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত ৺ভৈরবানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় আরও বলিয়াছেন যে তাহার পৈত্রিক ভদ্রাসন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া ইদানীং তন্নিকটস্থ বর্ত্তমান যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার বাহিরের পুষ্করিণী খনন সময়ে এক পাকা অট্টালিকার একাংশ উত্থিত হইয়াছিল এবং বহু চেষ্টা করিয়াও উহা ভগ্ন করিয়া নিম্নদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই। পুনরায় তাহা যে অবস্থায় উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অবস্থায়ই সংরক্ষিত করিয়াছেন। তাহাদের পুরাতন পৈত্রিক বাড়ী এবং এই বর্ত্তমান বাড়ীর সংলগ্ন যে তিনটি প্রাচীন দীঘি পরস্পর কোণাকোণি ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে ঐ তিনটি লালমতি, বোলমতি এবং ইছামতি নামে অভিহিত।

পুষ্করিণী খননে, কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণীটি মুন্সীগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবিশ জ্যোতি-বিনোদ মহাশয়ের গণনানুযায়ী খনিত হয়। আমরা এই খনন ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম। জ্যোতিষী মহাশয় আমাদিগকে এই খনন কার্য্যের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

প্রাচীনত্বের নিদর্শন রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননের বিবরণ।

"আমি গণনা করিয়া জানিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দু রাজধানী রামপাল অঞ্চলে রঘুরামপুর নামক পল্লীতে একটা পুরাতন বুজা দীঘির গর্ভে বহু মাটীর নীচে লোক-চক্ষুর অন্তরালে পাকা বাঁধান স্থান (brick structure) আছে এবং তাহাতে অনেক ধাতব পদার্থ (Metallic goods) নিহিত রহিয়াছে। জ্যোতিষিক গণনায় ধাতু বলিতে সোণা, রূপা, লোহা, তামা, পিত্তল, কাঁসা, রাঙ্গ, সীস, টিন ইত্যাদিই বুঝায়, অধিকন্তু মণি, মাণিক্য এবং সাধারণ প্রস্তরও বুঝাইয়া থাকে। আমি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া সরকারি খরচে আমার গণনার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায়, আমি বিভাগীয় কমিশনর মহোদয়কে গণনার অব্যর্থ ফল দেখিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়াছিলাম এবং একার্য্যে যে ব্যয় লাগে তাহা সম্পূর্ণ নিজে দিতে স্বীকার করিয়া,এবিষয়ের প্রতি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নিজে স্থানটি পরীক্ষা করেন। তাহার পর সরকার বাহাদুর আমাকে নিজ ব্যয়ে ভূমি খনন করিয়া গণনার ফল পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতির বলে আমি গত ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৩ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বহু লোক লাগাইয়া খনন করাইয়াছি। খননকালে চারি মাস পর্য্যন্ত পুলিশের পাহারা বর্ত্তমান ছিল। ১৪।১৫ হাত মাটির নিম্ন হইতে যথার্থই পাকা বাঁধান স্থান এবং তাহার উপরে ধাতুনির্ম্মিত বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি এবং ত্রিশূল, খড়্গ, থাল, সরা, ঘট, শঙ্খ, হরিতকী ইত্যাদি বিবিধ পূজোপকরণ বাহির হইয়া

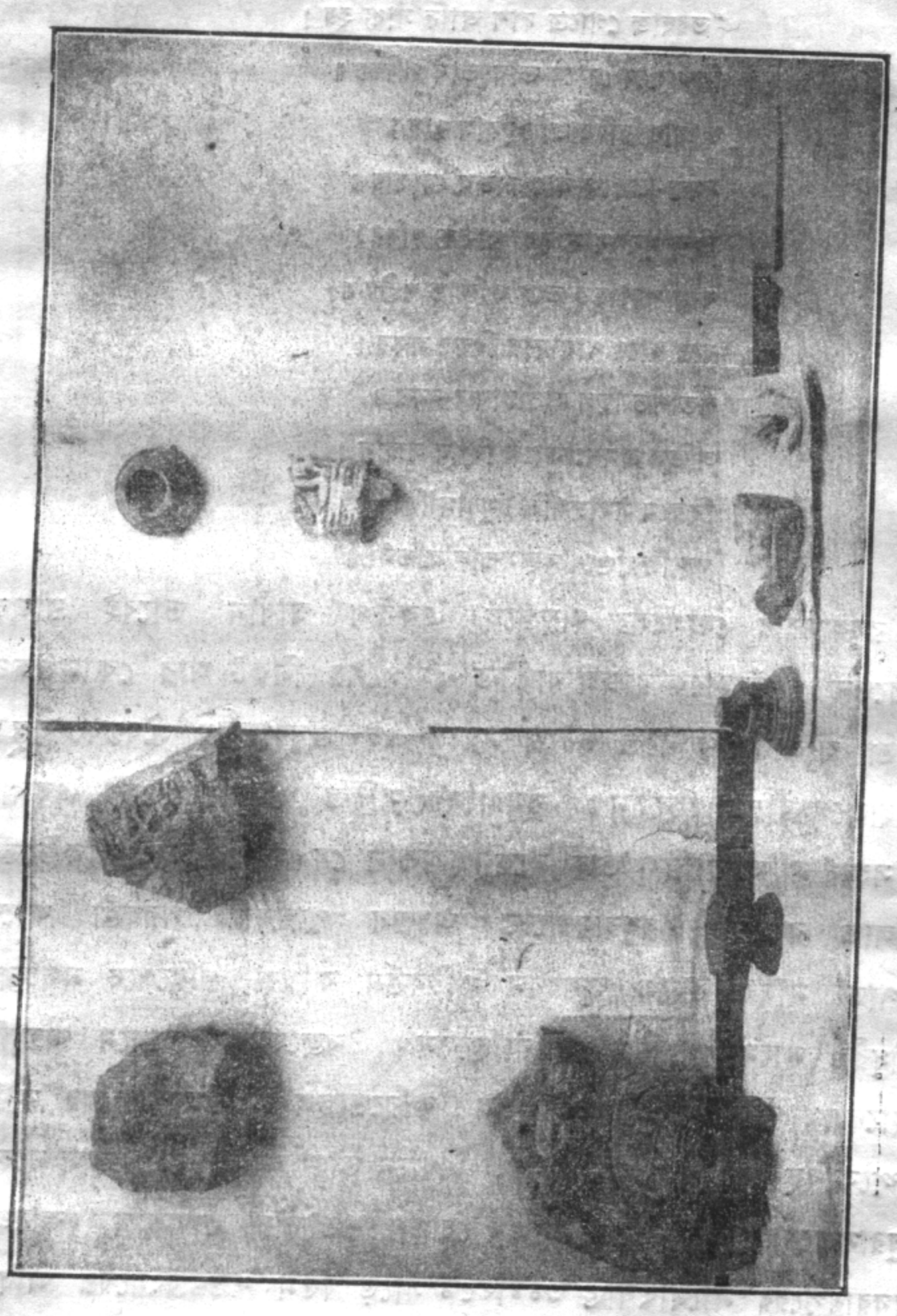
খননের আভাষ।

পড়িয়াছে।" (গভর্ণমেণ্ট ঢাকাতে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ সকল পুরাদ্রব্য পরম যত্নে রক্ষা করিতেছেন।) ভূমি খনন কালে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাসচিব মাননীয় সার উইলিয়ম ডিউক, কে, সি, আই, ই, সি, এস, আই, মহোদয় ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া মুন্সীগঞ্জ থানায় আসিয়া আবিষ্কৃত জিনিষের অনেক গুলি দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা লাট বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে তাড়াতাড়ি ঢাকায় নেওয়াইয়াছিলেন।

গত ১৬ জুলাই, ১৯১৩ তারিখে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মুন্সীগঞ্জে পদার্পণ করিয়া লোকেলবোর্ডের অভিনন্দনের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"As you may have heard I was much interested in the valuable archæological finds lately made with the assistance of Pundit Paraesh-nath Mahalanbis of Panchashar and in February last, I went with my friend Khan Bahadur Aulad Husain to inspect them in the Dacca Cutchery." ইহাই রঘুরামপুরের দীঘি খননের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

এখন রঘুরামপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। রঘুরামপুর রামপালের অন্তর্ভুক্ত একটী অতি প্রাচীন স্থান। স্থানটী প্রাচীন হইলেও নামটী প্রাচীন নহে। রঘুরামপুর এ নামটী সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। এ স্থানের এইরূপ নাম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইহা কি নামে অভিহিত হইত তাহা খুব ভালরূপে সপ্রমাণ করা এতকাল পরে সম্ভবপর না হইলেও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে এই মাত্র। রঘুরামপুর নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি সত্যরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও বাধার কারণ নাই। বারভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠবীর চাঁদ রায়ের কেদার রায়ের অধঃপতনের পর তাহাদের মন্ত্রী রঘুরাম রায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। ইনি জমিদারী প্রাপ্তির



১। রঘুরামপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি।

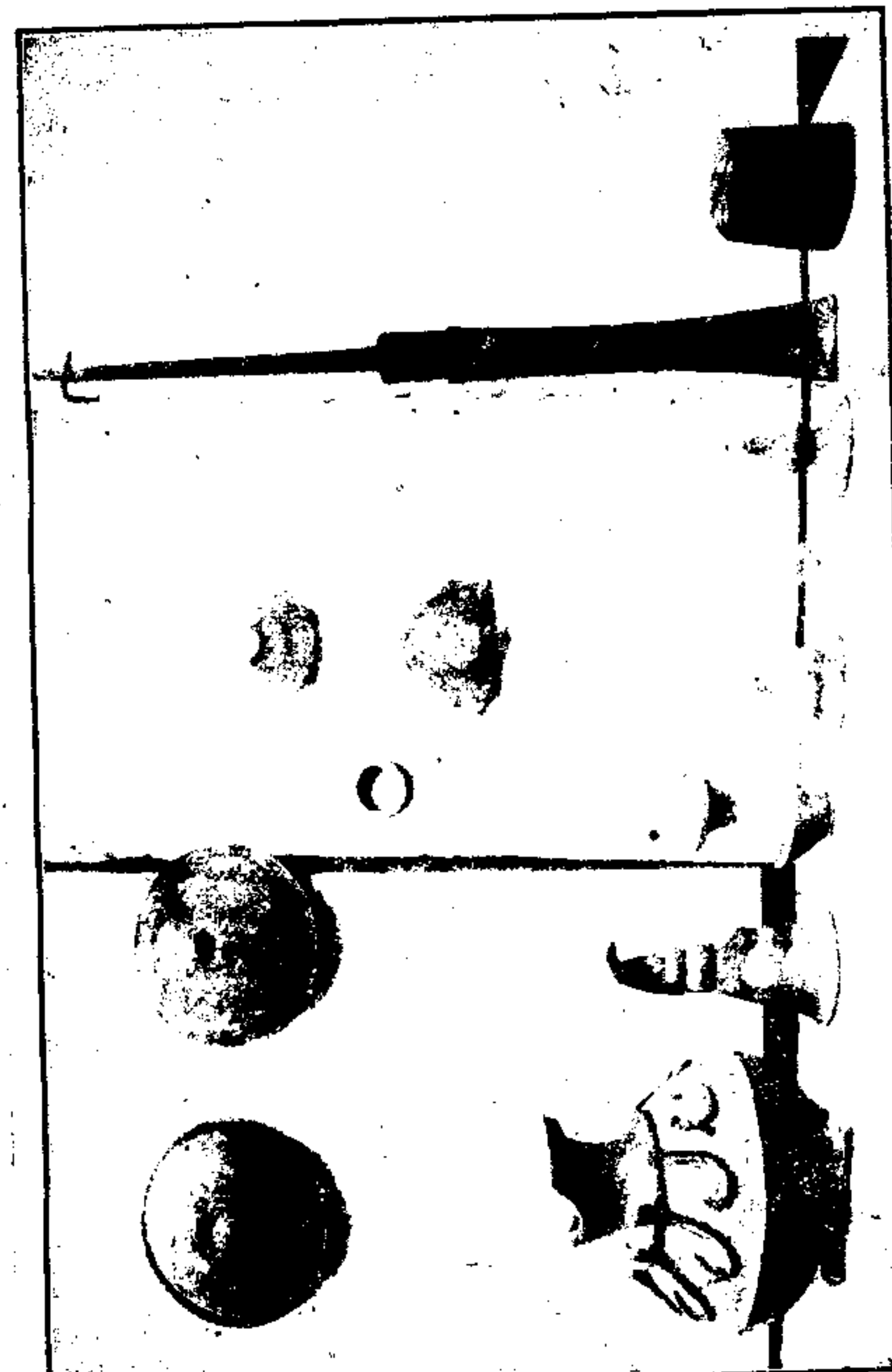
রঘুরামপুর রাখেন। 'ডাকৈর' নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ভরদ্বাজ গোত্রে দাশ আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয়॥
ভরদ্বাজ রবিরাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত-বিক্রমে যার রাজস্ব যোগায়॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর॥
যার দ্বারে খানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর॥
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান।
বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান লভিলা॥"

রঘুরামরায় মোগলের অনুগ্রহে একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজস্ব ব্যতীত মোগলের নিকট আর কোনওরূপ বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না। এই রঘুরামরায় বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিলেন। রঘুরামের সহিত মোগলের দুই একবার যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তিনি সে সকলের প্রত্যেকটিতেই জয়লাভ করেন। রঘুরামরায়ের অধস্তন পুরুষেরা পরবর্ত্তী কালে ন পাড়া নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে নপাড়ার চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে অদ্যাপি ইঁহাদের পুরোহিতবংশীয়গণ বাস করিতেছেন। রঘুরামরায়ের কীর্ত্তি সম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত আছে, এখানে তাহা আলোচনার স্থান নহে। রঘুরামরায়ের অভ্যুদয়ের কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ, কাজেই 'রঘুরামপুরের' নামোৎপত্তি ৩০০।৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক নহে।

রঘুরাম রায় তাঁহার বাসপল্লীর চতুর্দ্দিকে বহু দীঘি পুষ্করিণী ইত্যাদি

খনন করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি বিরাজমান,



২। রঘুরাম পুরের পুষ্করিণী খননে প্রাপ্ত জব্যাদি।

আর কতকগুলি ভরাট হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনার নির্দ্দেশানুসারে যে পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছে তাহা রঘুরামরায়ের পরবর্ত্তী কালে খনিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ দীঘির জল সেচন করিয়া প্রায় ১৫।১৬ হাত নীচুতে ইষ্টক নির্ম্মিত খিলানের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ইষ্টক নির্ম্মিত অংশ বাহির হইয়াছে তাহার চতুর্দ্দিক খনন করিয়া উহা কি তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঁধান অংশটির প্রশস্ততা ৮ ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইহা কতদূর পর্য্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ ঘাট্‌লার উপরের ছাত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। খনন কার্য্যটা আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু অর্থাভাবে আর তাহা হইল না।

যে সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সে সকলের প্রত্যেকটিই আলোচনার যোগ্য। দেব দেবীর মূর্ত্তি মধ্যে সূর্য্য, গণেশ, ধ্যানীবুদ্ধ (ভূমিস্পর্শ মুদ্রা) দ্বিভুজলোকেশ্বর এবং দশাবতারের মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তর-ফলকগুলি অতীব সুন্দর, তক্ষণ-শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। আমরা এখানে রঘুরামপুরের খননে প্রাপ্ত কতক দ্রব্যাদির চিত্র প্রকাশ করিলাম।

(১) রঘুরামপুর স্থানটী পুরাতন কিন্তু নামটী ৩০০।৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে।

(২) যে সকল দ্রব্যাদি ও দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি খুবই প্রাচীন। প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন হইবে।

এই চিত্রদ্বয়ে প্রদীপের গাছা (প্রদীপাধার) মৃত্তিকানির্ম্মিত, সরা, থুন্তী, কলসী, হরিতকী, শঙ্খ, খড়্গ, ভগ্নমূর্ত্তির ঊর্দ্ধভাগ ইত্যাদি রহিয়াছে। এইরূপ বহু নিদর্শন হইতে প্রাচীন রামপালের অতুল সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃত টোল।—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাসভূমি হেতু এই গ্রাম এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল। এখানে সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষার জন্য সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ নিজ নিজ ব্যয়ে টোল স্থাপন করিয়া "পড়ুয়া" অর্থাৎ ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। এখনও এই গ্রামে কয়েকটী টোল আছে। তবে পূর্ব্বের ন্যায় তেমন শ্রীসম্পন্ন নহে। আর্থিক অস্বচ্ছলতাই এই অবনতির প্রধান কারণ। বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন এ গ্রাম নিবাসী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্নের নাম কে না জানেন? এই গ্রামের পুশিলাল বংশের জয়নারায়ণ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, ন্যায়ের টীকা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন পাচ বৎসরকাল এই গ্রামে থাকিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ৺কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশও একজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা এখনও নবদ্বীপের টোলে পড়ান হয়। সেখানে উহা 'কালীশঙ্করি পাইতা' বলিয়া অভিহিত। এতদ্ব্যতীত বৈয়াকরণ ৺জগৎচন্দ্র বিদ্যানিধি, ৺কৃষ্ণধন জ্যোতিষী, ৺গিরিশচন্দ্র জ্যোতিষী ও ভুবনমোহন জ্যোতিষীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্মৃতির পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺প্রসন্নকুমার তর্কনিধি এই গ্রামবাসী ছিলেন। প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বেদধ্যায়ী একজন প্রধান জ্যোতিষী। তাহার বাড়ী এই বজ্রযোগিনী। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৺শ্রীনাথ শিরোমণি এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

স্কুল, পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয়।

এই গ্রামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রায় ৩০টী পাঠশালা ও একটী বালিকাবিদ্যালয় আছে। স্কুলটী বেশ বড় এবং উন্নতিশীল ইহার ইতিহাসও একটু

৺উমাকান্ত ঘোষের বাড়ীতে গভর্ণমেণ্ট সার্কেল স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উহা আটপাড়া বসুদের বাড়ী উঠিয়া আসে। স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর ৺দীনবন্ধু মল্লিক যখন মুন্সিগঞ্জের সব্‌ডিভিসনেল অফিসার হইয়া আসেন তখন ঐ স্কুল ৺জয়চন্দ্র গুহের বাড়ীতে উঠিয়া আইসে এবং সার্কেল স্কুলেই পরিণত থাকে। কতকদিন পরে উহা মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সেই সময় হইতে ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ এই স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং স্কুলের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করেন। পরে ঐ মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় মাইনর স্কুলে পরিণত হয় এবং ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষই তাহার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৩ সনে উহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র গুহ তদবধি সেক্রেটারী আছেন। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচশতের উপরে, পরীক্ষার ফল প্রশংসনীয় এবং বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ ইহার সুদক্ষ হেড্ মাষ্টার। এই স্কুলের জন্য পণ্ডিত ৺কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম অবস্থাতে অনেক যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন। "জ্ঞান-প্রদায়িনী সভা" নামে যে সভা এই স্কুলে ছিল তাহা ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ ও ৺কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়টীর অবস্থা তেমন ভাল নয়। উপযুক্ত স্থানও আর্থিক সাহায্যাভাবে ইহার উন্নতি হইতেছে না।

বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরের পশ্চিম ভাগের অপেক্ষা একটু উচ্চতর স্তরে পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ইহা ভরা বর্ষাতেও পশ্চিম বিক্রমপুরের ন্যায় জলমগ্ন হয় না। উচ্চস্তরে অবস্থান হেতু ইহার স্বাস্থ্য ভাল। বিক্রমপুরের অন্যান্য গ্রামের ন্যায় মারিভয় ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ এগ্রামে বড় একটা শুনা যায় না। গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা উত্তম। প্রায় অনেকের বাড়ীতেই বেশ

গ্রাম্য-স্বাস্থ্য।

বড় ও ভাল পুষ্করিণী আছে। তাহার জলও অতি উত্তম। অনেকের বাড়ীর পুষ্করিণী বর্ষায় বিলের সঙ্গে যোগ হইয়া যায় না। এখানে কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত হইল।

৺ কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ।

বজ্রযোগিনী গ্রামের "রায়ের বাড়ীর" অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি স্বর্গীয় কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ। ইহার পিতার নাম ৺ রাজচন্দ্র রায়। রাজচন্দ্র রায় ভগবানচন্দ্র রায়ের সহোদর মধ্যম ভ্রাতা। কৃষ্ণসুন্দর রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠ সন্তান। ৺ কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ বাঙ্গালা ১২৩৩ সনে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিকৃষ্ণ ঘোষ ও মধ্যম ভ্রাতা দুর্গাচরণ ঘোষ। দুর্গাচরণ ৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণসুন্দরের মাতার নাম পদ্মমালা। ইনি ফরিদপুর জেলার কার্ত্তিকপুরের বসুবংশের কন্যা। কৃষ্ণসুন্দরের বয়স যখন দশমাস মাত্র তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কৃষ্ণসুন্দরের পিতা রাজচন্দ্র রায় দক্ষিণ সাবাজপুর জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবতী কার্য্য করিতেন। তিনি কার্য্য-স্থলে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হন ও তাঁহাকে বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। বাড়ীতে আসিয়া দুই দিন অন্তে তিনি পরলোক গমন করেন।

সাধ্বীসতী পদ্মমালা এই বিপদে বিচলিতা হইলেন না—অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন না। পতির মৃত্যু হইবামাত্রেই তিনি দশ মাস বয়স্ক শিশু কৃষ্ণসুন্দর ও তাহার জ্যেষ্ঠ অপর দুই ভ্রাতাকে তাঁহার জায়ের নিকট সমর্পণ করিয়া নিজ শয়নকক্ষে অর্গলবদ্ধ করিলেন। তথায় পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া মাথায় সিন্দুর লেপন করতঃ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে নিজের অঙ্গুলি পরীক্ষা করিয়া লইয়া নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন এবং মৃত স্বামীর সহ সহমরণ যাইবার জন্য স্বীয় অভিলাষ আত্মীয়

স্বজনের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইঁহার তৎসাময়িক চিত্তের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা দেখিয়া কেহ তাঁহার সংকল্পে বাঁধা দিতে সাহসী হইলেন না।



৺কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখনও বাঙ্গালায় সহমরণপ্রথা একেবারে বন্ধ হয় নাই। কথিত আছে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে তদন্তে আইসেন ও সতী—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সহমরণে যাইতে-

ছেন কিনা—অথবা কোন শিশুসন্তান রাখিয়া পতির অনুসরণ করেন কিনা তাহার অনুসন্ধান করেন। এই সময় দশমাস বয়স্ক কৃষ্ণসুন্দরকে বজ্রযোগিনীর গুহদের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হয় ও পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে জানান হয় যে কোন শিশুসন্তান রাখিয়া সতী সহমরণে যাইতেছেন না।

সাধ্বী পদ্মমালা সহাস্য বদনে মৃত পতির অনুগমন করেন; বজ্রযোগিনী গ্রামে পুকুর পাড়ে সর্ব্বার পুষ্করিণীর তীরে সহমরণ চিতার নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয় কৃষ্ণসুন্দর বা তাঁহার বংশধর কেহই উঁহার স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য এ পর্য্যন্ত কোন স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন নাই।

কৃষ্ণসুন্দর শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আপন খুড়ী কর্ত্তৃক যত্নে প্রতিপালিত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিকৃষ্ণ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিক্রমপুরের কাজিরপাগ্‌লার বসুবংশে বিবাহ করিয়া শ্বশুর কালীপ্রসাদ বসুর উপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণসুন্দরের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণ করেন। কালীপ্রসাদ বসু ঢাকা কালেক্টরীর তৌজিনবিশ ছিলেন—কৃষ্ণসুন্দর তাঁহার বাসায় থাকিয়া শিক্ষারম্ভ করেন। ঢাকা হইতে তিনি সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন ও পাঠ শেষ করেন।

যে সময়ের কথা, তখন ইংরেজী অভিজ্ঞ লোক কমই ছিল। কৃষ্ণসুন্দরের আর বেশী উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হইল না। তিনি অচিরে সিলেট জিলা স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা-বিভাগে তাহার উপার্জ্জনের পথ তেমন প্রশস্ত নহে মনে করিয়া সেখান হইতে তিনি ওকালতী পরীক্ষা দেন ও ইংরাজী ১৮৫৫ সনে ময়মনসিংহে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

কৃষ্ণসুন্দরের ইংরাজীতে যেরূপ অধিকার ছিল—সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি তেমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গৃহে বসিয়া বহু শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

কৃষ্ণসুন্দর অতি অল্প দিন মধ্যেই ওকালতী ব্যবসায় প্রতিপত্তি লাভ করেন। কথিত আছে—ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ উকীল মধ্যে তিনিই ময়মনসিংহ জেলায় সর্ব্বপ্রথম। আইনজ্ঞানে ও ব্যবসায়ের সততায় কৃষ্ণসুন্দর অতুলনীয় ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র-বিশেষ দায়ভাগে তাহার ন্যায় বহুদর্শী ও সমকক্ষ কেহ ছিল না। তিনি ওকালতী ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সদ্ব্যবহার ও করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণসুন্দর সদাশয়, পরহিতকারী ও দানশীল লোক ছিলেন। ময়মনসিংহ বড় বাসা বলিয়া যাহা খ্যাত কৃষ্ণসুন্দর ও ঐ বাসায় বাস করিতেন। তাঁহার বাসায় দৈনিক বহু সংখ্যক লোক আহার পাইত। কৃষ্ণসুন্দরের বংশীয়গণ এখন উক্ত বাসায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণসুন্দর বড় উকীল বলিয়া যেরূপ পরিচিত ছিলেন ভগবান বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মভীরু বলিয়াও তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। পূজার সময় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দান গ্রহণ করিতে আসিয়া কেহ কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের সঙ্গে শাস্ত্রীয় কূটতর্ক ও প্রশ্নাদির মীমাংসা না করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনেক সময় বড় বড় পণ্ডিতগণকে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছে। তিনি হিন্দুশাস্ত্র ভালরূপে অধীত থাকিলেও পৌত্তলিকতার উপর তাঁহার তেমন আস্থা ও বিশ্বাস ছিলনা। কতক সময় তিনি ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সহানুভূতি ও যোগদান করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণসুন্দর জনহিতকর কার্য্যে ও সময় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮৬৯ সন হইতে ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত তিনি ক্রমান্বয়ে মিউনিসিপালিটীর টাউন কমিটীর একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন।

দিবসে কৃষ্ণসুন্দর নিজ ব্যবসায়ের কার্য্য করিতেন। রাত্রিযোগে শাস্ত্রবিষয়, ধর্ম্মবিষয় নানা পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিতেন। রাত্রিতে

অর্থের জন্ত কেহ কোন দিন তাঁহাকে খাটাইতে পারেন নাই। তিনি ময়মনসিংহে তদানিক বারের একজন শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া বহু অর্থী প্রত্যর্থী সময় অসময় তাঁহাকে ব্যবসার কার্য্যে বিরক্ত করিতে আসিতেন। একদিন এক বড় মক্কেল মামলার পরামর্শ গ্রহণ জন্য রাত্রিতে কৃষ্ণসুন্দরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণসুন্দর তখন ধর্ম্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—তিনি কিছুতেই রাত্রিকালে ব্যবসার কাজ করিতে রাজি হইলেন না। পরন্তু মক্কেলকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে "আমি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় সন্তানসন্ততির জন্ত নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছি ও সন্ধ্যার পর রাত্রিটা আমার নিজের কাজের জন্ত রাখিয়াছি ইহা হইতে আমি একটু সময় ও সন্তান সন্ততির জন্ত দিতে পারিব না।"

অনেক বৎসর যশ ও সুখ্যাতির সহিত ময়মনসিংহে ওকালতী করিয়া ১৮৭২ সনে ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণসুন্দর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করেন।

বজ্রযোগিনী 'রায়ের বাড়ী' দোল দুর্গোৎসবে বহু টাকা ব্যয় হইত। কৃষ্ণসুন্দর বিক্রমপুরের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বহু অর্থ দান করিতেন। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ আপন খুল্লতাত ভ্রাতাদিগের সহ পরামর্শ করিয়া 'রায়ের বাড়ীর' পূজায় ছাগ বলিদান উঠাইয়া দেন। তদবধি আর তাঁহাদের বাড়ীতে পূজায় বলি হয় না।

বজ্রযোগিনী গ্রামের উন্নতিকল্পে কৃষ্ণসুন্দর মুক্তহস্ত ছিলেন। বিয়নিয়ার খাল হইতে গজারখোলা পর্য্যন্ত যে কাটাখালি আছে তাহার খনন ব্যয় ৺কৃষ্ণসুন্দর বহন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত গ্রামের অন্যান্য সৎকার্য্যও পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি কৃষ্ণসুন্দরের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তাহার মত ন্যায়পরায়ণ, সাধুও হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই গ্রামে বিরল।

স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ।

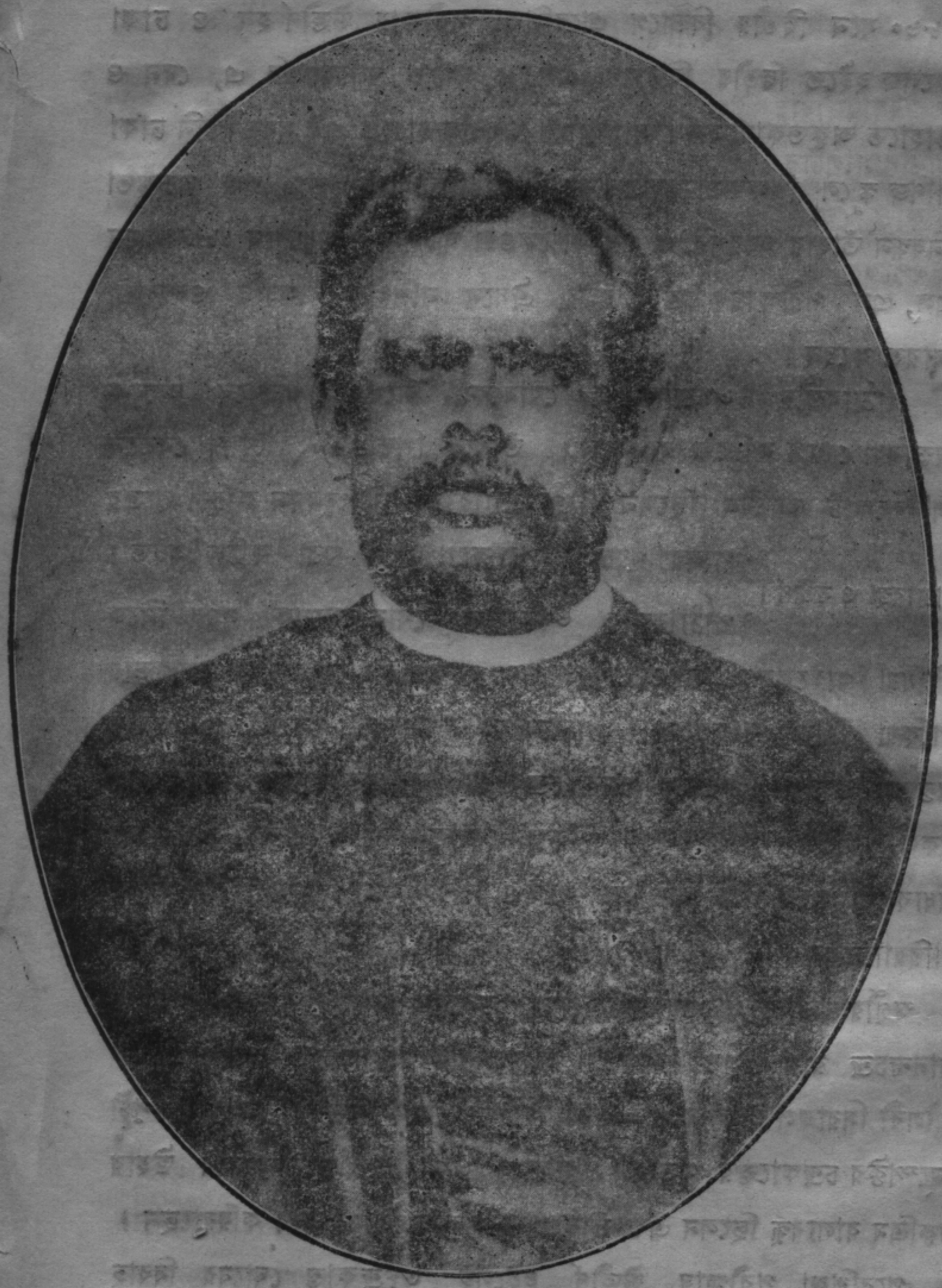
ব্যবহারজীবীর উচ্চ আদর্শ, ময়মনসিংহ বারের শ্রেষ্ঠ উকীল ও মিউনিসিপালিটীর প্রথম নির্ব্বাচিত চ্যায়ারম্যান, বিক্রমপুরের গৌরব ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ বাঙ্গালা ১২৪৮ সনে ৩০শে কার্ত্তিক জিলা ঢাকার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণকান্ত ঘোষ।

জন্ম ও বংশাবলী।

কৃষ্ণকান্ত সেকালের একজন খ্যাতনামা সত্যনিষ্ঠ ও সুদক্ষ সিবিলকোর্ট আমিন ছিলেন। ইঁহারা ফরিদপুরের অন্তর্গত ইদিলপুরের কুলশ্রেষ্ঠ কমলনারায়ণ রায় চৌধুরীর বংশোদ্ভব। চন্দ্রকান্ত ঘোষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইদিলপুর হইতে বজ্রযোগিনী গ্রামে গুহবংশে বিবাহ করিয়া যৌতুকাদির সহিত ভদ্রাসন প্রাপ্তে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহাদের বজ্রযোগিনীর বাড়ী এখনও "রায়ের বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ তিনবৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। মাতৃ বিয়োগ হইলে তাহার পিসীমাতা ও পরে বিমাতা তাঁহাকে লালনপালন করেন। চন্দ্রকান্তের একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন অন্য কোন ভ্রাতা কি ভগ্নী ছিল না। বাল্যকালে নিজ বাড়ীতে কাহারো নিকট চন্দ্রকান্তের শিক্ষা আরম্ভ হয়। (৯ বৎসর বয়সে জ্ঞাতি খুল্লতাত ৺কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের নিকট থাকিয়া সিলেট জিলা স্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ সিলেট জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে ওকালতী আরম্ভ করিলে চন্দ্রকান্ত ময়মনসিংহের জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে

বাল্যজীবন ও শিক্ষা।



স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ।

১৮৬০ সনে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ঢাকা কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এল, এ, পাশ করিয়া বি, এ, দেন ও তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। সাংসারিক অস্বচ্ছলতাহেতু এই সময় তিনি ঢাকা গণিজ স্কুলে শিক্ষকতা লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার আর বি, এ পরীক্ষা দেওয়া ঘটিলনা—অবশেষে ১৮৬৯ সনে এল্, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐসনে নশিরাবাদ সহরে ওকালতী আরম্ভ করেন।

পাঠ্যাবস্থায় ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষকে অর্থের অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার পিতা ৭০৲ টাকা বেতনে সিবিলকোর্ট আমিন ছিলেন। পারিবারিক ব্যয়সংকুলান করিয়া পুত্রের পড়ার খরচ উপযুক্তরূপে বহন করা কঠিন হইত।

পাঠ্যাবস্থা ও সতীর্থ।

পাঠ্যাবস্থায় ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ অনেক সময় নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ লাকুড়ীদাস বাবাজীর আকড়ায় থাকিয়া তিনি পড়িতেন। গণিজস্কুলে শিক্ষকতা নেওয়া ও তাহার অন্যতম কারণ। অনেক সময় চন্দ্রকান্ত আইনের পুস্তক নিজ হস্তে নকল করিয়া পড়িতেন। কিন্তু আত্মনির্ভর, কষ্টসহিষ্ণুতা দৃঢ় অধ্যবসায় গুণে এত অসুবিধা সত্ত্বেও কর্ম্মজীবনে তিনি কৃতী হইতে পারিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন, ডাক্তার রাধাকান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, মৃত মৌলভী হামাদউদ্দীনআহাম্মদ, নবাব শ্রীযুক্ত মৌলবী সিরাজল ইছলাম ও ৺কালীকিশোর সোম ভূতপূর্ব্ব স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর চন্দ্রকান্তের সতীর্থ। স্বগ্রামে ৺কাশীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহার অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার বহু সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষের বিবাহ

হয়। আউটসাহী গ্রামের ৺জগৎচন্দ্র গুহ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই চন্দ্রকান্ত স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। গ্রামের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষা প্রবর্ত্তন জন্য ও চন্দ্রকান্তকে পাঠ্যাবস্থায় যে কম খাটিতে হয় নাই। নিজ পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন করিতে চন্দ্রকান্ত যত্নবান হইলেন। এই সদনুষ্ঠানে গ্রামের অনেক লোক বিরোধী হইলেন। তিনি কিছুতেই ভীত না হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার বিমাতার শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া আপন পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। এবং এই সূত্রে তাঁহার গৃহে গ্রামের অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা জন্য মহিলাবিদ্যালয় স্থাপন হয়। মহিলারা দ্বিপ্রহরে তাঁহার বিমাতার নিকট লিখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গ্রামের প্রাচীন রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ চন্দ্রকান্তঘোষের উপর খড়্গহস্ত হইলেন—মহিলা বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি চন্দ্রকান্তের অনুরাগ একটুও হ্রাস হইল না। পরন্তু কয়েক বৎসর পরে বজ্রযোগিনীতে যে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা চন্দ্রকান্ত ঘোষের ও তাহার কতিপয় সুহৃদের চেষ্টার ফল। চন্দ্রকান্তের স্ত্রী-শিক্ষানুরাগ এতই বলবতী ছিল যে তিনি ঢাকাকলেজে অধ্যয়নকালে আর্থিক অনাটনে থাকিয়াও ১২৭০ সনে "সাবিত্রী-উপাখ্যান" নামীয় স্ত্রী-শিক্ষাপযোগী একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করেন। উহাতে উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, বিবাহের উন্নত আদর্শ, গৃহ-ধর্ম্ম, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ে অতি সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন।

স্বগ্রামের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার জন্য চন্দ্রকান্ত কম চেষ্টা উদ্যোগ করেন নাই। বজ্রযোগিনী স্কুলে "জ্ঞান প্রদায়িনী সভা" নামে যে সভা ছিল ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ ও তাহার বাল্যবন্ধু পুকুরপাড় নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টার ফল। বজ্রযোগিনী স্কুল তখন সায়েন্স স্কুল ছিল—ইঁহাদের উদ্যোগেই তাহা মাইনর স্কুলে পরিণত হয় ও ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ বহুদিন তাহার সম্পাদক থাকিয়া স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার।

নশিরাবাদ চন্দ্রকান্ত ঘোষের পূর্ব্বপুরুষের কর্ম্মস্থান ছিল। ১৮৬৯ সনে ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ ময়মনসিংহে ওকালতী আরম্ভ করেন। এবং ময়মনসিংহই (নশিরাবাদ) তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। তাঁহার পিতা কৃষ্ণকান্ত ঘোষ তখন সেখানে সিভিলকোর্ট আমিন। খুল্লতাত ৺কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ তখন সেখানে একজন খ্যাতনামা প্রধান উকীল। চন্দ্রকান্ত নিজ প্রতিভায় শীঘ্রই ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। চরিত্রবান, ব্যবসার সততায় ও কার্য্যদক্ষতায় শীঘ্রই উকীলশ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। জীবনে তিনি একদিন ব্যতীত দ্বিতীয় বার কোন ফৌজদারী কোর্টে উপস্থিত হন নাই। দেওয়ানী মোকদ্দমায় ও নিম্নআদালতে কেহ তাঁহাকে নিতে পারেন নাই। জজ ও সবজজ কোর্টে তাঁহার ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহাতেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বড় ও জটিল মোকদ্দমায় কোন না কোন পক্ষে চন্দ্রকান্ত ঘোষ উকীল নিযুক্ত থাকিবেনই। ওকালতী ব্যবসায়ে তাঁহার সততা আদর্শস্থানীয়। অর্থজীবি হইয়াও চন্দ্রকান্ত অর্থোপার্জ্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করেন নাই। অর্থ হইতে নিজ স্বাধীনতা ও সম্মানকে বেশী মনে করিতেন।

কর্ম্মক্ষেত্র।

তিনি কোন জমিদারের বেতনভোগী উকীল ছিলেন, কেহ কোনদিন চন্দ্রকান্ত ঘোষকে তাহার জমিদার মহেশের বাড়ী যাইতে দেখেন নাই। মোকদ্দমায় মিথ্যার সংস্রব পাইলে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অর্থপ্রলোভনে কেহ তাহাকে নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করাইতে পারে নাই। এ জীবনে এইভাবে বহু অর্থ উপেক্ষা করিয়াছেন।

ওকালতী ব্যবসা প্রতিপত্তি ও সততা।

ইংরেজী ১৮৭৯ সনে ব্যবহারজীবি আইন (Legal Practitioner Act) বিধিবদ্ধ হইলে উকীলগণের মোক্তারদিগকে দশত্রা কি বিশত্রা দেওয়া আইনবিরুদ্ধ হয় বলিয়া ৺চন্দ্রকান্ত মোক্তারদিগকে দশত্রা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন জ্ঞানবিস্তাসম্মত কোন মোক্তারকে এক কপর্দ্দকও আর দেন নাই। এজন্য তাঁহার উপার্জ্জনের পথ সংকীর্ণ হইয়াছিল। জমিদারের মোক্তারগণ তাঁহার প্রথায় ক্রমে কমিয়া আসিল চন্দ্রকান্ত কিছুতেই টলিলেন না—আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, নিজ বিবেকের আদেশ পালন করিলেন এবং সকল প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোনপ্রকার এই দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া নিজ সম্মান ও ব্যবসায় গৌরব বজায় রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে ছোট একটুক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ওকালতীর প্রসার কমিতে দেখিয়া চন্দ্রকান্তের বৃদ্ধ পিতা কৃষ্ণকান্ত একদিন চন্দ্রকান্তের নিকট কাছারিঘরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—"সকল উকীলই ত মোক্তারদিগকে দশত্রা দিতেছে—তুমি তাহা না দিয়া নিজ ব্যবসা কেন মাটী করিতেছ?" পিতার অনুযোগবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সততা ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া বিনয়ের সহিত এইমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন যে "তাহা হইলে আপনিওত জীবনে বহু অর্থ

উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।" চন্দ্রকান্তের পিতা দ্বিরুক্তি না করিয়া সলজ্জে রণভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলেন। আইনজ্ঞানে চন্দ্রকান্তের বিচক্ষণতা, ব্যবসায়ে তাঁহার প্রতিপত্তি, সাধুতা, নৈতিক চরিত্র ও অর্থি প্রত্যর্থীর সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার ময়মনসিংহে কেন পূর্ব্ববঙ্গে ও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও সকলের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ শুধু একজন বড় উকীল বলিয়া সকলের নিকট পরিচিতওগণ্য ছিলেন না। তিনি সাধারণের হিতকার্য্যে বিশেষ স্বায়ত্তসাশন বিভাগে একজন আদর্শ কৃতিপুরুষ ছিলেন। নশিরাবাদ মিউনিসিপালিটীর উন্নতিকল্পে তিনি যে ক্রমান্বয়ে পনর বৎসর নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ময়মনসিংহবাসী কখনও ভুলিবেন না। ইংরাজী ১৮৭৮ সনে তিনি প্রথম টাউন কমিটীর মেম্বার হন। তখন বাঙ্গালার স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। ১৮৮৪ সনে তিনি টাউন কমিটীর সর্ব্বপ্রথম ভাইসচ্যায়ারম্যান হন। তৎপূর্ব্বে সাহেবগণই এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। ১৮০৫ সনে মহাত্মা লর্ড রিপণের গুণে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী প্রচলিত হইলে ১৮৮৬ সনের মে মাসে নশিরাবাদ মিউসিপালিটীর প্রথম নির্ব্বাচনে ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষই একবাক্যে তাহার প্রথম চ্যায়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। এবং নিজ কার্য্যদক্ষতা গুণে করদাতাগণের সম্পূর্ণ আস্থা ওবিশ্বাস তাহাতে অর্পিত হয় ও তিনি ক্রমে পরবর্ত্তী দুইবার নির্ব্বাচনে একবাক্যে চ্যায়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়া মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে লোকের কর্ম্ম-শক্তির বিকাশ হয় মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে চন্দ্রকান্তের সে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার শাসন সময়ে ময়মনসিংহ নগরের বিশেষ বাঙ্গালীপাড়ার যাবতীয় উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার রাস্তা

মিউনিসিপাল ও সাধারণ হিতকার্য্যে চন্দ্রকান্ত।

ঘাট, ড্রেণ ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর সমভাবে দৃষ্টি ছিল। ময়মনসিংহের যে কয়টী প্রধান অভাব ছিল তাহা চন্দ্রকান্ত ঘোষের তত্ত্বাবধানে পূরণ হইয়াছে। নগরে টাউনহল নির্ম্মাণ, জলের কল সংস্থাপন তাহার প্রধান কীর্ত্তি।

টাউনহল ও সূর্য্যকান্ত লাইব্রেরী।

১৮৭৭ সনে স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য "রাজাবাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নশিরাবাদের হিতকল্পে দশ হাজার টাকা দান করেন। উহা-দ্বারা ডিঃ, ম্যাঃ এক "অর্ণেমেণ্টেল গার্ডেন" প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হন। তখন ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ ও তাঁহার সহায়কারী ৺প্রাণকুমার দাস ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেট তৎপরিবর্ত্তে 'টাউনহল' নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই প্রস্তাব নিয়া উর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষগণ সঙ্গে ঘোর বিতণ্ডা হইল। এই প্রস্তাবে রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরও সমর্থন করিলেন। চন্দ্রকান্তের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় 'সূর্য্যকান্ত হল' নির্ম্মিত হইয়া নগরবাসীর বহু কালের এক অভাব মোচন করিয়াছে। দশ হাজার টাকায় একার্য্য সমাধা হইতে পারিত না এজন্য চন্দ্রকান্ত ঘোষ রাজাবাহাদুর হইতে ক্রমে ২২০০০৲ টাকা দান লইয়া একার্য্য সুসম্পন্ন করেন। অধিকন্তু ইহার উপর ঐ টাউনহলে "সূর্য্যকান্ত লাইব্রেরী" নামে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন জন্য আরও ৫০০০৲ টাকা রাজাবাহাদুর হইতে দান স্বীকৃত করিয়া বহু পরিশ্রমে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ করতঃ সহরের এক গুরুতর অভাব পূর্ণ করিয়া যান। দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণের কার্য্যতায় ও অনবধানতায় ঐ মূল্যবান পুস্তকালয় সমূলে ১৯০২ সনে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়াছে। সে অভাব আজও কেহ পূরণ করিতে পারে নাই।

ময়মনসিংহ নগরে জলের কল সংস্থাপন ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষের জনহিতকর

কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম যত্ন চেষ্টার অন্যতম প্রসূত ফল। রাজা সূর্য্যকান্ত তাঁহার পরলোকগতা রাণী রাজরাজেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে ও নগর-বাসিগণের কল্যাণসাধনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান ঘোষণা করেন।

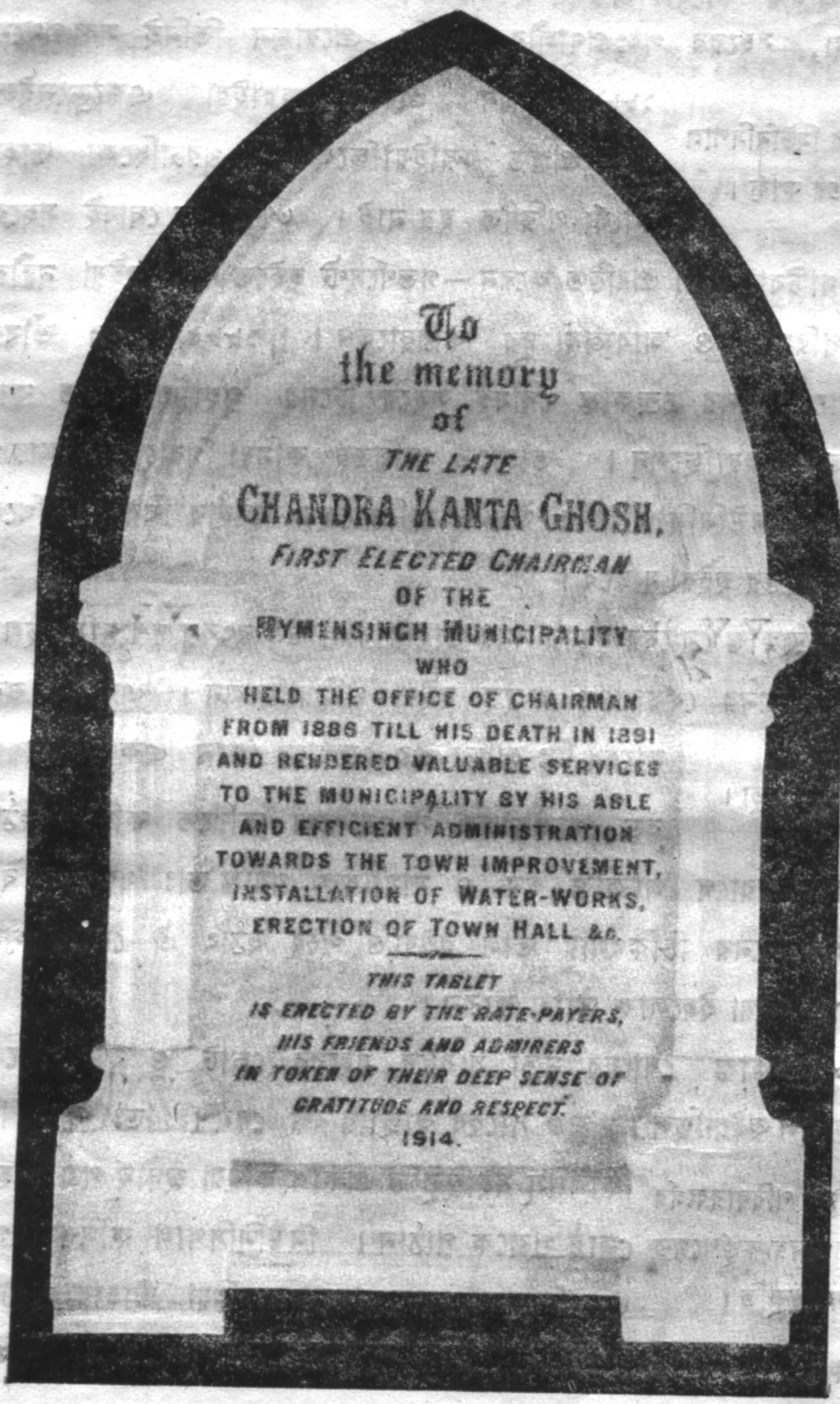
জলের কল।

দান ঘোষণাকালে রাজাবাহাদুরের ইহাতে অভিপ্রায় থাকে, রাণী ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু সময়ে সাতিশয় তৃষ্ণাতুরা হইয়া দেহত্যাগ করেন তাই এই দানের টাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিলে তাহাই বাঞ্ছনীয় হইবে। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা রাণীর স্মৃতি রক্ষার্থে ময়মনসিংহ সহরে সাধারণের কোন হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য উহা গভর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছেন এই মর্ম্মে রাজাবাহাদুর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্লেজিয়ার সাহেবকেও এক পত্র লিখেন ও এই বিষয় সম্বন্ধে ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ প্রভৃতি সহ পরামর্শ করিতে অনুরোধ করেন। ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ মিঃ গ্লেজিয়ার সাহেব সঙ্গে দেখা করিলে তাঁহাকে স্থানীয় বিবিধ অভাব জ্ঞাপন করিয়া জলের কলের সংস্থাপনের প্রস্তাব ও উল্লেখ করেন। জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমতে চন্দ্রকান্ত ঘোষের নেতৃত্বে ১৮৮৭ সনে সারস্বত মঞ্চে জনসাধারণের এক সভা আহূত হয়। ঐ সভায় মিঃ গ্লেজিয়ার সভাপতি ছিলেন। সভাতে এই অঙ্গীকৃত দানের টাকায় জলের কল সংস্থাপনের প্রস্তাব ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষই সর্ব্ব প্রথম উত্থাপন করেন ও সভাপতিকে ইহাও জানান যে রাজা রাজাবাহাদুরেরও এই এই অভিমত। এত অল্প টাকায় জলের কল হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া সভাপতি উক্ত প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। পরে অন্যান্য প্রস্তাব মধ্যে অধিকাংশের মতে এই টাকায় এক শিল্পবিদ্যালয় ('Technical school) সংস্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত

ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলে চন্দ্রকান্ত ঘোষ তাঁহাকে ও রাজাবাহাদুরকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দর্শাইয়া জলের কলের জন্য দান বৃদ্ধি ও দত্ত সাহেবকে জলের কল স্থাপনে সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। দত্ত সাহেব ও জলের কলের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে চন্দ্রকান্ত বাবু রাজাবাহাদুর ও দত্ত সাহেবের সহিত অনেক চিঠিপত্র লিখিতে থাকেন। আরও কতক টাকা দান বৃদ্ধি করিলে জলের কল হইতে পারে কিনা তদ্‌বিষয় জানিবার জন্য রাজাবাহাদুর পক্ষে চন্দ্রকান্ত ঘোষেরও নিকট চিঠি লিখা হয়। রাজাবাহাদুর ও স্বয়ং চন্দ্রকান্ত বাবুকে ডাকাইয়া তাহার অঙ্গীকৃত দানের টাকায় জলের কল হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও সম্ভবপর হইলে তিনি দান বৃদ্ধি করিতেও ইচ্ছুক আছেন জ্ঞাপন করেন। এদিকে নানাজনে নানাবিধ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। মিঃ লারমেনী বিভাগীয় কমিশনার, এই টাকায় সহরে 'গ্যাসালোকে' করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তদ্‌বিরুদ্ধে জন-সাধারণের এক সভা হয়। সেই সভায় জলের কল হওয়ার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষ প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক রাজাবাহাদুরের দান বৃদ্ধি করার জন্য মুক্তাগাছার রেল ষ্টেশনে যান, রাজা অঙ্গীকৃত দানে জলের কল হইলে বৃদ্ধি করিবেন অভিমত প্রকাশ করিলেন। এজন্য চন্দ্রকান্ত ঘোষকে কত হাঁটিতে খাটিতে ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ও অবশেষে তিনি কিরূপে রাজাবাহাদুর হইতে দান বৃদ্ধি করাইয়া লইলেন তাহা অনেকেই অবগত নহেন। চন্দ্রকান্ত বাবুর প্রার্থনা মতে চেষ্টার ক্রমে রাজাবাহাদুরের ৩০০০৲। ২০০০৲ ও অবশেষে আরও ১২৫০৲ টাকা দান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্ত বাবু অন্যান্য সহ দত্ত সাহেবকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাঁহার চেষ্টা ও অনুগ্রহে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড

জলের কলের কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবং জলের কল স্থাপনের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক মঞ্জুর হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। জলের কলের পরিচালন ব্যয় ট্যাক্স ধার্য্য দ্বারা সংগ্রহ করা হইবে মিউনিসিপালিটী অবধারিত করেন। এই সময়ে অত্যধিক ট্যাক্সের ভয়ে করদাতাগণ ভীত হইয়া সহরের গণ্যমান্য অন্যান্য ব্যক্তিগণের সাহায্যে টাউনহলে জলের কল স্থাপনের বিরুদ্ধে এক বিরাট সভা করেন।

ঐ সভায় কিন্তু তুমুল বাক্‌বিতণ্ডাই হইয়াছিল। চন্দ্রকান্ত বাবু অতি কৌশলে ও তাঁহার কার্য্যতৎপরতাগুণে সেই সভার কার্য্য এমনভাবে পরিচালনা করিলেন যে জলের কলের প্রস্তাবই অব্যাহত রহিল। চন্দ্রকান্তের উদ্দেশ্য সফল হইল—জলের কলের পক্ষপাতীগণই জয়ী হইলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি সর্ব্ব কাজ সুসম্পন্ন করিতে না করিতেই হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। বঙ্গেশ্বর সার চার্লস্ ইলিয়ট্ ময়মনসিংহে আসিবেন ঘোষিত হয়। চন্দ্রকান্ত বাবু সুস্থ হইয়া তাঁহারদ্বারা জলের কলের ভিত্তি সংস্থাপন করিবেন ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিদারুণ কালই তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইতে দিলনা। ১৮ই জুলাই (১৮৯১ সন) রাত্রিতে তিনি পরলোক গমন করেন। ১১ই আগষ্ট বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক জলের কলের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। ৺চন্দ্রকান্ত ঐ ভিত্তি সংস্থাপনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না বটে কিন্তু স্বর্গে মন্দাকিনী তীরে বসিয়া, নগরবাসীর স্বাস্থ্য সৌভাগ্য ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই! জলের কলের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা সূর্য্যকান্তের নামের সঙ্গে পরামর্শ দাতা, প্রধান উদ্যোগী অক্লান্তকর্ম্মা ৺চন্দ্রকান্তের নামও চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাই সূর্য্যকান্ত হলে মর্ম্মর প্রস্তরফলকে ৺চন্দ্রকান্তর কৃতিত্ব উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে ও বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ সনের ৯ই জুলাই সেই স্মৃতিফলক স্বহস্তে উন্মোচন করিয়া স্বর্গ-



চন্দ্রকান্ত স্মৃতিফলক—ময়মনসিংহ টাউনহল।

ইহা ব্যতীত নানাভাবে নগরের উন্নতি সাধনে চন্দ্রকান্তের বিরাম ছিল না, সহরের পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি প্রয়োজন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ১৮৮৩ সনে প্রদর্শন করাইয়া একড্রেনেইজ স্কীম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। খরচাধিক্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষই সহরে মেথর খাটিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন—গভর্ণমেণ্ট হইতে দান লইয়া নদীর পার পরিষ্কার ও আবর্জ্জনা দূর করিয়াছেন। ১৮৮৫ সনের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের পর চন্দ্রকান্ত ঘোষই সহরে টিনের গৃহাদি প্রস্তুত করা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে অগ্নিভয় কমিয়া গিয়াছে। আরও কতভাবে মিউনিসিপালিটীর উন্নতি করিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিলে জীবনী বৃহত্তর হইয়া যাইবে।

অপরাপর মিউনিসিপাল উন্নতির কার্য্য।

৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষের মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ৪৯ বৎসর দশ মাস ছিল। তিনি জীবনের শেষভাগে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন জজ সাহেব মিঃ হার্ডিং এর এজলাসে কোন এক জটিল ও বড় মোকদ্দমার সাওয়ালজব করিতে করিতে হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও মাসাধিক পর্য্যন্ত ডাঃ ধর্ম্মদাস বসু সিভিলসার্জ্জনের চিকিৎসায় ভাল হইয়াও পরে হঠাৎ ঐ রোগে পুনঃ আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

অকাল মৃত্যু।

৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষের মৃত্যু সংবাদে সহরের ছোট ও বড় সকলেই শোকাকুল হইয়াছিল। জজ সাহেব কাছারি বন্ধ দেন। ডিঃ ম্যাঃ মিঃ ফিলিপস্ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সুদীর্ঘ পত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠান। মিউনিসিপাল কমিশনারগণ এক বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটী কমিটী

মৃত্যুকালে পরিবারবর্গের ও বালকদের কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি।

স্থাপিত হয়। এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া মিউনিসিপাল আফিস একদিন বন্ধ দেন। বার লাইব্রেরী এক শোকসভা করিয়া সহানুভূতি প্রেরণ করেন।

উক্ত সব কমিটীর চেষ্টায় করদাতাগণ ও চন্দ্রকান্ত ঘোষের বন্ধু ও হিতৈষী ব্যক্তিগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিফলক সূর্য্যকান্ত হলে সুরক্ষিত হইয়াছে ও বাঙ্গালার ফলক ও তৈল চিত্র। গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাহা উন্মোচিত করিয়াছেন।

মর্ম্মর প্রস্তর স্মৃতি

উক্ত সব কমিটীর সংগৃহীতার্থে তাঁহার একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র ও টাউনহলে সংরক্ষিত হইয়াছে।

৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষের মর্ম্মর প্রস্তর স্মৃতিফলক উন্মোচন সময় বঙ্গেশ্বর বলিয়াছিলেন :--

"Your Commissioner, Mr. French, has asked me to unveil the tablet which you have erected to a public spirited man of your town who was a pioneer in the work extending Local Self Government.

The town of Mymensingh owes much to him. I am told that it was largely owing to his initiative that the scheme for water-works which the efforts of the late Maharaja made possible, was carried to a successful conclusion. Unfortunately he was removed by death only a few weeks before the foundation stone was laid.

The career of Babu Chandrakanta Ghosh is one of which his fellow citizens may be proud and one which they would do well to emulate. It gives me great pleasure to be associated with the memorial which I now unveil."

স্থানীয় সংবাদপত্র ও ঢাকার ইষ্ট, ষ্টেইট্‌স্‌ম্যান ও কলিকাতার ইণ্ডিয়ান

৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষ একজন চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ় ছিল। তিনি সত্যপ্রিয় বদান্য ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। চন্দ্রকান্ত মিষ্টভাষী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার বাল্যসুহৃদ ও সমপাঠীদের প্রতি প্রীতি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

চন্দ্রকান্তের মনুষ্যত্ব।

৺ চন্দ্রকান্ত মৃত্যু সময়ে চারি পুত্র ও ছয় কন্যা ও বিধবা পত্নী বর্ত্তমান রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **শ্রীযুক্ত রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর** বি, এল ময়মনসিংহে ওকালতী করিতেছেন। অন্যান্য পুত্রগণও গবর্ণমেণ্টের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

জন্ম—১২৭২ সন ২৩শে ভাদ্র। ৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৮৫ সনে ময়মনসিংহ ইনিষ্টিটিউসন হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা এলএ, বিএ ও বিএল পাশ করিয়া ১৮৯৭ সনে শিক্ষা সমাপন করেন।—পাঠ্যাবস্থায় ১৮৯১ সনে পিতৃ বিয়োগ হয়। সংসারের ভার নিজ স্কন্ধে ন্যস্ত হইলেও অধ্যবসায়গুণে পাঠ ত্যাগ করেন নাই ও নানারূপ সাংসারিক অসুবিধা মধ্যে ও পাঠ সমাপন করিয়া ময়মনসিংহে—পিতার কর্ম্মস্থলে ১৮৯৭ সনে জজকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি ৺ পিতার চরিত্রের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেবল মাত্র দেওয়ানী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ব্যবসায়ের সীমা নিবদ্ধ করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহার ব্যবসায়ে প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়। পিতার ন্যায় ওকালতী ব্যবসায়ে তাহার সাধুতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বত্র জ্ঞাত। অর্থোপার্জ্জন জন্য তিনি কখনও ব্যবসায়ে নীচতা অবলম্বন করেন নাই।

কর্ম্মজীবন—ওকালতী আরম্ভ করিবার ২।৩ বৎসর পরই তিনি ময়মনসিংহে স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত হইয়া পড়েন। রায় বাহাদুর প্রথম জীবনে ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শারীরিক পরিশ্রম ও জনহিতকর কার্য্যে বহু সময় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ১৮৯৯ সনে প্রথম মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হন ও এপর্য্যন্ত তৎপদে অবস্থিত আছেন। ১৯০৩ সনে তিনি ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটীর

মিউনিসিপাল চ্যায়ারম্যান মনোনীত হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরকাল দক্ষতার ও সুখ্যাতির সহিত চ্যায়ারমানী কার্য্য করিয়া ১৯১৫ সনের শেষভাগে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন।—চ্যায়ারম্যান স্বরূপে ময়মনসিংহের টাউনের বহু উন্নতি সাধন করেন। তাহার কার্য্যদক্ষতা, ও সুনাম বাঙ্গালায় সুপরিচিত। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ এক বাক্যে তাহার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনকার্য্যে একাগ্রতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯১১ সনে দিল্লীর দরবারে রাজ-অতিথিস্বরূপ নিমন্ত্রণ তাহারই ফল। তিনি রাজব্যয়ে অতিথিরূপে দিল্লীদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মান রায়বাহাদুর ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে আর একটী মিউনিসিপালিটীর চ্যায়ারম্যানকে মাত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল। দিল্লীতে দরবার মেডেল প্রাপ্ত হন এবং সেই উপলক্ষে মিউনিসিপাল কার্য্যদক্ষতা গুণে ময়মনসিংহ জলের কলের বিস্তৃতি ও উন্নতিসাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট এক Certificate of Honour প্রদান করেন।—মিউনিসিপাল চ্যায়ারম্যানস্বরূপে তিনি অতি সুন্দর একটী মিউনিসিপাল আফিস বিল্ডিং প্রস্তুত করেন।—১৯১২ সনে ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কলের বিস্তারিত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।—১৯১২-১৫ সনে তিনি বহু যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটীর জন্য একটী ড্রেইনেজ স্কীম ও জলের কলের আরও বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্য—ওয়াটার ওয়ার্কস্ ইম্প্রুভমেণ্ট স্কীম প্রস্তুত করেন।

তাঁহার মিউনিসিপাল কার্য্যে এত সুদীর্ঘকাল পরিশ্রম, একাগ্রতা, কার্য্যদক্ষতা ও স্বার্থত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্ট—১৯১৬ সনে জুন মাসে মাননীয় সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের জন্ম দিন উৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।—ময়মনসিংহের মিউনিসিপাল চ্যায়ারম্যানগণ মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মিউনিসিপালিটীর কার্য্য ব্যতীত রায় বাহাদুর ময়মনসিংহের বহু জনহিতকর কার্য্যে সংসৃষ্ট রহিয়াছেন ও ছিলেন। তিনি ১৯১০ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির একজন সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। তিনি "সূর্য্যকান্ত মেমোরিয়াল" কমিটীর সম্পাদক ও করোনেসন দরবার কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। ইম্পিরিয়াল ডারতযুদ্ধ সাহায্যভাণ্ডারের সম্পাদকত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল।

সাহায্য করিয়াছেন। কাশীকিশোর টেক্‌নিকাল স্কুলকমিটীর একজন সভ্য ছিলেন। ময়মনসিংহে নূতন হাসপাতালের স্কীমের একজন আদি প্রস্তাবক ও উদ্যোক্তা। ডিষ্ট্রীক্ট শাসন বিভাগ সম্বন্ধে তিনি কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন সম্বন্ধে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন।—ভূতপূর্ব্ব ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির একজন উদ্যোগী সভ্য। বঙ্গীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ময়মনসিংহ পরিদর্শন সময়ে তাহার অভ্যর্থনা কমিটীর—১৯১২।১৩ সনে সম্পাদকতা করিয়াছেন।

মিউনিসিপাল আইন কার্য্যে তাহার অভিজ্ঞতা অপরিসীম। তিনি 'Genesis & History of the Mymensingh Drainage Scheme এবং 'Mymensingh water supply' নামীয় দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে স্বায়ত্ব-শাসনের কর্ত্তৃপক্ষ দিগের জ্ঞাতব্য—বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। এই সকল টেক্‌নিকেল বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়। তিনি ২১ বৎসরকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ মিউনিসিপাল কার্য্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। ময়মনসিংহে স্বায়ত্ব-শাসন তাহার কার্য্যকালে অতিশয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের জন্য নিজ স্বার্থত্যাগ করিয়া এরূপ খাটিতে অল্প লোকই দেখা যায়।

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—গুহপাড়ার স্বর্গীয় জয়চন্দ্র গুহ ও কালীকিশোর গুহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়চন্দ্র গুহ বড় সুলক্ষণাক্রান্ত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ কালেক্টরীর ও তৎপর দেওয়ানীআদালতের সেরেস্তাদার হন। তৎপর ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর, ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালবাগের সবডিভিসনেল ম্যাজিষ্ট্রেট হন। লালবাগের ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালীন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁহাকে দেওয়ানের কার্য্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু কতকদিন কার্য্য করিয়াই ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স তখন ৪৫।৪৬ বৎসর ছিল। তিনি একজন সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। তত্ত্ব ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায়ই শিকারোপলক্ষে তাহার

বাসাতে আসিয়া একত্র শিকারে বাহির হইতেন। বহু লোককে নিজ বাসাতে রাখিয়া চাকুরী দিয়া গিয়াছেন। কাহারও হীনাবস্থা জানিলেই তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিতেন। তিনি ময়মনসিংহে খুব প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। তাঁহার বাসাতে অনেক লোককেই স্থান দিয়াছিলেন। তিনি অমায়িক, সচ্চরিত্র ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন।

সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ লালমোহন ঘোষ ৺জয়চন্দ্রগুহের দ্বিতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রবাবু যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ৺কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের উপর সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। ৺কালীকিশোর বাবু ময়মনসিংহে সবজজের নাজির ছিলেন, ভ্রাতার মৃত্যুর পর কার্য্যত্যাগ করিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসেন। জয়চন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র বসন্তকুমার তখন মাত্র চারি বৎসরের বালক ছিলেন। কালীকিশোর বাবু তাঁহাকে কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহে পিতৃহীন বালক পিতৃস্নেহের অভাব উপলব্ধি করেন নাই। বসন্তবাবু উত্তরকালে সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় হইয়া বিক্রমপুরের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কালীকিশোর বাবু তাঁহার মাতার 'দানসাগর' শ্রাদ্ধে বহু অর্থব্যয় করেন। দশদিন পর্য্যন্ত বহুলোককে নানাবিধ সামগ্রী দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। বিক্রমপুর, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সংস্কৃতকলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি মহাশয়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কালীকিশোর বাবু দেশমধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সতত যত্নবান্ ছিলেন। গ্রামস্থ উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়টি যাহাতে দিন দিন উন্নত হয়, ছাত্রগণের শিক্ষা

ভাল হয় এবং শিক্ষকগণের কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পুণ্যকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল।



স্বর্গীয় কালীকিশোর গুহ।

পরোপকার করা তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। বজ্রযোগিনী গ্রামের রাস্তা ঘাট, পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় গৃহের উন্নতির মূলে তাঁহার যথেষ্ট যত্ন ছিল, এবং কোন কোন বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ৭২ বৎসর বয়সে কালীকিশোর বাবু ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তবাবু এবং নিজ উপযুক্ত পুত্র ও কন্যাগণের হস্তে সংসারের সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

কালীকিশোর বাবুর পুত্রেরাও সকলেই কৃতি—**রায় রমেশচন্দ্র গুহ বাহাদুরের** নাম বিক্রমপুরবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। ইনি দেশে থাকিয়া গ্রামের উন্নতিকল্পে সতত যত্নবান্। নিজ গ্রামের রাস্তাঘাট, খাল, পুষ্করিণী ইত্যাদির সংস্কার তাহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। রমেশবাবু নিজ কার্য্যকুশলতার জন্য সরকার হইতে 'অনার সার্টিফিকেট' ও 'দরবার মেডেল' পাইয়াছেন। ইনি বজ্রযোগিনী ইউনিয়ান কমিটির প্রেসিডেণ্ট। বিনয়ী, মিষ্টালাপী ও অত্যন্ত অতিথিবৎসল ব্যক্তি। ইঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ উকীল, মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—ও একজন ঢাকার বিখ্যাত 'হেনা' প্রেসের স্বত্বাধিকারি।

শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের দেশে কর্ম্মী লোকের একান্ত অভাব। দেশে শ্রম-শিল্প ও কলকারখানা স্থাপনের উদ্যোক্তা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীর একজন কর্ম্মী পুরুষ। আমরা এখানে হরকান্ত বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম। ইনি—৺রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। স্বনামধন্য পণ্ডিত ৺প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। হরকান্ত ঢাকা ওভার-সিয়ারি স্কুল হইতে পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রথম জীবনে নারায়ণগঞ্জের এম

ডেভিড কোম্পানীর আফিসে সামান্য বেতনে ওভারসিয়ারি চাকরী গ্রহণ করেন। কোম্পানীর পাটের গাইট্ ও লঞ্চ প্রভৃতি সারাই করিবার জন্য একটী লোহার কারখানা আছে। উহাতে বহুলোক খাটীয়া তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জন করিতেছে। ইহা দেখিয়া হরকান্তের মনেও নূতন আশা জাগিল। তিনি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অথচ হাতে অধিক মূলধন নাই। প্রাণের দৃঢ়তা লইয়া তিন বৎসর চাকরি করিয়াই কার্য্যে ইস্তাফা দিলেন এবং কণ্ট্রাক্টরির কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ইংরেজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১০।১২ জন সাধারণ কারিকর লইয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র লৌহকারখানার সৃষ্টি করিলেন। অবিরত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিবার ফলে—ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন। ক্রমে বর্ত্তমান লৌহকারখানার (The Narayanganj Iron works) সৃষ্টির সূত্রপাত হইল।

এখন দুইখানা ইঞ্জিনে তাহার লৌহকারখানা পরিচালিত হইতেছে। এখানে লোহার সিন্দুক, আলমারি, রেলিং, মণ, সের এবং যাবতীয় এমারতের, ষ্টীমলঞ্চ ইঞ্জিন ও মেশিন প্রভৃতির আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি রাশি রাশি প্রস্তুত হইতেছে। এই কারখানায় খাটিয়া প্রায় শতাধিক লোক তাহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। হরকান্তবাবু নিজের জীবন নিজে গঠিত করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান বয়স ৪৭ বৎসর। কিন্তু এখনও ইহার কর্ম্মে ক্লান্তি নাই। নিত্য নূতন নূতন ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত। ইং ১৯০২ সনে নারায়ণগঞ্জ শীতললক্ষ্যায় এক পাটের আরতদারি কারবার স্থাপন করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্প দ্রব্য যাহাতে ভারতে প্রস্তুত হয় তজ্জন্য ইহার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল। সম্প্রতি একটী বোতাম প্রস্তুতের কল চালাইতেছেন।

মহিষের শিং, নারিকেলের মালা, ঝিনুক প্রভৃতি দ্বারা রাশি রাশি বোতাম প্রস্তুত করাইতেছেন।

বিদেশ হইতে প্রেরিত টিনের দ্বারা আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বাসগৃহ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। কিসে দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর হয় স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করে ও জীবনীশক্তির স্ফূর্ত্তি পায় সেদিকে হরকান্ত বাবুর প্রখর দৃষ্টি। তিনি সম্প্রতি ঢাকার সন্নিহিত বুড়ীগঙ্গাতীরে পানগাঁও নামক স্থানে একটী বিস্তৃত টালির কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন "The Dacca Tile works." এই টালি যাহাতে সুলভ মূল্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া দেশবাসীর গৃহ নির্ম্মাণকার্য্যে সহায়তা করে সেজন্য তিনি বিশেষরূপে চেষ্টিত। আরও



শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কতকগুলি শিল্পের উন্নতিমূলক কার্য্যের পরিকল্পনায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জে তাঁহার কারখানা বাড়ী (Factory House) দেখিলে আনন্দ হয়। আমাদের দেশে এইরূপ কর্ম্মী ও দেশ-প্রাণব্যক্তির যতবেশী উদ্ভব হয় ততই মঙ্গল।

এতদ্ব্যতীত ধনবান্ বা সঙ্গতিশালী আরও অনেকে আছেন এখানে সে সকল পরিবারের নাম উল্লেখ করিলাম। ৺বৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার, আটপাড়ার আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুপাড়ার ডাক্তার দ্বারকানাথ, সোমপাড়ার ৺কালীকিশোর সোমের পরিবার, সুখবাসপুরের কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় সবজজ, নাহাপাড়ার জি, ঘোষ (গোবিন্দনাথ ঘোষ) ইত্যাদি অনেকের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের দ্বারা গ্রামের কল্যাণজনক বিশেষ কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ উকীল স্বদেশ-প্রাণ **শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম বি, এল** মহোদয়—এই গ্রামের সোমপাড়ার অধিবাসী। ইনি স্বাধীনচেতা, সমাজ-সংস্কারক ও নিঃস্বার্থভাবে দেশহিতজনক কার্য্যে সতত ব্রতী থাকেন। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠায় ইনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সূর্য্যবাবু নির্ভীক ও সত্যবাদী—কোনরূপ ভান বা কৃত্রিমতার বিরোধী। যাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয় সে বিষয়ে তিনি সতত তৎপর। দেশের নেতা হইতে হইলে যেরূপ স্বার্থত্যাগ, বিচক্ষণতা ও সর্ব্ববিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন ইহা তাঁহার আছে। ইনি ময়মনসিংহের একজন প্রধান ব্যবহারজীবী।

সাধারণ বিবরণ—এই গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চ-শিক্ষিতের সংখ্যা নেহাৎকম নহে, অনেকেই বিদেশবাসী কাজেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করা গেল না। বারুজীবীদের মধ্যে আজ কাল

উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ঢাকার খ্যাতনামা উকীল ও বক্তা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বি, এল মহোদয় এই বংশোদ্ভব ও এগ্রামের অধিবাসী। গুহপাড়ার গুহ বংশের দুইজন বিলাত প্রত্যাগত, তন্মধ্যে একজন এন্ সি, গুহ (নরেন্দ্রচন্দ্র গুহ) আমেরিকার এম্, ডি, উপাধিধারী ঢাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, ও অপর জন গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত হইতে বয়ন-শিল্পে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীরামপুর গভর্ণমেণ্ট উইভিং কলেজের ভাইস্‌প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আরও জনকয়েক এখনও আমেরিকা ও ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য অবস্থান করিতেছেন।

দেবমন্দির—এই গ্রামে কয়েকটি শিবমন্দির ও ৺কালীমন্দির স্থাপিত আছে; ইহাতে নিত্যনৈমিত্তিক পূজা হইয়া থাকে। 'পুকুরপাড়' নামক স্থানে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে উহার নিকটেই একটী প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে ৺বৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় পাঁতিশিয়ালদিগকে আহ্বান করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন দিতেন। তাঁহার বংশে অদ্যাপি সে ভোগ চলিয়া আসিতেছে। এই ভোগের নাম "শিবাভোগ।" প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভোগের নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিবাগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুবাসপুর পল্লীতে ৺নিমচাঁদ ঘোষের বাড়ীতে "মনসার ঘট" স্থাপিত আছে। পূর্ব্বে পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বহু লোক সমাগম হইত। এখনও রীতিমত মনসা পূজা চলিয়া আসিতেছে।

বাজার পোষ্টাফিস—এ গ্রামে প্রত্যহ বাজার মিলে, বাজারে তরি, তরকারি, মৎস্য ইত্যাদি হইতে প্রয়োজনীয় প্রত্যেক দ্রব্যই পাওয়া যায়।

রাস্তা ঘাট--পূর্ব্বে রাস্তাঘাটের বড়ই অসুবিধা ছিল, এক্ষণে সে অভাব বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। এখনও বহু রাস্তাঘাট ও খালের সংস্কার আবশ্যক।

চিকিৎসা—এতবড় গ্রামে চিকিৎসার অত্যন্ত অভাব। সম্প্রতি একজন পেন্সনপ্রাপ্ত এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন দেশে আসিয়া বাস করায় অনেক উপকার হইয়াছে, নচেৎ সাধারণ চিকিৎসকের দ্বারা এত বড় গ্রামের অভাব অভিযোগ দূর হইতে পারে না। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় হওয়া আবশ্যক। সেদিকে গ্রামবাসীর মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

সাহিত্য ও সাহিত্যসেবি--পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'হেলেনা কাব্য' লিখিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 'হেলেনা কাব্য' ব্যতীত তিনি 'মিত্রপাঠ' 'কবিতা-সার' 'ভারত-মঙ্গল' নামে বহু গ্রন্থ ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বঙ্গচন্দ্র মিত্র, মাতা কালীতারা। ১৩১০ (ইং ১৯০৩ খ্রীঃ অঃ) পৌষ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী ঘোষ—কবি সুরমাসুন্দরীর নাম বঙ্গদেশের স্বল্প সংখ্যক শ্রেষ্ঠা মহিলা কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইনি এ গ্রাম নিবাসী ৺ চন্দ্রকান্ত ঘোষের পুত্রবধূ। ময়মনসিংহের খ্যাতনামা উকীল রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুরের পত্নী। কবিতা লিখিয়া ইনি বিশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। 'সঙ্গিনী' 'রঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থদ্বয় তাঁহার নাম স্মরণীয় রাখিবে। এক সময়ে ইনি নিয়মিতভাবে মাসিক সাহিত্য কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ করিতেন। আমরা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক 'বঙ্গ-জননী' শীর্ষক কেবল একটী মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—ইহা হইতেই পাঠক লেখিকার কবিত্ব-শক্তি, ভাব-সম্পদ ও রসমাধুর্য্যের

আমার জনমভূমি,
অভাগিনী মাগো !
আর ঘুমায়ো না তুমি,
জাগো, স্নেহে জাগো !



শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ।

শত কবি গান গায়, অর্ঘ্য দেয় তব পায়,
আজন্ম দিতেছে ভরি অঞ্জলি অঞ্জলি।
সেই সব স্তব-স্তুতি বিফল সকলি ?

দুঃখিনী জননী, ওগো
বিষণ্ণ-প্রতিমা,
ভাসাবে কি অশ্রুজলে
তোমার মহিমা ?
চারিদিকে শুন সব আনন্দ-উৎসাহ-রব,
তুমি একা বসে আছ, ধূলি বিমলিনা ;
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীনা !
হে আমার জন্মভূমি,
পতিতা, তাপিতা,
মুখে তব অন্ন নাই,
বুকে জ্বলে চিতা !
ঘরে ঘরে, মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকার,
তুমি হাসিতেছ বসি, চির উদাসীনা !
তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা !
তাইত ধিক্কার উঠে
হৃদয় মাঝার,
মা যাহারে ছেড়ে আছে,
মিছে গর্ব্ব তার।
তাই ছিন্ন হীনবল তোমার সন্তানদল,
নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান-অপমান ;
আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ।

এতদ্ব্যতীত 'কৃষি-সম্পদ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ, 'আশীর্ব্বাদ' 'কুলবধূ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় 'মিশর-কুমারী' "প্রেমের তুফান" ইত্যাদি নাট্য গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমূর্ত্তি—এ গ্রামের নানাস্থান হইতে বহু দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

সূর্য্য, বিষ্ণু, বজ্রতারা, অবলোকিতেশ্বর, নটরাজ, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি বহু দেবদেবী মূর্ত্তির নাম করা যাইতে পারে। ইহার কতক ঢাকা মিউজিয়মে, কতক আটপাড়া কালীবাড়ী এবং কতক রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র শুহ মহাশয়ের বাড়ীতে সযত্নে রক্ষিত আছে। *

* বিক্রমপুরের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

গ্রাম্য বিবরণ পঞ্চসার।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর সীমান্ত ভাগ পঞ্চসার গ্রাম। ইহার পশ্চিমে 'রামপাল'—পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অতীতের সাক্ষী দিঘী, পরিখা, রাজপথ প্রভৃতির বিকট দৃশ্য বিক্রমপুরের মালভূমরূপে বিদ্যমান, পূর্ব্বদিকে মুন্সীগঞ্জের সবডিভিসন। পঞ্চসার গ্রামের দিঘী, রাজপথ ও উন্নত ক্ষেত্র সমূহ দেখিলে মনে হয় এই গ্রাম পর্য্যন্ত প্রাচীন রাজধানী বিস্তৃত ছিল, অথবা ইহা উপকণ্ঠ ছিল। পঞ্চসার নামের তাৎপর্য্য উদ্ধার করা এক্ষণে অসম্ভব। বঙ্গে বারভূঁইয়ার সময় হইতে পঞ্চসার খিদিরপুর পরগণার সামিল এবং গ্রামের রায় চৌধুরীবংশ ইহার জমীদার ছিলেন। পঞ্চসার অনেকগুলি খণ্ডগ্রাম বা পল্লীতে বিভক্ত। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৮ সহস্র। এক্ষণে এই বহুবিস্তীর্ণ গ্রাম মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়ানের অন্তর্গত। হিন্দু রাজযুগে এই গ্রামের মধ্য দিয়া যে ৩।৪টা প্রশস্ত পথ ছিল এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায়। একালে লোকেলবোর্ডের কয়েকটা পথ হইয়াছে তাহা জ্যামিতির রেখার ন্যায় বিস্তৃতিহীন দৈর্ঘ্য মাত্র। যান-বাহনাদি গ্রামে কিছুই নাই। বর্ষার তিন মাস কাল মাত্র ঝোরা খাল দিয়া ডিঙ্গি নৌকাতে চলা যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রামে বাঘাই জঙ্গল

তৃণ পর্য্যন্ত বিরল হইয়াছে। গ্রামে বাসগৃহগুলি প্রায় সমস্তই ঢেউটিনের ছাউনি, কয়েকখানি অট্টালিকা আছে। এতকাল ঘরে বায়ু প্রবেশের পথ থাকিত না, এখন লোকে বাসগৃহে বায়ুচলাচলের আবশ্যকতা বুঝিয়াছে। কিন্তু পানীয়জল সম্বন্ধে এখনও লোকের চৈতন্যোদয় হয় নাই। গ্রামে পুষ্করিণীর অভাব নাই, কিন্তু তাহা লোকের সংস্কার ও স্বভাব দোষে প্রায় সমস্তই মল-দূষিত হইয়া আছে। কৃষকগণ উর্ব্বরত্ব বৃদ্ধির জন্য নূতন মাটি দিয়া জমি ভরাট করে, এই কারণে গড় খাই হইয়া গ্রামের সমতল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নয়নতৃপ্তকর দৃশ্যের মধ্যে 'হেম রম্ভাবন' মাত্র দেখা যায়। নানাবিধ অত্যুৎকৃষ্ট কলার চাষ এরূপ আর কোথাও নাই। মূলাগুলিও ঐরাবতের দন্ত হইতে বড় হইয়া থাকে। এ ছাড়া উৎপন্ন ফসলের মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। মুন্সীরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ নিকটবর্ত্তী হওয়ায় গ্রামবাসীর পক্ষে সহরতলীর নানা অভাব অসুবিধা ঘটিয়াছে, উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যাদি সমস্তই সহরে চলিয়া যায়।

পঞ্চসার বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম। বৈষ্ণব গোস্বামী ঠাকুরবল্লভের বহু সন্তান সন্ততি পঞ্চসার ও পার্শ্ববর্ত্তী দেবভোগ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকায় পঞ্চসার শ্রীপাট হইয়াছে। ইঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ববঙ্গের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেতর জাতি ইঁহাদিগের শিষ্য। চৈতন্যচন্দ্রের অলোকসামান্য মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে নবদ্বীপ সন্নিহিত অল্প স্থানেই অদ্যও প্রেম-ভক্তির প্রভাব জীবন্ত অবস্থায় দেখা যায়, তদ্ভিন্ন শাক্তবঙ্গে ভদ্রাবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে পঞ্চসার ছাড়া আর কোথাও চৈতন্য প্রবর্ত্তিত পন্থার লোকমণ্ডলী দেখা যায় না। পূর্ব্বতন জমিদার রায় মহাশয়েরাও কৃষ্ণভক্ত এখন সঙ্গতিহীন নির্ধন অবস্থায় আছেন। গ্রামে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদাশালী অনেক পরিবার ছাড়া শ্রোত্রিয় বংশজ বহু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস, সৎকুলোৎপন্ন কায়স্থের সংখ্যা অল্প বৈদ্য একেবারেই নাই। গ্রামে গন্ধবণিক,

সাহা, তাঁতী, তাম্বুলী বারুই প্রভৃতি নানা জাতি লোকের বাস। মোসলমান সংখ্যাও কম নহে। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাটলীগ্রাম হইতে আগত চট্টরাজ বংশ নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় ব্রজকিশোর চট্টরাজ পৈতৃক শাক্তমত ছাড়িয়া গোস্বামী মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতিথি-পূজন ও অতিথি সৎকার তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। ব্রহ্মপুত্রে স্নান উপলক্ষে বিক্রমপুর এবং দূরবর্ত্তী নানা দেশের লোক অশোকাষ্টমী তিথির ২।৩ দিন পূর্ব্বে যোগিনীঘাটে সমবেত হইত। তখন মুন্সীরগঞ্জে লক্ষ্মীনারায়ণের আখড়ার নিম্নেই যোগিনীঘাট এবং লাঙ্গলবন্ধ যাইবার খেয়াঘাট ছিল। যাত্রিগণ ঘাটের অনতিদূরে পঞ্চসার চট্টরাজ বাড়ীতে সুযুগ প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরে তীর্থস্থানে যাত্রা করিত, কেহ বা যোগিনী-ঘাটেই স্নানাবগাহন করিয়া রামনবমীর জন্য চট্টরাজ বাড়ীতে কালক্ষেপণ করিত। যাত্রীগণ ফিরিয়া যাইবার সময়ও ব্রজকিশোর চট্টরাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যাইত। প্রতি বৎসর এই উপলক্ষে প্রায় ১ সপ্তাহকাল তিন হইতে ছয় সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া চট্টরাজ বাড়ীতে মহা মহোৎসব চলিত। কেহ সরকারে কেহ বা স্বপাকে খাইত। ব্রজকিশোর সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও অতিথি সৎকাররূপ সদাব্রত পালন করিতেন। কালসহকারে গতায়াতের সুবিধা হইয়া ক্রমেই অতিথি সংখ্যা কমিতে থাকে। এতকাল গ্রামে অতিথি উপস্থিত হইলেই লোকে বলিত 'চট্টরাজ বাড়ীতে যাও'। এই সদাব্রত ১২৮৩ সালে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের বিপ্লবে ঈশ্বরচন্দ্র চট্টরাজের তিরোভাব হইতে একরূপ উঠিয়া যায়। বহর হইতে মুন্সেফি আদালত মুন্সীরগঞ্জে উঠিয়া আসিলে সাক্ষী-অতিথির উপদ্রব অন্যতর কারণ।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের আমলে এই গ্রামের **ঈশ্বরচন্দ্র চট্টরাজ** কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন এবং জুনিয়ার ও

পূর্ব্ববঙ্গে বোধহয় আর কেহই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। ধর্ম্মভীরু ঈশ্বরচন্দ্র উৎকোচ গ্রহণ মহাপাপ মনে করিতেন, সেইজন্য তাঁহার যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি ছিল। চট্টগ্রামের নিমক-মহালে নিম্নপদে চাকরি করিয়া মুন্সী উপাধিধারী বিক্রমপুরের কোন কোন ব্যক্তি বিস্তর বিভব রাখিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বর৹চন্দ্র পুণ্যমাত্র সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সেই কালে গ্রামে জমিদারী-মহাজনী শিক্ষা এবং থোস্ক হাতের লেখাই যথেষ্ট শিক্ষা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর গ্রামের মদনমোহন ও প্রভাতচন্দ্র চট্টরাজ সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হন, প্রভাতচন্দ্র পরিশেষে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করিয়াছিলেন। গ্রামে পরে পরে বিস্তর প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য লোক প্রকাশ পাইতে থাকেন, এমন কি, কৃষক সন্তানদিগের মধ্যেও কেহ কেহ উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন। তবে কিনা উচ্চশিক্ষায় একালে আর তেমন ফল ফলে না। চরিত কথায় প্রাচীন কালের যে উচ্চ আদর্শ দেখা যায়, একালে আর তাহা নাই। সেকালে নিষ্কাম উদার চরিত্র মহানুভব লোকের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কি শিক্ষার চরমে ত্যাগ বৈরাগ্য পরসেবায় আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, একালে নিরীশ্বর শিক্ষায় নিজ সেবায় আত্মোৎসর্গই চরম লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে, জনসাধারণে তাহারই গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই হিসাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে **বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী** ও **শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র রুরকি কলেজের এঞ্জিনিয়ার হইয়া কাশী প্রভৃতি স্থানে সহস্রাধিক টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন এবং রায়বাহাদুর খ্যাতিলাভ করেন। শশিভূষণ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য প্রচারে ব্রতী আছেন। চট্টরাজ বংশের **পূর্ণানন্দ চাটার্জ্জি** বিলাতে যাইয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং

পরে রাজানুগ্রহে রায় বাহাদুরী খেলাত পাইয়া এক্ষণে রাজসাহী বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টার পদে আছেন। পদোন্নতির সঙ্গে ইঁহাদের প্রবাসেই নিবাস হইয়াছে। এই নিয়মে গ্রাম পরিচয়ে মহালনবিশ বংশের সুবোধ ও প্রশান্ত মহালানবিশ ইংলণ্ডে যাইয়া গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে আছেন। ব্যবহারজীবীদিগের মধ্যে উকিল উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টরাজ এবং মোক্তার অবনিমোহন চৌধুরী স্বস্থানে থাকিয়া নানাভাবে গ্রামের উন্নতি সাধন করিতেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, এক্ষণে সামরিক বিভাগে আই, এম, এস, হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দিগের মধ্যে বৈষ্ণব মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বহু যত্নে টোল রক্ষা করিয়া ছাত্রশিক্ষা দিতেছিলেন, এক্ষণে অসাধ্যসাধন বলিয়া চৌপাঠী তুলিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রমোহন মহলানবিশ ভাগবতাদির কথকতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়িকদিগের মধ্যে পঞ্চসারের গন্ধবণিকগণ এক সময়ে যথেষ্ট ধনবান হন, এখন সে লক্ষ্মীশ্রী আর নাই। সাহাসম্প্রদায় গ্রামের প্রান্তভাগে বসবাস করেন। ইহাদিগের মধ্যে তিলক পোদ্দার শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে কারবার করিয়া ধনকুবের হন, এখন তাহার সন্তানেরা লুপ্তগৌরব রক্ষা করিয়া আছেন। নারীজাতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য চট্টরাজ-দুহিতা **শ্রীমতী সুনীতিদেবী** ইংরাজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা পাইয়া ঢাকা নগরীতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। পঞ্চসার গ্রামের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে **স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ** মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত বিধবা-বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বিধবা বিবাহ ও একেশ্বরবাদ প্রচারের সহায়তা করেন।

গ্রাম্য বিবরণ-কোঁয়রপুর।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোঁয়রপুর একটী বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ইহার অধিকাংশ পদ্মানদী গ্রাস করিয়াছে। ইহাতে ইহার অনেক অধিবাসী গরিব হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে নূতন বাড়ী করিতে পারেন নাই। চাকরী উপলক্ষে অনেকে বিদেশে বাস করেন। কেহ কেহ কিছু সরিয়া বাড়ী করিয়াছেন। গ্রামটীর কয়েকটী পাড়া মাত্র বিদ্যমান আছে। এক একটী পাড়া এক একটী ক্ষুদ্রগ্রাম সদৃশ ছিল। কিন্তু নদী ও কালের গতি প্রায় সকলই বিধ্বস্ত করিয়াছে। গ্রামের আর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি নাই। যাহা কিছু আছে, তাহাও শ্মশানসদৃশ হইয়া আছে। কারণ বর্ত্তমান অংশের লোকেরা ও প্রায়ই বাড়ীঘরে থাকেন না।

এই গ্রামে অনেকগুলি পাড়া ছিল। ভট্টাচার্য্যপাড়া, সেনপাড়া, রায় পাড়া, সরকারপাড়া, গুপ্তপাড়া, মুন্সীপাড়া, এবং কয়েকটী মুসলমানপাড়াতে এই গ্রাম বিভক্ত ছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাঠ ছিল, ইহাতেই পাড়াগুলি এক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় বোধ হইত। ইহার পশ্চিম ভাগে পুরাতন পদ্মা নদীর খাত এখনও কতকটা আছে। ঐ খাত খালে পরিণত হইয়াছিল। পালংএর নীচে যেখাল দৃষ্ট হয়, উহাই ঐখালের নিম্নভাগ। যে ভীষণা পদ্মানদী এখন বিক্রমপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে, উহা পূর্ব্বকালে একটী ছোট খাল ছিল। যাহারা রেণেলের ঢাকার ম্যাপ দেখিয়াছেন, তাহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন। দক্ষিণ বিক্রমপুর কে পদ্মানদী ভাগ করিলে ও অনেক দিন উহা ঢাকা জিলার অন্তর্গতই ছিল। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল উহা ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে।

গুপ্তপাড়া মুন্সীপাড়া ও কয়েকটী মুসলমান পাড়া ব্যতীত গ্রামের সকল পাড়াই এখন পদ্মা গর্ভে, অথবা পদ্মার চরে অবস্থিত। রায়পাড়া

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। গ্রামের অধিকাংশ বৈদ্য তালুকদার রায়পাড়াতে ছিলেন। কোঁয়রপুরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, এবং অপরাপর অনেক জাতি ছিল। এতদ্ব্যতীত মুসলমানের সংখ্যা ও কম ছিল না। রায়পাড়ার তালুকদারগণের মধ্যে ৺দুর্গামোহন রায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় বি, এ, ৺গিরিশচন্দ্র রায়, ৺শশিভূষণ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন রায় ঢাকাতে মোক্তার। এক সময়ে তাঁহার বাসায় থাকিয়া তাঁহার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব লেখাপড়া শিখিত। তিনি অনেককে অন্নদান করিতেন। **৺গিরিশচন্দ্র রায়** কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের ইণ্টারপ্রিটার ছিলেন। তাহার কলিকাতার বাসাতে থাকিয়া অনেকে লেখাপড়া শিখিত। তিনি তাঁহার তালুকদারীর সমস্ত আয় একটী **দাতব্য চিকিৎসালয়** স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ উইল করিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসালয়টীতে অনেক গরিব লোক বিনাব্যয়ে ঔষধ প্রাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়, বি, এ, এখন কুমিল্লা ভূকৈলাস কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার। তিনিও অনেক গরিব ছাত্রকে অন্নদান করেন। তিনি এক সময়ে ৺বরদাকান্ত সেন ও ৺তারকেশ্বর দাসের সহযোগে কোঁয়রপুরে একটী "হিতসাধিনী সভা" সংস্থাপন করিয়া গ্রামের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন সরকারপাড়ার **৺বৈকুণ্ঠনাথ দাস এম, এ, বি, এল**। বৈকুণ্ঠ বাবু হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল এবং একজন মহা পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে কোঁয়রপুর গৌরবান্বিত ছিল। "হিতসাধিনীর" প্রথম সম্পাদক ছিলেন ৺বরদাকান্ত সেন। ইনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। ইহার প্রণীত উপন্যাস "হেমপ্রভা" "অতুলচন্দ্র" এবং "আমারগান ও কবিতা" পদ্যগ্রন্থ বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এখানে "হিতসাধনী সভার" আরও কয়েকজন সভ্যের নাম উল্লেখ করা গেল। একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাসগুপ্ত। ইনি মাদারীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল। অপর জন ছিলেন ৺অনুকূলচন্দ্র রায়। ইহাকে বড় অনুকূল এবং উপরি উক্ত অনুকূলকে ছোট অনুকূল বলা হইত। বড় অনুকূল বাবু ডেপুটী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ হইয়াছিলেন। ইনিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। গ্রামের উন্নতিকল্পে ইহারা অনেক খাটিতেন। গ্রামে ডাকঘর, রাস্তাঘাট, এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় "হিতসাধিনী সভার" যত্নেই হইয়াছিল। "হিতসাধিনী সভার" সংস্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় এখন আর নাই। গিরিশবাবুর সংস্থাপিত দাতব্যচিকিৎসালয়ই চলিতেছে। গুপ্তপাড়া এখন ও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহার শ্রী নাই। ঐ পাড়ার অধিবাসী ৺রায়সাহেব রত্নমণি গুপ্ত একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল তাঁহার সময় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। ক্রমাগত আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সময়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। তিনি গ্রামে একটী পাঠশালা সংস্থাপনের জন্য একহাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকাতে রামমোহন লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণার্থ তিনি ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। রামমোহন লাইব্রেরী তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। গুপ্তপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন ৺নবকুমার গুপ্ত। সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষতঃ পাণিনি ব্যাকরণে তাঁহার অগাধ বিদ্যা ছিল। তিনি আরবী ও পার্শী ভাষাতে ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। চরিত্রবলে তিনি বিশেষ বলীয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, বিশেষ শিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। পিতৃ-স্মৃতি রক্ষার্থ ইহারা বহু অর্থ ব্যয়ে ঢাকাতে

"নবকুমার ইন্‌ষ্টিটিউসন" নাম এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন।

এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৺করুণাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথম ব্যক্তি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। ইহাদের টোল ছিল এবং তথায় অনেক ছাত্র দর্শন ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত। ৺চন্দ্রকুমার সেন ঢাকার জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি অনেক গরিব ছাত্রকে আহার দিতেন। ৺শশীভূষণ রায় রাজসাহী জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন।

এই গ্রামের অনেকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাশ চট্টগ্রামে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট ও কোর্টঅব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার ছিলেন। গভর্ণমেণ্টে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় এল, এম, এস, সুখ্যাতির সহিত গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়া এখন ঢাকাতেই আছেন। ইনি একসময়ে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এবং চিকিৎসাতে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। ৺দুর্গামোহন রায় ইংরাজী ভাষাতে সুবিজ্ঞ ছিলেন এবং ত্রিপুরা মহারাজার একজন ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়া এখন ঢাকাতে অবস্থিতি করিতেছেন।

এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত কবিরাজ ছিলেন। ৺রামরাজা দাস কবিরাজ একজন দেশবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। অনেক রোগী চিকিৎসিত হইবার জন্য বিদেশ হইতে তাঁহার নিকট আসিত। তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বর দাস মহাশয়ও গ্রামে চিকিৎসাতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র

শাস্ত্রী ভাক্তার একজন বিশেষ শিক্ষিত কবিরাজ ও সাহিত্যিক। তাঁহার অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ অনেক মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি "তোষিণী" পত্রিকার সম্পাদক এবং নবকুমার ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। ৺রামরাজা কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদারবাড়ীর কবিরাজ ছিলেন। ইনি এখন কাশীবাসী। পদ্মানদীর আক্রমণে কোঁয়রপুরের পূর্ব্ব গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। গ্রামটী সম্পূর্ণ থাকিলে বিক্রমপুরের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত। এই গ্রামে অনেক সুশিক্ষিত গ্রাজুয়েট আছেন। কিন্তু ইহারা অধিকাংশই এখন বিদেশবাসী হইয়াছেন। নদীর আক্রমণে গ্রাম হতশ্রী হইয়াছে। অনেক তালুকদার নদীর আক্রমণে, কেহ কেহ বা ঋণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।

গ্রাম্য বিবরণ খিলগাঁও।

এই গ্রামটির উত্তরে কুসুমপুর ও শুজানগর, পূর্ব্বে পশ্চিমপাড়া, পশ্চিমে পানিয়া, উত্তর গাঁও ও ব্রাহ্মণখোলা এবং দক্ষিণে ভবানীপুর ও নওপাড়া অবস্থিত। এই গ্রামটি খুব বড় ও নহে, আবার একেবারে ক্ষুদ্র ও নহে। পূর্ব্বে ইহা শ্রীনগর থানার অধীন ছিল, এখন ইহা সেরাজদিখাঁ থানার অধীন। অধিবাসীর সংখ্যা কম পক্ষে ও দুই হাজার হইবে।

এই গ্রামের মিঞাগণ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত তালুকদার। তিন শত বৎসরের ও উর্দ্ধকাল হইতে তাঁহারা এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই সুদীর্ঘ কাল যাবত ইঁহারাই এই গ্রামের ভূস্বামী। খিলগাঁও ব্যতীত, ভবানীপুর, নওপাড়া, শুজানগর, তারাটিয়া, বারৈগাঁও, শ্রীনগর, বেজগাঁও ও ষোলঘরে ও ইঁহাদে তালুক সম্পত্তি আছে। ইঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান ছিল বয়রাগাদী। এখন ও বয়রাগাদী ও গোবরদিতে তাঁহাদের তালুক

সম্পত্তি আছে। গ্রামের যে অংশে মিঞাগণ বাস করেন, তাহাকে মিঞাপাড়া বলে। খিলগাঁও অনেক বারুই ও মুসলমান তন্তুবায়ের বাসভূমি। ইহা ব্যতীত, কয়েকঘর চাষী মুসলমান, একঘর যুগী, একঘর ধোপা, একঘর নাপিত ও একঘর ভুঁইমালী আছে। ধোপা, নাপিত ও ভুঁইমালী মিঞাদের নান্‌কার ভুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে মিঞাগণ অর্থে হীন হইয়া পড়িয়াছেন, এখন ইঁহার শিক্ষায়ও বিশেষ উন্নত নহেন। এই বংশের দুইটি ছেলে মাত্র মেট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিয়াছে। আর কয়েকটি এখন স্কুলে পড়িতেছে। কিন্তু ইঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া এই বংশেরই দুইটি ভাগিনেয় মৌলবী আব্দুল মান্নান ও মৌলবী আব্দুল নইম এম্, এ, পাশ করিয়াছেন। অপর ভাগিনেয় ভূতপূর্ব্ব 'নবনূর' সম্পাদক মৌলবী সৈয়দ এম্‌দাদ আলী বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকরূপে অনেকেরই নিকট পরিচিত।

খিলগাঁয় বারুইগণ বিশেষ অবস্থাপন্ন। ইহারা পাটের কারবার করিয়া খিলগাঁও গ্রামকে নারায়ণগঞ্জের পাটের সাহেবদের নিকট সুপরিচিত করিয়া দিয়াছে। এখানকার পাট খুব উৎকৃষ্ট হয়। এইজন্য পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের পাট ও খিলগাঁও ময়ালের পাট বলিয়া পরিচিত হয়। খিলগাঁও ময়ালের পাট অন্য স্থানের পাট হইতে বেশী মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

এই গ্রামের জোলাগণ পূর্ব্বে বড় নিঃস্ব ছিল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের পর হইতে ইহাদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। এখন ইহাদিগকে আর জোলা বলা যায় না। ইহারা নিজেদের কারিগর বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদিগকে এই নামেই ডাকা উচিত। যে জাতি যে নাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে সেইরূপ নামে ডাকিয়া ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে। বিহার অঞ্চলে জোলাহাগণ নিজেদের "শেখ মোমিন" বলিয়া থাকে।

তিনশত বৎসরের ও উর্দ্ধকাল মিঞাগণ একচ্ছত্রভাবে এই গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন। অন্য কেহ আসিয়া তাঁহাদের সম্পত্তিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বিগত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বারুই প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ ষোলআনা সম্পত্তির পৌণে দুই আনা অংশ নিঃস্ব মিঞাদের নিকট হইতে কিনিয়া নিয়াছে।

ত্রিংশবর্ষ পূর্ব্বে এই গ্রামের প্রধান পুরুষ ছিলেন মুন্সী নসিরউদ্দীন। তাঁহার মত অতিথিবৎসল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি আজকাল খুব কমই দেখা যায়। তিনি অতিথিকে অভুক্ত রাখিয়া কখন ও আহার করিতেন না। অতিথিকে যাহা খাইতে দিতে পারিতেন, নিজে ও তাহাই খাইতেন। তাঁহার জীবিতকালে এক একদিন ৫০।৬০ জন অতিথি ও আসিয়াছে, কিন্তু তিনি বা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহাতে একটুও বিরক্ত হইতেন না, সর্ব্বদাই হৃষ্টচিত্তে অতিথিসেবা করিতেন। তিনি জমিদারী কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এ বিষয়ে সেই অঞ্চলে তাঁহার মত আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের প্রজার মা-বাপ ছিলেন। তাঁহার হিন্দু-মুসলমান প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত। তিনি ও সর্ব্বদা তাহাদের সুখ দুঃখের খুটিনাটি খবর নিতেন এবং প্রজাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সুখে হর্ষ অনুভব করিতেন। খিলগাঁর প্রজাদের নামে কখনও খাজানার নালিশ হয় নাই। তখন মনিব-প্রজার এমনই সম্পর্ক ছিল। এখন আর সেই ভক্তি নাই, সেই হৃদ্যতা নাই। সম্ভবতঃ মনিবের সহৃদয়তার অভাবই এই সৎ সম্পর্ক হ্রাসের প্রধান কারণ। মুন্সীনসিরউদ্দীন যেমন হৃদয়বান্ ছিলেন, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও ছিলেন। তিনিই নওপাড়ার হাটের স্থাপয়িতা। এই হাট-স্থাপনের ইতিহাস হয়ত পরে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, সেইজন্য ইহা এ স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। নওপাড়ার হাটের পশ্চিমদিকে যে খালি বাড়ী পড়িয়া আছে, উহা পূর্ব্বে হাট ছিল

এবং উহাকে লোকে দক্ষিণ চারিগাঁর হাট বলিত। এখন যেখানে নও-পাড়ার হাট দেখা যায়, উহা তখন ধানের ক্ষেত ছিল। একদিন মুন্সী নসিরউদ্দীন সেই হাটে কোন ও জিনিষ কিনিতে গিয়া নিজকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেন যে, নিজে হাট মিলাইতে না পারিলে আর কখন ও হাটে যাইবেন না। এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নিজ কথা কার্য্যে পরিণত করেন। তিনি এ বিষয়ে পশ্চিমপাড়ার মুখুটি মহাশয়দের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। মুখুটিগণও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত তালুকদার। বরাবরই এই দুই পরিবারে বিশেষ সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছে।

মুন্সী নসিরউদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মুন্সী আয্‌তাবউদ্দীন আহম্মদ সাহেব মুন্সীগঞ্জের স্বনামধন্য মোক্তার ছিলেন। তিনি নিজের ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মীয় প্রতিপালন এবং সহৃদয়তা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতার জন্য ও কম প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন কেহ বলিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার এই দানকার্য্য নীরবে সাধন করিতে অন্যকে জানিতে দিতেন না, এমন কি স্ত্রীকে ও না। তাঁহার দানের জাতিভেদ ছিল না। তাঁহার সময়ে মুন্সীগঞ্জে 'মুন্সীসাহেব' বলিলে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝাইত। তাঁহার স্বধর্ম্মপরায়ণতা, মহৎ চরিত্র এবং ব্যবসায়ের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সকলেরই প্রীতভাজন ছিলেন। তিনি সাহিত্যের একজন নীরব সাধক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। বাঙ্গালাভাষার কোন ভাল বহি বাহির হইলে তিনি অবিলম্বে তাহা কিনিয়া পাঠ করিতেন। তিনি আজীবন নব্যভারত ও সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থ 'সদ্ভাবসরোজ এখন ও অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের

নিকট পড়িয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য সাধনা তাঁহারই পুত্রাধিক স্নেহভাজন ভাগিনেয় মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়াছেন। মুন্সীসাহেব জীবিতকাল পর্য্যন্ত মুন্সীগঞ্জ লোকেলবোর্ডের নির্ব্বাচিত মেম্বর ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কখন ও চেষ্টা করিতে হয় নাই। কাঁঠালতলি হইতে যে সরকটি পশ্চিমপাড়ার মধ্য দিয়া খিলগাঁর দিকে গিয়াছে, ইহা লোকেলবোর্ডের অর্থে তাঁহারই চেষ্টা-যত্নে প্রস্তুত হয়। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল কমিটির, বালিকা-বিদ্যালয়ের, সরকারী ডাক্তারখানার এবং জৈনসার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভ্য ছিলেন। তিনি যে নাম মাত্র সভ্য ছিলেন, তাহা নহে। তিনি মাসে মাসে চাঁদাও দিতেন। বিক্রমপুরের যে কোন প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। মুন্সীগঞ্জ মোক্তার লাইব্রেরীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী এবং মুন্সীগঞ্জ আঞ্জুমনে ইস্‌লামিয়ার ও সেক্রেটারী ছিলেন। বিক্রমপুরের মুসলমানগণের তিনি নেতা ছিলেন। বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অম্লান দেড় বৎসরকাল দুরারোগ্য প্লীহা ও যকৃৎরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছিল।

আর একটি বিষয় বলিলেই এই গ্রামের সব কথা বলা হয়।—এই গ্রামের একাংশ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে শ্রীনগরের বাবুদের সম্পত্তিভুক্ত। 'কেমন করিয়া যে এই অংশটুকু তাঁহাদের হস্তগত হয়, সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। নবাবদের আমলে মিঞাদের এক পূর্ব্বপুরুষ ঢাকাতে রাজস্ব দিয়া নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তিনি ডাকাতদের হাতে পড়েন। ডাকাতরা তাঁহার গলায় কলসী বাঁধিয়া যখন ধলেশ্বরীতে ডুবাইয়া দিতে আয়োজন করিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীনগরের বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ নানা-কীর্ত্তিনারায়ণ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি খিলগাঁর মিঞাকে

উদ্ধার করেন। এই উদ্ধারকর্ত্তার একান্ত অসম্মতি সত্ত্বে ও খিলগাঁর মিঞা তাঁহার রক্ষাকর্ত্তার সহিত একটি প্রীতিজনক সম্পর্কে আজীবন অটুট রাখিবার জন্য খিলগাঁর কতক অংশ তাঁহাকে লিখিয়া দেন। ইহা যে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপই লিখিয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ নাই। এখন ও শ্রীনগরের বাবুগণ সম্পত্তি-সম্পর্কে কোন বিবাদ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হইলে খিলগাঁর মিঞাদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই বিবাদ আপোষে মিটাইয়া ফেলেন। ইহা তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক।



বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাম্য বিবরণ—বিক্রমপুরের গ্রাম্য-বিবরণী আমরা যে প্রণালীতে লিখিবার জন্ত গ্রামবাসিগণকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি, অধিকাংশ স্থলেই তদনুযায়ী লিখিত হইতেছেনা। আমরা এখানে লেখকবর্গের সাহায্যার্থ পল্লীর অবস্থা সম্যক জ্ঞাত হইবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বনে গ্রাম্য-বিবরণী লিখিতে নির্দ্দেশ করিলাম, আশাকরি ভবিষ্যতে গ্রাম্য-বিবরণীর লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সেই পন্থাই অনুসরণ করিবেন।

১। গ্রামের সীমা, পরিমাণ ; নামের ইতিহাস (যদি সংগ্রহযোগ্য হয়) ; খাল, বিল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির বিস্তৃত পরিচয়। পুষ্করিণীগুলির কয়টী, ভাল আর কয়টী সংস্কারোপযোগী ইহার সবিশেষ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

২। জাতি সংখ্যা, কোন্ জাতি কতদিন হইতে গ্রামের অধিবাসী, শ্রেণীভেদ, হ্রাসবৃদ্ধির তারতম্য, কৌলীন্য, উচ্চনীচ, পরস্পরের ব্যবহার, বর্ত্তমান অবস্থা, শিক্ষা, জীবিকা, ধর্ম্মানুরাগ, চরিত্র, সুনীতি ও দুর্নীতি।

৩। শিল্প-বাণিজ্য ;—শিল্পী বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা, দোকানী পশারী, আমদানী রপ্তানী। ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে দেশী ও বিদেশীর পরিমাণ। উৎপন্ন শস্যের রপ্তানী ও বিক্রীর কি ব্যবস্থা করা হয় ? পাট ও ধানের চাষের তারতম্য কিরূপ ? কোন নূতন শস্য প্রচলিত হইয়াছে কিনা ?

৪। ধর্ম্ম—ধর্ম্মের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ, কি প্রণালীতে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় ? মন্ত্রদাতা গুরু গ্রামে আছেন কিনা ? গ্রাম্যদেবালয়ের পরিচয় প্রতিষ্ঠাতার কথা, দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান, তীর্থ যাত্রার আগ্রহ কিরূপ, কোন্ কোন্ তীর্থে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয় ?

৫। শিক্ষা—শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা ? গ্রামে কোনও উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে কিনা ? স্থাপিত থাকিলেও কতদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পরিচয়। গ্রাম্য পুরুষও নর নারীর মধ্যে লেখাপড়া যানা কত জন আছেন।

বালিকা বিদ্যালয়, মক্তব বা পাঠশালা ইত্যাদি আকিলে তাহার বিবরণ।

৬। সমাজ—সমাজিক উৎসব, ব্রত ইত্যাদির বিবরণ।

৭। রাস্তা ঘাট—সংখ্যা, অবস্থা, কাহার কৃত? সংস্কারের প্রণালী। সেতু সাঁকো ইত্যাদি।

৮। স্বাস্থ্য—সাধারণ; ঋতুভেদে কোনরূপ পীড়ার আধিক্য হয় কি না! কোন্ কোন্ পীড়ার আধিক্য হয়? মৃত্যু সংখ্যা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসক সংখ্যা।

৯। জল—পানীয় জলের বিস্তৃত বিবরণ ও উহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। গ্রাম্য সভাসমিতি থাকিলে তাহাদের কার্য্য পরিচয়, উপকারিতা ও অবস্থা লিখিবেন। আমোদ প্রমোদের কথা থাকাও আবশ্যক গ্রামে কোনও পাঠাগার থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিররণী, পুস্তক সংখ্যা, গ্রামবাসী নরনারীর মধ্যে বৎসর কতসংখ্যক পুস্তক পাঠোদ্দেশ্যে চলা ফিরা করিয়াছে। যাহাতে কাহারও প্রতি কোনওরূপ অযথা আক্রমণ, জাতিগত সংকীর্ণতা কিংবা হীনতা সূচক কোনওরূপ ভাষার প্রয়োগ না থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন। আশাকরি দেশের হিতকামী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ গ্রামের বিবরণী লিখিয়া পাঠাইবেন।

যাঁহারা প্রত্যেক খণ্ডের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নাম রেজেষ্টরী করিয়া রাখিবেন। প্রায় দশ খণ্ডে এই বিবরণ শেষ হইবে। যদি কোন গ্রামের দেবমন্দির বা উল্লেখোপযোগী কিছু থাকে তাহা হইলে তাহার ফটোগ্রাফ পাঠাইবেন। এতদ্ব্যতীত কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনীসহ চিত্রমুদ্রিত করিতে হইলে ফটোগ্রাফসহ ব্লক প্রস্তুতের টাকা পাঠাইতে হইবে। নতুবা নিজেরা ব্লক প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারেন।

বিক্রমপুরের বিবরণ ১ম খণ্ড কাপড়ে
বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা মাত্র।
ঐ ২য় খণ্ড „ ২৷৷০ টাকা মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক।
নবাবপুর—এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত পুস্তকাবলী।

১।	বিক্রমপুরের ইতিহাস	...	...	২৷৷৹
২।	কেদার রায় (ঐতিহাসিক গ্রন্থ)	...	...	১৷৷৹
৩।	রূপকথা (সচিত্র শিশু পাঠ্য গল্প গ্রন্থ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত	...	...	১৲
৪।	ধ্রুব (তৃতীয় সংস্করণ)	...	...	।৶৹
৫।	প্রহ্লাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	।৶৹
৬।	অর্জ্জুন ...	...	...	৷৷৹
৭।	হাজি মোহাম্মদ মোহ্‌সেন (দ্বিতীয় সংস্করণ) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ...	...	...	৷৷৹
৮।	কবিতা-মঞ্জরী (পাঠ্য গ্রন্থ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত			।৵৹
৯।	সাহিত্যসুধা	ঐ	...	।৶৹
১০।	সাহিত্য-শিক্ষা (১ম ভাগ)	ঐ	...	।৶৹
১১।	সাহিত্য-শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)	ঐ	...	৷৷৶৹
১২।	Poems of Childhood	ঐ	...	।৵৹
১৩।	কল্প-কথা (গল্পের বই)	...	...	৷৷৹
১৪।	ভীমসেন ...	...	...	৷৷৹
১৫।	আনার কলি (গীতি-নাট্য)	...	...	৷৷৹
১৬।	পরশমণি (উপন্যাস-যন্ত্রস্থ)	...	...	১৷৷৹
১৭।	বিক্রমপুরের বিবরণ (১ম খণ্ড ঐ)		...	৩৲
১৮।	হরিদাস ঠাকুর (নাটক) (যন্ত্রস্থ) ...		...	১৲
১৯।	হাসির লহর (শিশুপাঠ্য ছবির বহি)		...	।৶৹
২০।	সাবিত্রী		...	।৹
২১।	হরিশ্চন্দ্র		...	৷৷৹
২২।	শুভ-বিবাহ ...	”	...	১৲
২৩।	তস্‌বীর ও ছোট গল্প (১ম সংস্করণ)		...	৷৷৹
২৪।	বিদ্যাসাগর	”	...	৷৷৹
২৫।	ভারতের ইতিবৃত্ত	”	...	৷৷৶৹
২৬।	বাল্যবোধ	”	...	।৹
২৭।	বিক্রমপুরের বিবরণ (২য় খণ্ড)		...	২৷৷৹
২৮।	ছদ্মবেশী (উপন্যাস) ...		...	৷৷৹
২৯।	পল্লীবাণী (উপন্যাস)			